রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

পরিবেশক
ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন-১৩৬৭

প্রকাশক
এ, হক
নবযুগ প্রকাশনী
২১বি, নাসিরুদ্দীন রোড
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
গণেশ বসু

মুদ্রক
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

পাকিস্তানের পরিবেশক
নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলাবাজার, ঢাকা।

দাম ৩·৫০

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পূর্তির পুণ্যলগ্নে

স্মরণ করি—

চৌত্রিশ বৎসর আগে শান্তিনিকেতনের নবাগত কর্মীরূপে

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও তাঁর

আশীর্বাদ লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটে যাঁদের অনুগ্রহে

সেই

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভাণ্ডারী

স্বর্গত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

"রবীন্দ্র-জীবনী"কার

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মহাশয়দ্বয়কে।

নিবেদন

আজ রবীন্দ্রজন্মশত-বার্ষিকীর মহোৎসবে যে যেভাবে পারে কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনের আয়োজনে রত। এই পুণ্যক্ষণের স্মারক হিসাবে সকলের সঙ্গে আমরাও আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁকে প্রণতি জানাচ্ছি।

উপচার তাঁরই দানের হেরফের মাত্র। "রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়"—এ হল গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। বাণীতে, কর্মে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের পরিচয় উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন। সে-পরিচয় কিভাবে কতটা গ্রহণ করতে পেরেছি,—সেইটুকু আমাদের বলবার প্রয়াস। সে-পরিচয় অন্য কোনো ব্যাখ্যার সাহায্যে নয়,—সরাসরি কবির উদ্ধৃতি-যোগে যেটুকু পেরেছি বলেছি।

গ্রন্থের এক-এক অধ্যায়ে একাধিক রচনার সমাবেশ রয়েছে। রচনাগুলি এক, দুই সংখ্যায় চিহ্নিত আছে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। মান্যবর সম্পাদক মহাশয়দের এই উপলক্ষ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

অনেকের কৌতূহল হতে পারে তাই গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগে এখানে একটি কথা বলে রাখা গেল; ৩২ পৃষ্ঠার ৩০ পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত "খ্যাতনামা সাহিত্যিক" হচ্ছেন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; এবং তাঁর "কাব্যোপহারটি" হচ্ছে—"রাজহংস"।

"মাসিক বসুমতী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক মহাশয়ের উৎসাহ ও সহায়তায় এই পুস্তক প্রকাশের সূত্রপাত হয়। প্রকাশক-পক্ষের শ্রীযুক্ত অবিনাশ সাহা মহাশয় নিজেও একজন সাহিত্যিক। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-আলোচনামূলক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা কবিকে শ্রদ্ধা-নিবেদনের আগ্রহ তাঁকে এই গ্রন্থের ভার গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। তাঁর প্রস্তাব ছিল,—রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত লেখকের স্বীয় অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষভাবে এ গ্রন্থে আলোচিত হয়—সে অভিজ্ঞতা যত ছোটখাট হোক না কেন। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব ঘটনা আমার লক্ষ্যীভূত হয়েছে সর্বত্র না হোক মাঝে মাঝে আমি সেরূপ ঘটনার সন্নিবেশ ক'রেই আলোচনায় অগ্রসর হতে চেষ্টা

করেছি। বলা বাহুল্য, সর্বমুখী-প্রতিভাদীপ্ত কবির সর্বদিকের আলোচনা করা গ্রন্থকারের সাধ্যাতীত। যেদিক দিয়ে তাঁকে যেটুকু জানার সুবিধা হয়েছে সেই কয়েকটি ক্ষেত্রেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ। তৎসত্ত্বেও এই গ্রন্থ-প্রকাশে যে প্রকাশক উদ্যোগী হয়েছেন তার জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদার্হ।

বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক এই গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতি-যোগের অনুমতি দান করেছেন; তাঁকে উপলক্ষ্য করে এস্থলে বিশ্বভারতীর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করি। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্তবিমলকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট থেকে এই গ্রন্থের সম্পাদনার দিকে নানা পরামর্শ লাভে উপকৃত হয়েছি। এ বিষয়ে, গ্রন্থে ব্যবহৃত পত্রাদির অধিকারীগণ এবং আর যাঁর কাছ থেকে যা কিছু সাহায্য মিলেছে, তাঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

সর্বশেষ নমস্কার রইল, সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

শান্তিনিকেতন
৭.৯.৬১

জীবনযোগে

সকলের অনুভূতি যিনি পেয়েছেন, তিনি সর্বানুভূঃ। ঈশ্বরকে এই বিশেষণে বেদে বিশেষিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সর্বানুভূরই পথের পথিক। তিনি সব কিছুরই অনুভূতি পেতে চান। অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে সমগ্র এক অনন্ত নিখিল তাঁর আরাধ্য পূর্ণতার রূপ। তিনি বলেছেন, তিনি বিচিত্র একের দূত। সত্যি বিচিত্রমুখী তাঁর প্রতিভার গতি, বহু বিষয় নিয়ে তাঁর চর্চা। এই বহুর মধ্য দিয়ে নিখিলের সঙ্গে মিশে গিয়ে পূর্ণ হবার জন্যই তাঁর যা-কিছু চেষ্টা। কথা হচ্ছে সংসারের চৌদ্দ আনা লোকই তো অষ্টপ্রহর প্রায় স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে নিখিলের সকলের দিকে কবির মন টানল কিসে, এমন উদারদৃষ্টি তিনি কেমন করে পেলেন ?

বলা যায়, এই ধরনের বড় প্রেরণা কবি তাঁর নিজের ভিতরে নিয়েই জন্মেছিলেন। অবশ্য এই সহজ সরল উত্তরের বহু প্রমাণ রয়েছে কবির বিপুল রচনাতেই, কিন্তু তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে সে প্রেরণা কি সহজেই স্বচ্ছন্দ প্রকাশ পেয়েছিল ? এইখানেই কবির ভিতরের-বাইরের ইতিহাস উত্তরটিকে একটু জটিল করে তোলে। সে উত্তর বুঝে নিতে হলে প্রেরণার উৎপত্তি, গতি ও পরিণতির ইতিহাসটির আলোচনা দরকার।

দেখা যায়, রবীন্দ্র-জীবনের গোড়াতেই, প্রেরণার উৎপত্তিমুখে রয়েছে গণ্ডির বাধা। আর সে-বাধা অস্বাভাবিক রকমের। কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র আরম্ভে লিখেছেন, "আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি, সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড় একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এই জন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।" বস্তুত কবির শৈশবলীলার চিত্রে বেশি স্পষ্ট মাতা এবং আত্মপরিজনের স্বাভাবিক বিস্তৃত ক্রোড়ের চেয়ে

ভৃত্যের আঁকা ঐ অস্বাভাবিক সংকীর্ণ গৃহ-বারাণ্ডার গণ্ডিই। কিন্তু এ হল শৈশবকালগত বাইরের একটি বাস্তব বাধা, আর-এক বাধা আছে ভিতরের,—*সেটা তাঁর স্বভাবগত সারাজীবনের বাধা।*

রবীন্দ্রনাথের স্বভাব বেষ্টন করেছিল কমবেশি আজীবনই একটি সূক্ষ্ম আত্ম-কেন্দ্রিকতার গণ্ডি। তাঁর যে প্রেরণা, তাঁর যে প্রকাশধারা বিশেষ পথে তা একান্ত তাঁরই পাওয়া। সেখানে কারও সঙ্গে তাঁর যোগ নেই। বিশেষ অবস্থা, অভ্যাস রুচি ও বিচারগত ব্যক্তিত্বের সীমায় বাঁধা রয়েছেন তিনি বরাবরই। বেশবাস তাঁর আলাদা, বাসস্থান আলাদা ; বাচনভঙ্গিতে, চিঠিপত্রে, চিন্তায়, মেজাজে তিনি সকলের মধ্যে থেকেও রয়েছেন স্বতন্ত্র। একান্ত ব্যক্তিগত সীমায় আবর্তিত হতে-হতেই তিনি বিশ্বজীবনের পরিক্রমায় রত, যেমন রত পৃথিবী তার স্বকক্ষে ঘূর্ণ্যমান থেকেও সূর্য-প্রদক্ষিণে। যোগের সাধনা করলেও তিনি যোগের আগ্রহ যতটা প্রকাশ করেছেন তাঁর বাণীতে কর্মে,—দৈনন্দিন ঘরোয়া-জীবনে ততটা যুক্ত হতে পারেন নি। বিশেষত শেষ-জীবনে তাঁর যোগের চেষ্টাটা সর্বত্রই-প্রায় দাঁড়িয়ে গেছে আনুষ্ঠানিক আকার নিয়ে। সাধারণের পক্ষে সবচেয়ে সহজ যোগস্থল উৎসবক্ষেত্র। কবিও ডাক দিয়েছেন তাঁর সে-জায়গায় সবাইকে, নিজেও গেছেন সকলের মধ্যে সকলকে নিয়ে আনন্দ করবেন ব'লেই ; কিন্তু তাঁর বিশেষ প্রথাযুক্ত অনুষ্ঠানগুলি সকলের অভ্যস্ত ছিল না ব'লে তা উৎসবে সকলের সহজ সহযোগে দিয়েছে বাধা। তাঁর নিজের আসন রয়েছে সে-অনুষ্ঠানে স্বতন্ত্র বেদীতে। তা শোভন, কিন্তু তা সকলের নাগালের মধ্যে ছিল না। সকলে দর্শক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে মাত্র। প্রায়-স্থলেই কবি কাছে যেতে চেয়ে কাছে গিয়েও রয়ে গেছেন এইভাবে একটু দূরে-দূরে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, তিনি একাকী। তাঁকে সঙ্গ দিবার লোক ছিল না। তিনি জীবন কাটিয়েছেন বন্ধুহীন। এই নির্বন্ধু একা-থাকার কারণ অবশ্য অনেকটা তাঁরই প্রতিভার উত্তুঙ্গ বৈশিষ্ট্য। সমস্তরের লোক না পেয়ে তিনি সৃষ্টির দিকেই সময় দিয়েছেন বেশি। হয় কাব্য, নয় ছবি, নয় গান, নয় অভিনয়, না হয় বিদ্যালয়ের সংগঠন—এর একটা-না-একটাতে মন তাঁর লেগেই থাকত। বিশেষত নোবেল প্রাইজ পেয়ে যখন বিশ্বকবি হয়ে গেলেন, তখন থেকে লোকের কাছে আসতে গেলেই দিতে হয়েছে তাঁকে দর্শন, নিতে হয়েছে প্রণাম, খবরের কাগজের রিপোর্টার আর ক্যামেরার

মুখে থাকতে হয়েছে সদা-প্রস্তুত। তখন আটপৌরে একটা-কিছু তাঁর ছিল না বললেই হয়। গা এলিয়ে গালগল্পের লোক যেমন মেলে নি, অবসরও তেমনি ছিল দুর্ঘট। বিচিত্র নয় যে, আগের দিনগুলিতে লোক পান নি ব'লেই পরে একদিন লোক-মিলনের দিকে মন গেছে তাঁর এত ক'রে। আশৈশব একা থাকতে-থাকতে স্বভাবে অনেকটা হয়ে গেছেন "একলা-থাকার মন"-এর মানুষ। শেষে মিশতে চাইলেও লোকের সঙ্গে ততটা মিশতে পারেন নি। (যদিও ইদানিং কবির সাক্ষাৎদর্শী আগন্তুক অন্য-অনেকের সাক্ষ্য মিলেছে অনুরূপ, যাঁদের অন্যতম হচ্ছেন রাজশেখর বসু। দ্রঃ পত্র, পঁচিশে বৈশাখ, মৈত্রেয়ী দেবী) ভিতরে ভিতরে হয়ে উঠেছেন সেই থেকে বেশি করে সুতীক্ষ্ণ—আরো অনুভূতিপ্রবণ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেই পথ করে নিয়ে সেই অনুভূতি বেশি কার্যকর হয়েছে। নিজেই কবি 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের এক স্থলে এ কথার সমর্থনসূচক একটি উক্তিতে বলে গেছেন, "একক ব'লেই আমি কবি। ভালই করেছিল আমাকে চাকররা বন্ধ করে রেখে। তাই সেই নারকেল-গাছের পাতায় রোদের ঝলমলানি দেখে মন সাড়া দিত।" যে কাব্যপ্রেরণা থেকে কবির মুক্তিক্ষুধা বা নিখিল যোগানুভূতির উদ্বোধন ঘটে, কবি তা লাভ করেছিলেন শৈশবের ভৃত্যহস্তে, সেই 'গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী'-অবস্থায় থাকা কালেই। এই বন্ধনের বেদনা ও তার মধ্য থেকে মুক্তির ক্ষুধা নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, শেষদিকে "পুনশ্চ" কাব্যের 'বালক' কবিতাটিতে। তাতে কবি নিজেরই বালককালের কথায় বলছেন,—

> বটগাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
> মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো।
> নারকেল ডালের সবুজ হত নিবিড়,
> পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে।
> যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল
> সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে,
> বনে বনে।
>
> পূর্বদিকের ওপার থেকে বিরাট এক ছেলেমানুষ
> ছাড়া পেয়েছে আকাশে,
> আমার সঙ্গে সে সাথি পাতালে।

শারীরিক গতিবিধি বাঁধা পড়েছে ভৃত্যনির্দেশিত গৃহ-বারাণ্ডার সীমায়,

তারই পীড়া কবির মনকে এখানে আগল ছিঁড়ে ছুটিয়ে নিচ্ছে বিরাট এক ছেলেমানুষের সঙ্গে।

শৈশবে গৃহ-বারাণ্ডায় তিনি আটকা পড়েছিলেন বটে, কিন্তু এও দেখা যায়, পরবর্তী জীবনে স্বদেশে-বিদেশে এই গণ্ডি কাটিয়েই তাঁর জীবনযাত্রা। পিতার সঙ্গে গেলেন হিমালয়, তারপরে একাই গেলেন আমেদাবাদ, বোম্বাই; ক্রমে বিলাতেও গেলেন, তারপরে জমিদারির কাজে গেলেন উড়িষ্যার বালিয়া কটকে, বাংলার পতিসরে শিলাইদহে; তারপরে এলেন শান্তিনিকেতনে, তারপরে দেশবিদেশ আর আশ্রম এই নিয়ে চলেছে ক্রমাগত ঘোরাফেরা। দেহ যখন বার্ধক্যে অচল, মনে মনে তখনও চলেছে নিখিলযাত্রা। বাইরের দিকে ভৌগোলিক স্থানগত গণ্ডিভাঙার পরিচয় রয়েছে উপরোক্ত ছকের মধ্যে কিন্তু ভাবে ও কর্মে গণ্ডিভাঙার ধারাটির পরিচয় সর্বত্রই কিছু-না-কিছু ছড়িয়ে আছে।

শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর সাহিত্যে এই সীমা থেকে সীমা-ভেঙে-চলার কাজ সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। সাহিত্যের তৎকালীন সংকীর্ণ একঘেয়ে বাঁধা ছন্দ ও বিষয় থেকে সর্বপ্রথম মুক্তি পেলেন তিনি কাব্যে। কিন্তু তাঁরই উদ্ভাবিত এক-একটা কাব্যরীতি যখন পরিণত হয়ে উঠেছে, যখন এসেছে সেই বাঁধা ছকে পুনরাবর্তনের পালা, তখনি আবার সে-রীতি সেখানেই বর্জন করে বেরিয়ে পড়েছেন নতুন আঙ্গিকের পথে। তাঁর ভিতরের প্রেরণা তাঁকে এমনি করে সীমায় বেঁধেও সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে ক্রমাগত দূরে, দূরান্তরে —ঘর থেকে বিশ্বের অভিজ্ঞতার পথে। সেই প্রেরণাই তাঁর ভাষায় তাঁর এক-কালের মানসসুন্দরী, আর-এককালে সে-ই তাঁর জীবনদেবতা, আবার সে-ই তাঁর "পূরবী"র লীলাসঙ্গিনী।

"সোনার তরী"তে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় কবি প্রথম প্রশ্ন করেছেন,—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?"

উত্তর মেলেনি, কেবল কবি অনুভব করেছেন সুন্দরীর রহস্যময় হাসির সঙ্গে সামনে-চলার ইঙ্গিত। কবি কিছুদূর এগিয়ে "কল্পনা"য় 'অশেষ' কবিতার মধ্যে শুধালেন,—

"আবার আহ্বান ?
যত কিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।

অনেক পরের পর্ব "পূরবী"তে 'খেলা' কবিতায়ও সেই একই প্রশ্ন—

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ
ওগো খেলার সাথি।

বারে বারে এই আহ্বান কবিকে নব-নব বেদনায় নূতন সৃষ্টির পথে চালিয়েছে। কী গদ্যে কী পদ্যে, যেমন বিষয়ে-ভাষাতে, তেমনি ভাবে-ভঙ্গিতে তাঁর সৃষ্টি-প্রবাহের বাঁক-ফেরার স্থলনির্দেশ নিয়ে বাংলা-সাহিত্যের একটা মস্ত অংশই আজ 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ'-রূপে সক্রিয়।

শুধু সাহিত্যে নয়, যেমন তাঁর কালে সীমার বেড়া রয়েছে নানাদিকে, তেমনি নানাদিকেই জাগরণের সাড়াও পড়েছে মাত্র তখনই। তিনি সেই স্পন্দনের মুখে এসে পড়েছেন। তাঁর বাড়ি বা পরিবারটি ছিল সেই জাগরণের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। শৈশবে ভিতরে প্রতিভা নিয়ে বালকের নিঃসঙ্গ দিনগুলি যখন বাইরে কাটছে একাকী তখন তার পাশেই রয়েছে জনবহুল বিবাট বাড়িব বহু-বিষয়ের অনুশীলনপূর্ণ আত্মবিকাশের উদার ক্ষেত্র। সেখানে নিরন্তর বয়ে চলেছে ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ, স্বাদেশিকতা, শিল্প, সংগীত, অভিনয়, শরীর চর্চা, জমিদারি ও ব্যবসাবাণিজ্যের কলমুখর স্রোত। সেখানকার বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে বালকের সহজগতি এমনিতেই অবরুদ্ধ। কিন্তু বিষয়ের উষ্ণ আবহাওয়ার ঢেউ এসে জাগিয়ে দিচ্ছে তাঁর প্রতিভার অঙ্কুরকে বহুমুখী ক'রে।

নানা জ্ঞানী গুণী ধার্মিক বিদগ্ধ সামাজিক যত আত্মীয়-বন্ধু-ভরা পরিবারের আবহাওয়া তাঁর বড়ো দিকে যেতে তাঁকে খুবই সাহায্য করেছে। কারণ সে-সব লোকের যোগে বহু বিষয়ের চর্চার দ্বারা শক্তির বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাও যেমন তাঁর লাভ হয়েছে তেমনি সংসারের বহু ক্ষেত্রে বহু রকমের লোকসংযোগও ঘটেছে ঐ থেকেই; তার দ্বারা মন তাঁর প্রসারলাভ করেছে স্বভাবতই; বিশেষত জীবনের ভিত্তিমূলে তাঁর পিতার উদার চরিত্র ও মতের সাক্ষাৎ-স্পর্শে থেকে ভারতীয় ব্রহ্মবাদের সাধনার প্রভাব তো আছেই। রবীন্দ্র-জীবনের সে-একটি প্রধান ধারা। তা বিস্তারিতভাবে আলোচনার বিষয়। ধর্মের সে দিকটি ছাড়াও অন্য আরো যে-কয়টি দিক দিয়ে রবীন্দ্র-জীবন-বিকাশে বাধা বা সাহায্যলাভ ঘটেছে, এ ক্ষেত্রে মাত্র সে কথাই আলোচ্য।

এ দিকে দেশের থেকে শত দিক দিয়ে শত-সংস্কারের বাধা; আবার সেই দেশেরই মুক্তি-বেদনা উত্তাপ যোগাচ্ছে কবিকে অন্য দিক দিয়ে; বন্ধন ও মুক্তির দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ শক্তি—বিরুদ্ধতা ও আনুকূল্যের পথে কবির

জীবনে একই সঙ্গে কাজ করেছে বিজলি বাতির পজিটিভ নেগেটিভ দুই তারের মতো। দুই-এর যোগেই শেষপর্যন্ত আলো জ্বলেছে,—মুক্তিকামী দেশ ও জাতি তাঁর মধ্য দিয়েই যেন কথা কয়ে উঠেছে। দেশের বাধায় দেশের বেদনায় তাঁর প্রেরণাকে নিয়েছে বড়োর দিকে; ক্রমে দেশের সকলের প্রায় সবরকম সমস্যাতেই তাঁর মনের যোগ দেখা দিয়েছে।

একটি বিষয়ের একটানা একটা মাত্র তাঁর সিদ্ধির পথ নয়, অল্পবিস্তর সর্ব-ক্ষেত্রেই বিষয়ের স্বীকৃতি ও সাধনা তাঁর আছে। এমন কি দেখা যাবে, এক সময়ে তিনি ব্যবসাবাণিজ্যেও পা বাড়িয়েছিলেন। অবশ্য সে ক্ষেত্রে সফল হন নি। তা না হোন, কিন্তু এর থেকে এটুকু অন্তত বোঝা যাচ্ছে, কবি হলেও সংসারের নিছক কেজো নীরস দিকটাকেও তিনি বর্জন করেন নি। শিল্প সাহিত্য ছাড়াও, জমিদারি, স্বদেশসেবা, সমাজ-সংস্কার, ধর্মচর্চা, শিক্ষা-বিস্তার, রাষ্ট্র-আন্দোলন—অনেক-কিছুই জীবনের এক-একটা সুরে তাঁকে বাঁধতে এসেছিল; বাঁধন প'রে তিনি তাদের গণ্ডিতে গেছেন, কিন্তু তাদের যোগে সত্তাকে বিচিত্র ও বহুরূপে পুষ্ট পরিণত ও প্রসারিত করে নিয়ে একটা সীমায় এসে ছেড়ে দিয়েছেন এক-এক সময় তাদের এক-একটির সংসর্গ।

তিনি কি বৈরাগী? দেখে মনে হয় তিনি তাঁর সেই "শিশু ভোলানাথ"-এরই জাত। বয়েসের স্বাভাবিক তাগিদেই তাঁর খেলনা চাই, সেগুলি তাঁর অতি-প্রিয়বস্তু, কিন্তু পুনরাবৃত্তিতে মন তাঁর বিরক্ত; নূতনের দিকে তাঁর নাড়ীর টান। বয়স বাড়ছে, জীবনের পরিধি বাড়ছে, খেলনা ও খেলার সাথি সব নূতন হচ্ছে, পুরোনোগুলোর কাজের পালা চুকেছে বলেই ছেড়ে যেতে কোনো কিছুতেই কিছুমাত্র তাঁর বাধছে না।

সংসারের বাঁধন মেনে তিনি সংসারীও হয়েছিলেন,—স্ত্রীপুত্র আত্মীয়বান্ধবে তাঁরও কিছু অভাব ছিল না। সেখানেও কাউকে তিনি বর্জন করেন নি, বিরক্তি দেখান নি কোনোখানে। কিন্তু ঘর-দুয়ার পরিজনের মায়া তা ব'লে তাঁকে একান্ত ঘরোয়া করে বাঁধতে পারে নি। তাঁর সাংসারিক জীবন ছিল উপর্যুপরি আত্মীয়-বিয়োগের দুঃসহ-ব্যথাভরা। কিন্তু এই দিকেও দুঃখ তাঁকে শোকের গণ্ডিতে পারে নি একেবারে বসিয়ে দিতে; শেষ-জীবনে কালের করাল দংষ্ট্রা একে-একে মায়ার বাঁধন যখন ছিঁড়ে দিচ্ছে, লেখনীকে বার বার সংযত করে দিয়ে বলছেন, "লজ্জা দিয়ো না"।

তাঁর ব্যক্তিগত কোনো দুঃখ কোনো শোকই কালিমার ছায়াটুকুও লাগায়

না যেন দশের সংসারকে—এই ছিল তাঁর সতর্কতা। কেননা তাঁর চোখে সংসার ছিল 'আনন্দলোক'। আনন্দময়ের লীলাই এখানে সুখ-দুঃখের অভিঘাতে রূপ ধরে উঠছে; দিনে-দিনে সেইটুকুই দেখবার, উপভোগ করবার; একটা-কিছু নিয়ে আঁকড়ে-প'ড়ে থাকলে অসংখ্য বিষয়ের হরেক-মজা থেকে বঞ্চিত হতে হবে যে। এজন্য কোনোটাতেই বদ্ধ-হওয়া নয়, বিরক্তিও নয়, চিরদিন সেই আনন্দময়েরই ইঙ্গিতে বিষয়ের মধ্যে নির্বিষয়ী ভোক্তার পদ নিয়ে থাকতে হবে নির্বিকার, চলতে হবে বিষয় পেরিয়ে। সব আছে, নিজেও আছেন,—সকলের গুণাগুণই লক্ষ্য করছেন; নিজের উপরেও সকল বিষয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখে যাচ্ছেন, কোনো ক্রিয়ার প্রভাবেই বিচলিত হয়ে দেখার-মজা গুলিয়ে ফেলছেন না। সামান্যও তাঁর দেখবার জিনিস, আবার মহাকালের বিরাট সৃষ্টিও তাঁর সামনে প্রসারিত। বেদনা আছে নিজের রোগের, আছে প্রিয়-জনের মৃত্যুর, কিন্তু সবার উপরে আনন্দের আভাটি আছে মেলা, মহাপ্রয়াণের দিনকয়েক আগেকার কালিম্পঙের সেই শরতের প্রভাতী সোনালী রৌদ্রটির মতো। সেই আনন্দ শুধু কালিম্পঙ নয়, সংসারের সকল সীমার উপরে তাঁকে নিয়ে গেছে বিভোর ক'রে; তিনি গাইছেন,—

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে
নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বত-শিখর
অন্তহীন যুগযুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে
এ শুভ সংবাদ জানাবারে

অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত স্বরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ।

কালিমপঙ কেন, গোটা-সংসারেই সোনার ঘণ্টার ঐ আনন্দধ্বনি শোনবার মতো মহৎ অবসর দুর্লভ। সেখানে ঘিঞ্জি সীমায়-সীমায় জীবনের ঐ ধ্বনি অন্যদের কাছে ব্যাহত। রবীন্দ্রনাথ এইখানেই সংসারের আনন্দ-প্রেরণার চিরনির্ঝর। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে যে-আনন্দ একদিন কবির চোখে প্রভাতের ধরাকে উৎসবময়ী করে দেখিয়েছে, শত বাধার মধ্য দিয়েও সেই মুক্তির আনন্দই রবীন্দ্রনাথের চিরকালের বাণী, আর সেই বাণী নিয়েই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। "মনুষ্যত্ব" প্রবন্ধে কবি বাধার মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থতাকে জয় করবার সাধনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে নির্দেশ করেছেন। তুলনামূলক উদাহরণ দিয়েছেন ফুলের ফোটা ও নদীর ছোটা দিয়ে। আপাতদৃশ্যত ফুলের সহজ ফোটা সুন্দর, কিন্তু কঠোর বাধাময় নদীর জটিল ছোটা মহৎ। মানুষের চাই মহত্ত্ব। তাই কঠিন হলেও মানুষের পক্ষে আদর্শ হচ্ছে নদীর ছোটাই। নদীর উৎপত্তিস্থল ঝরনা। ঝরনা পাহাড় থেকে বেরোয়। বেরিয়েই তারা বাধা পায় নুড়িতে। কিন্তু সে বাধায় গতি তার বাধে না যদি ভিতরে প্রাণ-প্রাচুর্য থাকে ; হয়তো সে কিছু দূর এগিয়েই যায় শুকিয়ে। ভিতরের যোগান থাকলে বাধা পেলেই সে নানা দিকে পথ খোঁজে। কবির কাব্য-জীবনের উদ্বোধন ঘটেছে একরূপ "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটিতে। আসলে স্বপ্নভাঙা নির্ঝরই বাস্তবের রবীন্দ্রজীবন। নির্ঝর স্বপ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে, বয়ে চলল পথ কেটে, ক্রমে তখন হয়ে উঠল সে নদী—গঙ্গোত্রী। "নদী কাটা-খালের মত সিধা চলে না।" চলে সে বাঁক ফিরে' নানা দেশ, নানা জনপ্রাণীর স্পর্শ নিয়ে ; পথে পথে পাথর, চড়া, কত বালু কাঁকরের উষর দেশ পেরিয়ে সে চলে এগিয়ে ; শাখা-প্রশাখায় শেষ পরিণতি তার মহাসমুদ্রে। রবীন্দ্রনাথের জীবন ক্রম-পরিণতির মুখে শেষে এই নদীর গতিই নিয়েছে। তাঁর রচনাতেও দেখা যাবে প্রাকৃতিক সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নদীর কথাই বেশি, নদীর ধারা তাঁকে নিয়তই টেনেছে ; নদি যেমন করে সাগরে মেশে, বাঁকে-বাঁকে এগিয়ে তাঁর জীবন ও বাণী মিশেছে তেমনি নিখিল জীবনে।

বাধা ছিল তাঁর বাহিরে, বাধা ছিল তাঁর ভিতরে, কিন্তু কবির ভিতরে ছিল

প্রেরণার প্রাণপ্রাচুর্য। শেষপর্যন্তই তাঁর 'মুক্তধারা'র যাত্রা চলেছে পথ উন্মোচন করে-করে। অন্তরঙ্গতা সহজ না হলেও লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। পরিশ্রমসাধ্য হলেও দেশে-দেশে যেতে হয়েছে; বিশ্বের দুর্গতি মোচনের কাজ হাতে-কলমে সবটা করতে পারুন না পারুন, তার বেদনা বইতে হয়েছে অনেকগুণ বেশি। নদীর মতো এখানেই তাঁর পথে তিনি এগিয়েছেন স্বাভাবিক বাধাকে আত্মচেষ্টায় অতিক্রম করে-করে; আরো কঠিন কাজ করতে হয়েছে, অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক করে তুলতে। এক থেকেও তাঁকে সকলের হতে হয়েছিল।

কবি বলেছেন, "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ',—তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।··সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে, 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে, 'স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।' সেই মানব, সেই দেবতা য একঃ—যিনি এক তাঁর কথাই।" রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম"-এর মূল কথা। ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন, "মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগ-সাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।··· বলা যেতে পারে পৃথিবী মানুষের পরম দেহ, সাধনার দ্বারা যোগ বিস্তারের দ্বারা এই বিরাটকে মানুষ আপন করে তুলেছে, বড় দেহের মধ্যে ছোট দেহকে প্রসারিত করছে।··মানুষের স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড় আমি সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি।"—কম লোকই আছেন, সংসারে থেকে মতে ব্যবহারে আপন স্বার্থগত আমি-র জীব-সীমা কাটিয়ে সকল-আমি-র কোঠায় উঠতে পারেন; যাঁরা পেরেছেন তাঁরাই মহাত্মা।

জেনে না-জেনে এক-বিশ্বসত্তাকে প্রকাশ করবার কাজ নিয়েই নিখিলের যত লোক চলেছে। বিষয়টি সকলেরই এক, পথ ভিন্ন ভিন্ন। স্বভাবের থেকে কারো সে-পথ কর্মের, কারো ধর্মের, কারো বা জ্ঞানের।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর পথ কাব্যের, তিনি কবি। "আমার জীবন-দেবতা

আমাকে কবি করবেন স্থির করেছেন ········। সংসারকে বেদনার অভিজ্ঞতাতেই আমাকে জানতে হবে······। আমার তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের মতো জ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, আমার যে প্রাণের প্রকাশ।” যারা ভাষা দিয়ে ছন্দোবন্ধে কিছু বেদনা প্রকাশ করেন, সাধারণ অর্থে তাঁরাই কবি। রবীন্দ্রনাথের জীবনই একটা কাব্য। সে কাব্যের দুটি ভাষা—লেখা ও কাজ। বেদনা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে যেমন লেখায় তেমনি কাজে। প্রভাত-সংগীত'-পর্বের প্রসঙ্গে একস্থলে বলেছেন, “সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা।” তাঁর এই উপলব্ধি ঘটেছে কাজের মুখে নয়,—কবিতা-রচনার শুরুতে। একপেশে ভাবের ব্যাপার হওয়ায় তখন ঐ উপলব্ধি অসম্পূর্ণ। বাস্তব সংসারের সহিত বিষয়-সংস্রবে এসে অভিজ্ঞতা তখনো পরিপুষ্ট হবার অবসর পায় নি। সুতরাং মূল্যও সেই পরিমাণেই তার কম।

কবির সেই কাজের যোগ ঘটেছিল কিছুকাল পরে, যৌবন থেকে। আজকের বিশ্বভারতী কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথের কাজের সাধনার শেষ ধাপ মাত্র। তবে কোনো কাজই তো তাঁর কাছে কাজ নয়, সব-কিছুই হচ্ছে আইডিয়ার বিকাশ-সাধনা মাত্র। সবই সেই কবি-সৃষ্টিরই একরকম ভাষা। কর্মকেন্দ্র বিশ্বভারতীও তাই। যা হোক, সাধারণের মধ্যে সভা-সমিতি, শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব, জমিদারিতে প্রজাদের অবস্থা-উন্নয়নের নানা চেষ্টা—কবির প্রথম জীবনের এ সব তথ্য সুপরিচিত। আরো দুয়েকটি কাজ তিনি করেছিলেন, তার কথা আজ আনাচ-কানাচ থেকে জানা যায়। কবি নেমেছিলেন একদিন প্লেগের সেবায়। অধুনা বিদেশে অনেক কবি আদর্শের জন্য, অভিজ্ঞতার জন্য যুদ্ধে গেছেন, প্রাণও দিয়েছেন শোনা যায়; কিন্তু প্লেগের মৃত্যু-তাণ্ডবের মুখে জনসেবায় নিজেকে ছেড়ে-দেওয়াটা অমন অভিজাত কবির জীবনে এ যুগের পক্ষেও যেন একটু বেশি সাহসের ব্যাপার। কিন্তু “জোড়াসাঁকোর ধারে” গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ পরিষ্কারই বলছেন—“সেই সময়ে কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে মহামারি চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবি কাকা এবং আমরা এ বাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবি কাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায়-পাড়ায় ইন্‌সপেকশনে যেতেন। নার্স ডাক্তার সব রাখা হয়েছিল। সেই প্লেগ এসে

ঢুকল আমারই ঘরে। আমার ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে গেল।" আর-একটি ঘটনাও সম্প্রতি উল্লিখিত। কবি 'রাখিবন্ধনে'র আন্দোলন করেছিলেন, তা অনেকেই জানেন, কিন্তু তিনি মসজিদে গিয়েছিলেন মুসলমানদের রাখি পরাতে এবং তা পরিয়েও এসেছিলেন ;—কথাটা অভিনব। মুসলমানদের রাখি পরানো কাজটা সেদিনও যে খুব সুবিধার ছিল না, অবনীন্দ্রনাথের কথা থেকেই তা টের পাওয়া যায়। "ঘরোয়া" গ্রন্থে তিনি বলছেন, 'গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবি কাকা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন।···রাখি পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে! আসছি, হঠাৎ রবি কাকার খেয়াল গেল চীৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখি পরাবেন। হুকুম হল চলো সব।—ভাবলুম···মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখি পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না।···এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবি কাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী কী হল সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে-কেটে কথা বলে, বললে কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম হাতে রাখি পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে, ওরা একটু হাসলে মাত্র।"

হানাহানির স্থলে দেখা দিল একটু হাসি! জীবনে-জীবনে কবির সহজ প্রবেশের ব্যাকুলতাই সেদিন সম্ভব করেছে সমস্যার এমনি সরল সমাধান। নোয়াখালি ও বিহারে সাম্প্রদায়িক নরমেধ-যজ্ঞের পৈশাচিক লীলাভূমিতে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা চলেছে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাতে। বুঝিবা একদিন অগোচরে এই সাধনারই পথ নিয়েছিলেন কবি। কিন্তু ঘটনা সেদিন আকারে এতটা তীব্র ও ব্যাপক হয় নি, এই যা তফাত, নয়তো সকলের সঙ্গে মিলবার ও সকলকে মেলাবার প্রাণ-বেদনায় দুজনেই তো দেখা যায় ভিতরে ভিতরে অভিন্ন। সেদিন একজন যার সূচনায় ছিলেন, আজকে আর একজন এসেছেন তার পরিশিষ্টে। কবির ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে ঐ ধরনের কাজে তাঁর আন্তরিক বেদনার রূপ ঝলসিত হয়ে উঠেছে। দেশবিদেশের দুর্ভিক্ষে, বন্যায় অর্থ-সংগ্রহ বা পাড়া-প্রতিবেশীর রোগে স্বহস্তে চিকিৎসা, ঔষধ-বিতরণ, বা শোকে সান্ত্বনা-প্রয়োগ ইত্যাদি কাজ ও মনের ঝোঁক একদিনকার সেই

প্লেগের রোগীসেবক মানুষটিরই পরিচয় দেয়। আর ঐ মসজিদের জের গেছে কোথায় কিছু পরে এই আলোচনার মধ্যেই তার আভাস মিলবে।

ক্রমে এশিয়া য়ুরোপ আমেরিকা ঘুরে যোগ ঘটল সারা জগতে। কবির সময় গেছে তখন তাঁর নানা সৃষ্টির কাজে, চিঠিপত্র ব্যবহারে, বিশ্বভারতী পরিচালনায়, নানা অনুষ্ঠানের নানা দাবি মেটাতে, দেশ-বিদেশের অতিথি পরিচর্যায় ও আলাপ-আলোচনায়। সাহিত্যের স্থায়ী ও দূরপ্রসারী যোগের পাশাপাশিই চলেছে এসব সাময়িক ব্যবহারের যোগ। কত দেশে তিনি গেছেন, কত লোকের সঙ্গে ঘটেছে সাক্ষাৎ। সেই পথে বিশ্বজীবনের বিচিত্র বিপুল সত্তাকে বিচিত্র বিপুল বাস্তব অভিজ্ঞতার পথেও তিনি যতটা পেয়েছিলেন, কোনো কবির জীবনে কেউ তা পায় নি। অনেক কর্মীর পক্ষেও তা দুর্ঘট। কবি স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র করে দেখতে গেলে নানাভাবে কাজ তিনিও কি কম কিছু করেছেন? কত কাজ তিনি করেছেন, পরিমাণে তার মূল্য নয়, কবির কাজ তাঁর নিজের মূল উপলব্ধিকে যতখানি প্রকাশ করেছে, কবির কাছে নিজের কাজের সার্থকতা শুধু ততখানিতেই। পুণ্য বা অন্য গৌরব তিনি চান নি। যে-গৌরব তিনি নিতে পারতেন ন্যায্য অধিকারে,—সেখানে অনধিকার-বোধের নিরহংকার নম্রকুণ্ঠাই তাঁকে মানবধর্মে তুলেছে খাঁটি ক'রে। পুণ্য না চান কিন্তু প্রকৃতই তিনি যে ধার্মিক এবং স্বধর্মনিষ্ঠ এইখানেই তার যথার্থ পরিচয়। ভারতীয় দৃষ্টিতে পরধর্ম ভয়াবহ, স্বধর্মই হচ্ছে সিদ্ধির পথ, তাতে নিধন হওয়াও শ্রেয়। এজন্য ধর্মব্যাধ মহাত্মা হয়েও তার বৃত্তিতে থেকেই সে মহাভারতের উপদেশ দিয়ে গেছে। তাঁর সিদ্ধিও ঘটেছে ঐ করেই। নানা সময়ে নানা কাজ করলেও স্বধর্মের পরিচয়টি কবি ছাড়েন নি ; শেষপর্যন্তই ছিলেন তা আঁকড়ে। বলেছেন, তিনি কর্মী নন ; ঋষি-টিসি কিছুই নন, তিনি কবি, আগাগোড়া শুধুই কবি, কর্ম নয়, ধর্ম নয়,—তাঁর কাজ কেবল অনুভূতি নিয়ে।

"পত্রপুট" কাব্যে বলেছেন,—

> ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ
> দিয়ে গেছে আন্দোলন
> প্রাণরস-প্রবাহে।
> তার আবেগে বয়ে নিয়ে গেছে
> আমার চেতনাকে
> জগতের সর্বদান যজ্ঞের প্রাঙ্গণে।

এই যে সর্বগৃধ্নু, চেতনা, এই চেতনাই স্মরণ করিয়ে দেয় মহাত্মাদের সেই অনুভবের কথা, সেই প্রেমের কথা, যার দ্বারা তাঁরা সহজে সেই 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' সর্বজনীন সর্বকালীন মানবকে অনুভব করেন সকলের মধ্যে, "তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন"। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনও উৎসর্গিত বিশ্বজীবনের বেদনা-অনুভব ও তার প্রকাশের বিচিত্র কাজেই। আমিত্ব যে অংশে তার বাধা, তাকে দূর করবার জন্য তাঁর চেতনা ও চেষ্টা সমভাবেই সদা জাগ্রত। যে সব "নিজের অন্তরতম" কথা সব সময়ে বলতে পারা যায় না অথচ বলা চাই নিজেরই জন্যে" এমন নিগূঢ় কথা বলতে গিয়ে "পথে ও পথের প্রান্তে"-গ্রন্থের ৪৩ সংখ্যক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একখানি সুদীর্ঘ পত্রের গোড়াতেই লিখছেন—"আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে-ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে সাধনা হচ্ছে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি-থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা। স্থির হয়ে বসে এ কথা প্রায়ই আমাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে হয় যে, যে-আমি প্রতিদিনের সুখদুঃখের কর্মে চিন্তায় বিজড়িত, সে ঐ সংখ্যাহীন অনাত্মের নিরুদ্দেশ-স্রোতে ভেসে যাওয়ার সামিল। তাকে দ্রষ্টারূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পারলেই ঠিক দেখা হয়—তার সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্ন এক করে জানাই মিথ্যা জানা।" ঠিক জানাটির কথাও আছে। মধ্যজীবনের একদিনকার উপলব্ধি থেকে লিখছেন,—"সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকাল-ব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারিদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা মতো প্রকাশ চলেছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে সব অনুভূতি প্রকাণ্ডভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।"

কিন্তু এও হল তাঁর কল্পদৃষ্টিগত সর্বানুভূতি, যাকে সাধারণত বলতে চেয়েছেন তিনি কবিজনোচিত সাময়িক উপলব্ধি। কর্মজীবনেও তিনি যে ব্যক্তির সংকীর্ণ বাধা ঘুচিয়ে সর্বানুভূতি লাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে

রসদৃষ্টিগত বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি কথা আছে তাঁর "জন্মদিনে" কাব্যে। লিখেছেন,—

জন্মবাসরের ঘটে
নানাতীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন "তুমি আমাদের চেনা" বলে।...
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে ;
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।

শুধু চিন কেন, 'প্রাণের অপূর্বতা'র পরিচয় দিয়েছেন ও পেয়েছেন তিনি বিশ্বের ঘাটে-ঘাটে। এরই সূচনা যেন ছিল স্বদেশের পরিবেশে সেদিন মসজিদে। "নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে"—এই যে প্রেরণার ধারা জীবন-প্রারম্ভে কাব্য-ভাবনায় কবে একদিন উৎসারিত হয়েছিল, জীবনের পরিণতির সঙ্গে ক্রমেই তা শেষ-দিকে এসে আরো বেগবতী ও কার্যকর হয়েছে। সীমামুক্ত কবির জীবন দেশবিদেশকে বেঁধেছে এক ক'রে।

একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। সীমা-মুক্তির সাধক ব'লে কবি কখনো যে কোথাও কোনো বিধিনিষেধ বা নিয়মানুবর্তিতা মানেন নি, তা নয়। তাঁর মুক্তি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। বিষয়কে আয়ত্ত করবার জন্য সাধনা চাই, আর তার জন্য যে রীতিনীতি অভ্যাস অনুশীলন দরকার, স্তরে স্তরে কঠোর অধ্যবসায়ে তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, একেবারেই অমনিতে লাফ দিয়ে কোনো মহৎ সিদ্ধিতে ওঠা যায় না, কবির সাধনাও এই সত্যেরই পরিপোষক। তবে এমনিতেই কবি অতুল প্রতিভাশালী ছিলেন ব'লে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে সব সময় সাধনার দীর্ঘতা দরকার হয় নি। তাই তা সাধারণের পক্ষে তত দৃষ্টিগ্রাহ্যও হয়ে নেই। জনসাধারণকে নিয়ে যেখানে কবির সাধনার কর্মকাণ্ড, সে স্তরে তিনি নিয়মানুগ হয়ে যথোচিত সীমার সার্থকতা দেখেছেন এবং মেনেছেনও। কিন্তু মূল প্রেরণায় তিনি বরাবরই সীমামুক্ত "বলাকা"-পন্থী।

যদিও তাঁরি বাণী—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

তবু এই তিনিই আবার অন্যত্র বলেছেন, সীমার মধ্যেই অসীম আপন সুর বাজাচ্ছে। সীমা মিথ্যা নয়, সীমা বাস্তব, তার সার্থকতা একটা স্থলে আছে। সীমার বাঁধন মেনেই সীমা ছাড়িয়ে চলা, কবি দেখেছেন সংসারে এই স্থিতি ও গতির লীলা চলেছে একই সঙ্গে। বীজ আবরণ নিয়ে এল, কিছুদিন সে রইল ঢাকা তার ভিতরেই, কিন্তু দুদিন বাদে সেই আবরণ ভেদ ক'রে অসীম শূন্যের বুকে বেরল সে অঙ্কুর হয়ে। তার পরে যেমন সীমা নিয়েই তার আকার, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দিনে দিনে বিশেষ বিশেষ অবস্থার সীমা ছাড়িয়ে ডালপালায়, চারায়, গুল্মে, বৃক্ষে, বনস্পতিতে চলল তার পরিণত জীবনধারা। এই হল স্বভাবের চক্রপর্যায়ী সৃষ্টির রীতি। মানুষের গড়া যে কৃত্রিম সৃষ্টি,—শিল্প, তার মধ্যেও সীমার থেকে অসীমে যাত্রার এই বন্ধন ও মুক্তির একই প্রথা নানাভাবে কাজ করছে। কাব্য, ছবি, গান—এ সবই যথাক্রমে ছন্দ রেখা এবং তালের মধ্যে সীমায়িত হয়ে-হয়েই এগিয়ে চলেছে অসীম ব্যঞ্জনার পথে। কী স্বভাবে, কী শিল্পে, সকল ক্ষেত্রেই সৃষ্টি-বিকাশের রহস্যটি নিহিত সীমার বাঁধনযুক্ত অসীম গতির মধ্যে।

অসীমমুখী রবীন্দ্রনাথের বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথ; চক্রে-চক্রে খণ্ডিত হয়েই অখণ্ড। চক্রে-চক্রে যেমন সেই অখণ্ডতা খণ্ডিত, তেমনি এক একটি চক্রের মধ্যেও সংযম-শৃঙ্খলার দ্বারা গতি সুনিয়ন্ত্রিত। তাঁর চলা-ছন্দের মূলে চলা। "বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন" জীবনের সাধক তিনি, শেষপর্যন্ত অবশ্য বলেছেন, তিনি সংস্কারহীন ব্রাত্য, তাঁর কোনো নিয়মকানুন, জাতপাঁত, মন্ত্রতন্ত্রের দায় নেই। কিন্তু জীবনযাত্রায় প্রথমেই বাঁধন পরেছিলেন তিনি দেশজ শাশ্বত ঐতিহ্যকে মেনে। "প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া নিয়ম-সংযমে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারত-বর্ষের এই প্রাচীন উপদেশের কথা" সমর্থন ক'রে তিনি তাঁর "সাহিত্য"-গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে বলেছেন: "পূর্ণতা লাভের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া সংযম-চর্চাকেও যদি ঠিকমত সংযত করিয়া রাখিতে পারি, তবে মনুষ্যত্বের কোনো উপাদানই আঘাত পায় না, বরঞ্চ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।... এইজন্যই বলিয়াছি, সৌন্দর্যবোধ ঠিকমতো উদ্বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্য-সাধনই আবশ্যক।" তাঁর নিজের জীবন প্রথম থেকেই গড়া পিতৃসংসর্গযুক্ত শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, মন্ত্র, উপবীত, যজ্ঞ

ইত্যাদি বিবি-বিধানের আবেষ্টনে। বাঁধন-না-মানা স্বাধীন প্রবৃত্তিরও উন্মেষ-লীলা দেখা যায় বটে, স্কুলের গতানুগতিক পঠনরীতি পরিবর্জনে, একা-একা দেশভ্রমণে, কিন্তু তেমনি অফুরন্ত একনিষ্ঠ লেখাপড়ার আত্মস্বতন্ত্র কঠোর অধ্যবসায় চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। কবি তিনি, অবাধ কল্পনাই তাঁর লীলারাজ্য, কিন্তু তিনি বরণ করেছেন বিদ্যালয়ের অসংখ্য খুঁটিনাটিবহুল বাধাবিপত্তিময় জীবন গড়ার কাজ, পদে-পদে যেখানে বিধি-বিধানের সীমা, যেখানে শৃঙ্খলাই অত্যাবশ্যক জিনিস। কিন্তু সেই শৃঙ্খলার মধ্যেই আবার স্বাধীন চিত্তস্ফূর্তির আয়োজন রেখেছেন সেখানে সর্বাগ্রে এবং প্রচুররূপে। তাই নিয়েই তাঁর শান্তিনিকেতন-শিক্ষারীতির যা বৈশিষ্ট্য।

কী সৌন্দর্যবোধ-সাধনায়, আর কী'ই'বা ব্যবহারিক জীবনে, অসংযমের প্রশ্রয় দিতে পারিপার্শ্বিক আয়োজনেও কিছু তেমন অসম্ভব ছিল না। রূপ, গুণ, মান, ঐশ্বর্যের অতুলনীয় অধিকার পেয়েও ধনীর দুলাল যে 'রবিবাবু' থেকে রবীন্দ্রনাথ বা শেষাবধি 'গুরুদেব' হতে পারলেন, এ কেবল তাঁর ভিতরের মহৎ প্রেরণার প্রভাবের সঙ্গে আচরণ-ক্ষেত্রে সংযম-শিক্ষাভ্যস্ত প্রথম জীবনের থেকে সীমা-মানা সুরুচি-শোভনতা ও সদাচার অভ্যাসের ফলেও অনেকটা সম্ভব হয়েছে।

পিতার সুমার্জিত স্নেহশীল মনের শিক্ষানুশাসন তিনি কোনো কোনো স্থলে কষ্টকর হলেও পালন করেছেন। তার থেকে লাভ হয়েছে তার সুদীর্ঘ জীবনের দৃঢ় নৈতিক ভিত্তি। কিন্তু ব্যক্তির বা সমাজের কুশ্রী অসভ্যতা বা নির্মম বিধিবিধানের বাড়াবাড়ি বা জবরদস্তি অথবা কোনো রকম একঘেয়েমিই তিনি সহজে মেনে নিতে পারেন নি। অনেক সময় মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সেইখানেই। বাল্যে স্কুল-সীমা ত্যাগ ঘটেছিল তাঁর এরই একটি কারণে। অনেক স্থলে বাইরে সীমার শাসন নিরুপায় হয়ে মেনে থাকলেও মনের চাপা অসন্তোষ ভিতরে-ভিতরে বেগ যুগিয়েছে সহজাত স্বাধীন প্রেরণার গতিবৃদ্ধিতেই। এই দিক দিয়েও তিনি বড় দিকেই এগিয়েছেন। ছেলেবেলার এইরূপ একটি প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে কবির জীবনপ্রান্ত অবধি প্রসারিত।

উদয়ের পর্বটিতে যিনি ছিলেন ভৃত্যের হাতে "গণ্ডি বন্ধনের বন্দী," দেখা যায় তিরোধানের প্রসঙ্গে মন তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ছুটেছে গণ্ডির বাইরে। মনের সেই সীমামুক্তির প্রবণতা হিন্দুর কাশীতে মৃত্যুর তাৎপর্য আলোচনার মধ্যে একদিন ব্যক্ত হয়েছে "যাত্রী" গ্রন্থে। লিখছেন—"কয়দিন

রুদ্ধকণ্ঠে সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে-পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্যশক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় প্রথম ইচ্ছার ধাক্কাটি ছিল দেশের আকাশে প্রাণটাকে মুক্ত করে দেওয়া। ক্রমে সেই ইচ্ছার বন্ধন শিথিল হয়ে এল। তখন মৃত্যুর পূর্বেই ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে প্রথা আমাদের দেশে আছে, তার অর্থটা মনে জেগে উঠল। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। জীবনের শেষক্ষণে মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের কোলাহল যদি জেগে ওঠে, তবে তাতেই বেস্থর কর্কশ হয়, মৃত্যুর সম্পূর্ণ সংগীত শুনতে পাইনে, মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দ চলে যায়।

বহুকাল হল আমি যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলাম, তখন মৃত্যুকালের যে-একটি মনোরম দৃশ্য চোখে পড়েছিল, তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। ঠিক মনে নেই, বোধ করি তখন শরৎকাল; নির্মল আকাশ থেকে প্রভাত-সূর্য জীবধাত্রী বসুন্ধরাকে আলোকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে। এপারের লোকালয়ের বিচিত্র চাঞ্চল্য, ওপারের প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে দেখি একটা ডিঙি নৌকা খরস্রোতে ছুটে চলেছে। আকাশের দিকে মুখ করে মুমূর্ষু স্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছে, তারি মাথার কাছে করতাল বাজিয়ে, উচ্চস্বরে কীর্তন চলছে। নিখিল বিশ্বের বক্ষের মাঝে মৃত্যুর যে পরম আহ্বান আমার কাছে তারি সুগম্ভীর সুরে আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠল।

"হিন্দু কাশীকে পৃথিবীর বাহিরের স্থান বলেই বিশ্বাস করে। তার কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা মায়া, পরমার্থত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়, সেখানে বিশ্বেশ্বরের আসন। অতএব বিশেষ দেশবাসীর কাছে বিশেষ দেশের যে আকর্ষণ বেগ তার প্রাণকে সেখানকার মাটী-জল আকাশের সঙ্গে নানা বিশেষ সূত্রে বাঁধে, কাশীর মধ্যে যেন পৃথিবীর সেই বিশেষ দেশগত বন্ধন নেই। অতএব যথার্থ হিন্দুর কানে মৃত্যুর মুক্তিবাণী কাশীতে বিশুদ্ধ সুরে প্রবেশ করে।"

অতঃপর এই সঙ্গেই আপন জীবনের অবসান-কামনাটিতে তাঁর নিবিড় এক বিশ্ববেদনা লেগে আছে, বলেছেন, "বর্তমান যুগে ন্যাশনাল বৈষয়িকতা বিশ্বব্যাপী হয়ে স্বদেশগত অহমিকাকে সুতীব্রভাবে প্রবল করে

তুলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংঘ-আশ্রিত অতি প্রকাণ্ডকায় রিপুই বর্তমান যুগের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। তাই সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল, আমিও যেন মুক্তির তীর্থক্ষেত্রে মরতে পারি, শেষ মুহূর্তে যেন বলতে পারি সকল দেশই আমার এক-দেশ, সর্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানব-প্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল প্রবাহিত।"

মৃত্যুর পূর্বে, চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় যাবার দিনকয়েক আগে একদিন সকালে ডঃ অমিয় চক্রবর্তী গিয়েছেন কবির সাক্ষাতে। কবি আছেন 'উদয়ন' গৃহের দোতালায়। পালঙ্কখানি পূর্ব দেয়াল ঘেঁষে জানালার কাছে রক্ষিত। খোলা জানলা দিয়ে সকালবেলার আলো এসে কবির রোগশয্যার বিষণ্ণতাকে শান্ত সতেজ জীবনাভায় করেছে মণ্ডিত। পিঠের তলায় কুশান, অর্ধশায়িত দেহ, কবি বাইরে চেয়ে ভোরের ছবি দেখছিলেন; অমিয়বাবু এসে বসলেন তাঁর পায়ের দিকে। কথা শুরু হল কবির জন্মোৎসব নিয়ে। বৈশাখের এই উৎসবের পালা এখনো চলেছে দেশময়। তাই নিয়ে অমিয়বাবু বলছিলেন, কত জায়গায় কত লোক এই নিয়ে আজ আনন্দ করছে। কবির জীবন একটি বিশ্বযোগের ভূমিকা গড়ে দিয়ে গেল। কবি বললেন,"যদি কিছু স্থায়ী কাজ করে থাকি, বলার বাহনটা দিয়েছি তৈরি করে।"

অমিয়বাবু: আপনি এ যুগের মন চিনিয়ে দিয়েছেন। যেমন দিয়েছেন ভাষা, তেমনি চেহারাও। পৃথিবীতে আপনাকে লোকে চিনেছে তার পরিচয় ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছে। জার্মানীতে, চীনে সমস্ত দেশের জনসাধারণ বুঝেছে যে, এ যুগেরই কথা আপনি তাদের বলেছেন।

গুরুদেব: আশ্চর্য হই; বেশীর ভাগ লোক তো আমার লেখা পড়েনি, জানে না। কিন্তু সংসর্গ পেয়েছে। একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে যা অন্তরের, যা স্থায়ী। বৃহৎ মানুষের লোকালয়ে এই যে ভালবাসার দান পেয়েছি তার মূলে আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ—নিকটে থাকার, জানার ইচ্ছা। কী করে যে হয়! যে সব দেশ আমার অত্যন্ত অগোচর ছিল, দেখতে দেখতে তারা আপন হয়ে গেল। দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপে কখনো যাব ভাবিনি, কিন্তু যখন যোগ হল, দেখলাম আমার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ নিবিড়। আমি যে মানুষকে শ্রদ্ধা করেছি।

অমিয়বাবু: এ-রকম ঘটনা পূর্বে হয়নি। নানাদেশের জনসাধারণ একইকালে গভীরভাবে পেয়েছে আপনাকে। আগেকার বড়ো আর্টিস্ট গ্যটে দান্তে সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু দেশে-দেশে তাঁদের এরূপ সাক্ষাৎ-পরিচয়ের যোগ ঘটেনি। তখনকার পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু শুধু তাই নয়। সর্ব-মানবিক সমাজের সঙ্গে আপনার জীবনের চিরন্তন যোগ আছে এই কথা সকলে মনে করছে।

গুরুদেব: তাদের কাছে ঢেলে দিয়েছি আমার প্রীতি, তাদের কাছে যা পেয়েছি তারও সীমা নেই। অপূর্ব আশ্চর্য ব্যাপার। খুব গভীরভাবেই আমি অনুভব করেছি মানুষের বিশ্বমানবতা। মানুষকে মানুষ যখন পায় তখন পায় কতখানি জিনিস,—জাত নেই, কাল নেই,—পরম মিলন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই মিলন অনুভব করেছিলাম। এক-এক জায়গায় গেছি, জেটিতে হাজার-হাজার লোক এসেছে নিয়ে যেতে—কেউ কাউকে চিনিনে, জানিনে, ভাষা বুঝিনে, কিন্তু বাধেনি তো কোথাও, তাদেরও না, আমারও না। সেখানে গেছে মানুষের কাছে মানুষ, এইটুকুই যা পরিচয়। আর আমাকে কোণে আনতে পারলে না। কিন্তু লোকে বোঝে না, ঠাট্টা করে। সত্য বোঝে না, অল্পলোকে পেয়েছে সে-জিনিস। সাহিত্যের খ্যাতি আলাদা, কিন্তু মানুষের টান সে অন্য।

অমিয়বাবু: আপনার সাহিত্যের অন্তরে যে-মানুষকে তারা দেখে সমস্ত যুগের প্রতিনিধিরূপে তার পরিচয়; অথচ সেই চিরন্তন মানুষের যেন কোনো পূর্বাপর নেই, নিজের ভিতরেই সম্পূর্ণ, তার ভূমিকা তার নিজেরই সৃষ্টি।

গুরুদেব বললেন, "জয়ন্তীটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে খুব ভালো।"

অমিয়বাবু বললেন, "বাংলাদেশ যেমন করে হোক তার মনের কথা বলতে চায়—আপনাকে বাংলাদেশ আজ সুদূর পল্লীতে-পল্লীতে কিভাবে গ্রহণ করেছে তা এখন বোঝা যায়।"

গুরুদেবের শেষ উক্তিটি এই,—"আমি জয় করেছি বাঙালির হৃদয়কে। তা আমি জানি। আমাকে হারালে বাঙালি আপনাকে হারাবে।"

সর্বদেহ দিয়ে যেন কবি কথা বলছিলেন। অমিয়বাবু তখন বিদেশ ঘুরে এসেছেন, নিয়ে এসেছেন বিশ্বমনের তাজা আবহাওয়া, নানাদিক দিয়ে আধুনিক যোগ তাঁর মধ্যে তখন সক্রিয়। অন্তরঙ্গ যোগ্য অনুবর্তীকে বিশেষ একটি সময়ে কাছে পেয়ে বলতে-বলতে কবির দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরে আসছিল অপূর্ব

উজ্জ্বলতা। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ যে পরম বেদনার মিলন কবি চেয়েছিলেন, তিনি যে তা পেয়েছিলেন বাস্তবেও—সেদিনকার সেই উদ্দীপ্ত মুখাবয়বই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার বড় সাক্ষ্য। আলাপের মাঝে মাঝে বিদেশ-প্রত্যাগত এবং স্বদেশেরও অভিজ্ঞ অমিয়বাবুর থেকে তখনকার লোকের ধারণা জানতে পেয়ে মুখের সে দীপ্তিতে লাগছিল আনন্দের ছোঁয়া। এইটিই কবির এ ধরনের শেষ আলাপ, বোধ হয় ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গেও এই হয় তাঁর শান্তিনিকেতনে শেষ সাক্ষাৎ, পরে কলকাতায় দেখা হয়েছিল, সে-বিষয় তিনি নিজেই লিখেছেন। এ আলাপে কবির প্রথম এবং শেষ কথা—সব-কিছু দিয়ে ভাষা দিয়েছেন তিনি হৃদয়কে। সে হৃদয় বাঙালির হৃদয়, পৌঁছেচে তা নিখিল হৃদয়ে। এইখানেই তাঁর জীবনের সার্থকতা, এতেই তাঁর শেষ আনন্দ।

প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবেসেছিলেন কবি গভীরভাবে। তিনি যে কর্মপীঠ গড়ে গিয়েছেন, সেখানেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের স্বীকৃতি। মহানগরীতেই ছিল তাঁর জন্ম ও বংশানুগত কর্মকেন্দ্র। বংশের মধ্যে স্থায়ীভাবে তিনিই প্রথম সে-গণ্ডি ত্যাগ ক'রে এই মানুষ ও প্রকৃতির যোগযুক্ত আশ্রমজীবন বরণ করেছিলেন। সেখানে সর্বলোকের আত্মীয়তায় গড়া সে আশ্রম দিয়েছিল তাঁকে সার্বজনীন মানুষের ঘরে দ্বিতীয় জন্ম। তারপরে তাঁর জীবনের বিকাশ হয়েছে নানাকর্মে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরভাবে ক্রমেই আরো বড়ো জগতে।

তাঁর মতো করে, তিনি বলেছেন,—"দেশের কাজ করিনি, বিশ্বের কাজ তো করিই নি। শুধু এই কাজ করেছি, বিশ্বের রস আকর্ষণ করেছি—লোকের চিত্ত থেকে, দেশের মাটি থেকে। অত্যন্ত সত্য যে সে রকম করে আর কেউ তখন দেখেনি।"

কিন্তু তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলি এই বলে যে, যেমন এক প্রেরণায় তিনি বিশ্বের ঐ রস আকর্ষণ করেছেন তাঁর সাহিত্যে,—তেমনি প্রেরণার আর এক টান একদিন তাঁকে সুরম্য অট্টালিকা থেকে নামিয়ে প্লেগের পাড়ায় ঘুরিয়েছিল, আস্তাবলে নিয়ে দরিদ্র সইসদের দিয়েছিল কোল, মসজিদে ঠেলে দিয়ে মুসলমানদের পরিয়েছিল রাখি, জাতি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে একদিন নিয়েছে তাঁকে চীনে, নিয়েছে জাপানে-পারস্যে, জাভায়-বালিতে। রাশিয়া-নরোয়েতে, পৃথিবীর নানাস্থানে নিয়ে তাঁকে দিয়েছে বড়ো ঘর। এই জীবন

পরিক্রমার মধ্য দিয়েই দেখা যাচ্ছে তিনি অন্তত বসে কেবল কাব্যই লেখেন নি। শেষদিকে কিঞ্চিৎ বিচলিত অবস্থায় বলে ফেলেছিলেন সে-কথা নিজেও। "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে তাঁর মৌলিক ঐ উক্তিস্থলে অন্যত্র লেখা আছে, "কর্মজীবনে আমিও নেমেছিলুম একদিন। হয়তো আমার অনধিকার চর্চা—হয়তো তাতে সার্থকও হই নি—ভালো রকম করতে পারি নি—ওতো সত্যি আমার কাজ নয়, কিন্তু বেদনা বেজেছিল বুকে, চুপ করে থাকতে পারি নি।...এই দারিদ্র্য, বিচ্ছিন্নতা, মলিনতা দেখা যায় না; তা আমার কবিত্বকে আঘাত করেছিল, আমাকে লাগতে হল অবশেষে।"

ধর্মসাধনায় এবং কর্মসাধনায় সর্বত্র বরাবরই তাঁর কথা, তিনি কবিমাত্র। কিন্তু ভাষণে, সংগীতে, নৃত্যে, নাট্যে, চিত্রে, শিক্ষায়, ধর্মদেশনায়, সংগঠনে নানা দিকে তাঁর যে শক্তির বিকাশ, তাতে সাধক, মনীষী ও কর্মীর পরিচয়ও তাঁর মধ্যে অনেকখানিই আছে। কবি, কর্মী ও মনীষীরূপে একজন মহাজ্ঞানী মহাশক্তিমান শিল্পী হওয়া ছাড়াও সকলের জীবনে প্রবেশের বেদনায় মানুষ হিসাবে তাঁর মূল্য কম নয়। এদিকে তাঁর যা কাজ, তাঁর কাছে সেটা অবশ্য কবিকর্ম বা কবির জীবন-শিল্প। তা, কবিপ্রেরণারই প্রবল প্রবর্তনার অপ্রতিরোধী স্বাভাবিক অনুক্রিয়ামাত্র তা হলেও আজ তো এও দেখা যাচ্ছে যেমন মহা-কবিদের সঙ্গে তেমনি মহামানবদের নামের সঙ্গেও তাঁর নাম উচ্চারিত। এখানেই তাঁর ভারতদৃষ্টির স্বধর্মের জয়। কবি হয়েই হয়েছেন তিনি মহামানব।

"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে কবির আর একটি উক্তি আছে,—"শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র আলাদা। মানুষের দুঃখ মোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা, তাঁরা তো শিল্পী নন, কবি নন, তাঁরা মহাপ্রাণ।" কিন্তু শিল্পী ও কবি হয়ে তিনি যা করেছেন, তাঁকেও তাতে মহাপ্রাণ করে তুলেছে। এইরূপে অবাধ উদার সহজাত সহজ কাব্যোপলব্ধিকে বাস্তব জীবনের জটিল কঠোর বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্য করে পেয়ে তিনি সত্যিকার উপলব্ধি পেয়েছিলেন।

কবির যিনি লক্ষ্য সেই সর্বানুভূঃ মহামানব ঈশ্বর,—তিনি যেমন মহতো মহীয়ান্, তেমনি অনরণীয়ান্। তিনি অতি বড়োর বড়ো আবার অতি ছোটোরওতিনি ছোটো,—দুদিকেই তাঁর মতো অমন বড়ো আর নেই। বড়োর কথা রেখে সর্বানুভূঃ সত্তার ছোটো অংশে কত সামান্য জিনিসেরও কত গভীরে বিশ্বকবির প্রবেশ-চেষ্টা ছিল, একটি ঘটনায় তা এবারে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

ঘটনাটির সঙ্গে একটি কবিতার যোগ আছে। অবশ্য কাব্যগত ঘটনার সত্য নির্ভর করে কবির সৃজন-কুশলতায়। ভাবের প্রকাশকে সার্থক করতে যতটা সহায় হয়, ঘটনার মূল্য কবিতার মধ্যে ততটাই মাত্র। ঘটনার সত্য মিথ্যা দিয়ে কবিতার মূল্য নয়। এজন্য কবিতার মধ্যে কবি বাস্তবের ছাপ অনেক ক্ষেত্রে রেখে গেলেও পাঠক প্রায়ই আগে থেকে ধরে নেয় সেটা কবি-কল্পনারই চাতুর্যমাত্র। কাব্যোল্লিখিত বাস্তবের বাস্তবতায় তাঁরা সেজন্য বড়ো একটা বিশ্বাসী হন না, তা নিয়ে ব্যস্তও হন না। কবিকে বোঝবার জন্য নয়, কিন্তু তার মানুষটিকে বোঝবার জন্য ঘটনা দরকার হয়। এখানেও তাই হচ্ছে। যে কবিতাটির কথা বলা হচ্ছে, তার পটভূমি সত্যই বাস্তব ভিত্তিযুক্ত। অতি সামান্যের প্রতিও কবি-মানুষটির দৈনন্দিন জীবনের বেদনা-ব্যাকুলতার কিছু নিদর্শন নিয়ে রয়েছে কবির শেষদিককার কাব্য "নবজাতক"এর 'প্রজাপতি' কবিতাটি। এ সম্পর্কীয় যা ঘটনা, তার মধ্যেও প্রকাশ পাবে কবির সীমার বাধার বেদনা, আর সেই সঙ্গেই সেই বেদনার থেকেই, বাধা সরিয়ে তাঁর অসীমে সর্বত্র প্রবেশের এক তীব্র অন্তঃপ্রবর্তনা।

নূতন দিনের রবির আলোর সঙ্গে কবির কাব্যের আলো নূতন কী রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এইটি ছিল কবির আশে-পাশে একটি প্রাত্যহিক প্রতীক্ষা। কবিও সেটি অনুভব করতেন এবং হৃষ্টচিত্তে সেই মূক আগ্রহের অর্ঘ্য গ্রহণ করতেন প্রায়ই এক বা একাধিক নূতন রচনা এগিয়ে দিয়ে। সে-কথা তিনি অবশ্য নিজেই রোগশয্যার এক ছড়ায় বলে গেছেন। এই চোখের দেখা হাজার জানা বাস্তবের মধ্যে কোথার থেকে কী এমন একটা আশ্চর্যরূপে কবিতা হয়ে উঠবে, যা হবে কালে কালের রসপ্রস্রবণ? রসের অপূর্ব ব্যঞ্জনা উপভোগ করবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি থেকে সেই বাস্তব জিনিসটাও আবিষ্কার করা ছিল কবি-অনুচরের পরম এক কৌতূহলের বিষয়। জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসু মনের পাত্রাপাত্র বিচার মানত না। কবিতাটি হাতে পেলেই সেই মূল উৎস নিয়ে কবিরই প্রশ্রয়ে কবির সঙ্গে অনুচরের স্বভাবতই চলত দু'চার কথা। ১৯৩৯ সালের ভরা বসন্ত দিন। কবি "শ্যামলী" গৃহবাসী। সে দিন স্নান থেকে এসেই কবিতাটি কবি এগিয়ে দিলেন। উদ্‌ভ্রান্তভাবে সেই সঙ্গে বলে চললেন,—মনের কী রকম একটা অবস্থা হয়েছে, সব কিছুই জানতে ইচ্ছে হয়, জানতে পাইনে। এত যে পড়ি, যতই জানি—হঠাৎ এক-এক সময় একটা সামান্য ঘটনায় মনে হয়, কিছুই জানিনে, কোনো দিন যে জানতেও পারব

না, এইটেই আরো অসহ্য। এই যে পিঁপড়েটা মাটিতে চলে যাচ্ছে, এর জানা তো আমার জানা হয়ে ওঠেনি। দেশকালের ধারণা ওর কী রকম, কে জানে! একটা বড়ো মাটির জালার মধ্যে ওকে পুরে ঘোরালে, অবস্থার তারতম্য ওর কাছে কিছুই যেমন লাগবার কথা নয়, আমাদেরও তো অবস্থাটা অনেকটা সেই রকমই। যেখানে আছি সেই পৃথিবীকে কিছুটা জানি বটে, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই মস্ত পৃথিবীই বা কোথায়, আমাদের তো কথাই ওঠে না। কিন্তু এত ক্ষুদ্র এই আমাদের সঙ্গেও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম যোগ চলেছে অহরহই। জ্যোতিষীরা রাশি-নক্ষত্র গুণে ভবিষ্যৎ বলেন, মুনি ঋষিরা ধ্যানবলে করেন দৈববাণী। অঙ্কে আমরা অর্বুদ অক্ষৌহিণীর ধারণা যদি বা পাই, সে তো কত তুচ্ছ, বিজ্ঞানে আজ গ্রহাদির ভার ও দূরত্ব মাপ চলেছে যে অঙ্কসংখ্যায়, সে কি আমাদের সাধারণের ধারণার জিনিস? কিন্তু ঋষি বিজ্ঞানীরা বিশেষ পথে তা তো জেনে থাকেন। আমাদের কাছে যেটা ভবিষ্যতে সামনে হবে, তাঁদের কাছে রাশি-নক্ষত্রের অঙ্কপাতের ফলাফল বা ধ্যানদৃষ্টির প্রসার থেকে আগে থেকেই অতীতে তা হয়েই আছে। আধুনিক বিজ্ঞানে, বড়ো থেকে বড়ো করে জানার দিকেও যেমন, ছোটো থেকে ছোটো করে জানার দিকেও তেমনি মহৎ দৃষ্টি লাভের সাধনা চলছে। অসংখ্য জিনিস কাছে থেকেও কত আলাদা। যে যার গতি নিয়ে আছে। কিন্তু বিশেষ অনুশীলনে সে গতি অনেকে আবার পেরিয়েও যান। বই পড়ি আর অবাক হই। শোনা যায় অনেকে পশু-পক্ষীর ভাষাও নাকি বোঝেন, পৌরাণিক গল্পেও সে-কথা পাওয়া যায়, তাই ভাবছিলাম, কীট-পতঙ্গের অনুভূতিটুকু তো আমার নেই। আমরা ওদের কাছে আছি কি ভাবে? আমাদের কাছে ওদের সত্তা অনেক স্থলে অবান্তর, যখন কামড়ায় তখনই চেতনা জাগে ওদের সম্বন্ধে, আর, এই যে ওদের পাশ দিয়ে হাঁটি-চলি, ওরাই কি তোয়াক্কা রাখে আমাদের? বাঘকে দেখে আমি ভয় পাব, একটা প্রজাপতি তো পাবে না। মধুর মধ্যে প্রজাপতি লুটে আছে, কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য ওর কাছে নেই। ওর জগৎ যত ক্ষুদ্রই হোক, ওর অনুভূতির কাছে তার যা রূপ রস, ভোগের যা নিবিড়তা, সে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে; সেইজন্যেই চিরকাল রইল আমার কাছে একদিক দিয়ে ওর বিশিষ্টতা, তা মূল্যের অতীত। কাল রাত্রে স্নানের ঘরে মুখ ধুতে গিয়ে টেবিলের উপর লক্ষ্য করছিলাম একটা প্রজাপতি। আজ সকালেও দেখি সেটা সেইখানেই;

বুঝলাম ওটা মৃত। আমার ঘরে ও কিসের খোঁজে এসেছিল। ঢুকে পড়ে আর বেরতে পারেনি। কিসে থেকে ওর মৃত্যু ঘটল। আমি থাকি আমার কবিতা নিয়ে। ওর বোধের কাছে তার অস্তিত্ব নেই। তেমনি ওর বোধ আমি পাইনে বলে ওর যেটা সত্য, আমার কাছে সেটা হয়তো মিথ্যা। এই তো চারপাশে কত ফাঁকা দেখছি, কিন্তু এখনই কত জীবাণু ঐখানে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারা নিশ্চয়ই ঐ ফাঁকার মধ্যে কত কী দেখছে। অন্যদিকে তেমনি এমন অনুভূতিময় সর্বব্যাপী দ্রষ্টা পুরুষ এখনই এখানেও আছেন, যাঁর কাছে আমরাও ঐ প্রজাপতির মতো আপেক্ষিক সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্মাংশ মাত্র। যা জানিনে, তা আমাদের কাছে থেকেও নেই। কিন্তু তিনি আছেনই হয়তো, কেবল তাঁর লোকের আলো আমার চোখে নেই। আমি চারপাশে মাত্র শূন্যই দেখছি। ঐ প্রজাপতি, আর আমি,—আমরা আলাদা বোধের জগৎ-সীমায় যার যার কোঠায় বাঁধা। ওর চোখের আলো যদি পেতাম, ওর অনুভূতি !

কবি তখন বিজ্ঞানের বই পড়ছেন। শেষ বয়সে সে এক নূতন জগৎ তাঁর রহস্যদ্বারা ঈষৎ উন্মোচন করেছে ; তার মহলে মহলে ঘুরে দেখবার জন্য কবি প্রবেশব্যগ্র, কিন্তু চাবি যত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন ততই সময় নেই জেনে হয়ে উঠেছেন আরো কাতর। দিনগুলি এইভাবেই কাটছে। কবিতায় তার ছায়া পড়েছে মাত্র।

কবিতাটিতে কবি-কল্পনা বাস্তবকে সর্বাংশে অকৃত্রিম খাঁটি থাকতে দেয় নি। স্নানের ঘর এবং প্রসাধনের টেবিল রূপান্তরিত হয়েছে এতে "লেখার ঘর" ও "শেলফে"। কবির সৌন্দর্যশিল্পে বাথরুম তখনো আধুনিকতার অধিকার মঞ্জুর করাতে পারেনি, বিশেষত এই রকম গুরুগম্ভীর কবিতার ক্ষেত্র।

স্মৃতি-সূত্রে টান পড়ে এই প্রসঙ্গে, মনে আসছে আর-এক দিনের কথা। ১৩৪৩ সনের বৈশাখ। চলছে কবির "পত্রপুট" কাব্যের পালা। তার তেরো নম্বরের কবিতাটি সেই দিনই কি তার আগের দু'একদিনের মধ্যেই লেখা হয়েছে। কপি করে এনে দেওয়া গেল কবির হাতে। কবি তখন "কোনর্ক"বাসী। "কোনর্ক" গৃহের বারান্দার সামনে যে শিমুল গাছটি আছে, তার তলায় বসেছেন কবি সকাল বেলার কাজে। লেখার টেবিল পাতা রয়েছে সামনে। সদ্য রচিত পূর্বোক্ত কবিতার কথাই চলছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাব্যোপহার এসে পৌঁছেচে হাতে, সেই ডাকেই। প্যাকেট

থেকে বই খুলে উল্টেপাল্টে দেখছেন। হঠাৎ বললেন, "আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে চেয়েছি, এর মধ্যে দেখেছি কত সবল সুন্দর তার প্রকাশ।" বিশ্বকে সর্বঅনুভবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে লেখা কবির "পত্রপুটে"র সেই তেরো নম্বরের কবিতাটি। সে বেদনা তাঁকে এমনি পেয়ে বসেছে, দিনরাত ঐ ভাবছেন আর লিখছেন, কাটছেন, যোগ করছেন; কবিতা লিখেও মনের ভার কমেনি, একটার পর আর-একটা লিখছেন। বারো নম্বরের কবিতাটিতে তার আগে মর্মান্তিক বেদনা জানিয়েছেন বিশ্ব-জীবনের বিশেষ বিশেষ বাস্তব অভিজ্ঞতার অক্ষমতা নিয়ে। তাতে শেষটায় লিখেছেন,—

> মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
> যে উদ্ধার করে জীবনকে
> সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
> ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
> অপারস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।
> ....ব্যূহভেদ করে
> স্থান নিইনি যুধ্যমান দেবলোকের
> সংগ্রাম সহকারিতায়।
> কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরুগুরু,
> কেবল সমর যাত্রীর পদপাত কম্পন
> মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।
>
> যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
> সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয় জ্যোতি
> ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
> শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
> মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,
> মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
> মৃত্যুর মূল্যে দুঃখের দীপ্তিতে।

এতেও হয়নি, আরো সুনির্দিষ্ট যথাযথ সতেজ রূপ দেওয়ার কথাই মনে ঘুরছে, বয়োকনিষ্ঠ অন্য কবির মধ্যে স্বীয় অনুভবের সার্থকতর সাড়া পেয়ে

নিজের শিল্পক্ষুণ্ণ রচনার বেদনা ছাপিয়ে উঠেছিল সেই অপরের প্রশস্তিবাদ অকুণ্ঠ উৎসাহে। বইটি তখনো অবশ্য দেখা হয়নি। কবির কথাই কবির রচনা সম্পর্কে শেষ কথা কিনা, সেই সাধারণ সন্দেহ নিয়েই নীরব ঔৎসুক্যে অনুসরণ করে যাওয়া চলছে কবির সেই আকস্মিক উদ্দীপনা।

শালিখ পাখিগুলি ডালে ডালে তখন ফুটন্ত রক্তদল শিমুলফুলের গূঢ়গর্ভে ঠোঁট সিঁধিয়ে একমনে মধুপানরত, দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ একত্রে সংযোগ করে, কপাল ও চোখের কোণ কুঁচকে চেয়ে বিশেষ নিবিষ্টতার সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে কবি বলে উঠলেন,—ওদের মতো অমনি করে পানের নিবিড় উপলব্ধি যদি পাওয়া যেত বিশ্বের সব কিছু থেকে। এর আগেই উক্ত তেরো নম্বর কবিতায় সন্নিবেশিত হয়ে গেছে "সর্বগৃধ্ন চেতনা" শব্দটি।

প্রজাপতি ও শালিখের অনুভূতির মধ্যে প্রবেশের এই মানসিক চাঞ্চল্য কবিদের সর্বানুভূতির আর-একটি ছবি স্মরণ করায়; ভোরের রোদে চাতালে চড়াই পাখির খুদ খাওয়ার আনন্দ-নৃত্য দেখে বিদেশের এক কবি বলেছেন "আমি চড়াই হয়ে গেছি।" এই সঙ্গে মনে পড়ে কবিরই "পুনশ্চ" কাব্য-গ্রন্থের 'ছেলেটা' কবিতা-লেখক কবিকে। সেখানে অম্বিকে মাষ্টার যখন দুঃখ করে ছেলেটার সম্বন্ধে কবির কাছে বলল,—

"শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়
বলে, 'ইঁদুরে কেটেছে'।
এতো বড় বাঁদর।"

তখন কবির জবানি হচ্ছে,—

আমি বললুম, "সে ত্রুটি আমারই;
থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তাহলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি
কি পেরেছি লিখতে
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি।"

এই সঙ্গে এই "পুনশ্চ" গ্রন্থেরই পরবর্তী কবিতা 'কীটের সংসার' দ্রষ্টব্য। তাতে আছে,—

"ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে,
আমার সুখদুঃখের ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।"

কেবল কবিতার মধ্যেই নয়, প্রাত্যহিক জীবনের চলাচল্‌তির মধ্যেও, লেখা অনুযায়ী বাস্তব পরিচয় কবিজীবনের সর্বত্র মেলা কঠিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষাৎ থেকে দেখে মনে হয়েছে, শুধু এঁর মধ্যকার কবি নন, এই মানুষটিই বলতে পারেন,—

"যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা—
ছোটো বড়ো হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা।"

সর্বানুভূতির একথা কেবল কবিরই ভাষার বাঁধুনি নয়,—জীবনের সব দিয়ে এ মানুষেরই অনুভবের কথা।

মহান দ্যুলোকের সঙ্গে পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত সর্বত্র এক অনন্তের আনন্দকে উপলব্ধি করে এই কবি মানুষটিই একদিন অন্তিম রোগশয্যা থেকে অবশেষে গেয়ে গেছেন,—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী। * * *
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, "তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের
মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে
নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।"

২

মানুষের জীবন সম্মুখে কতদূর এগোতে পারে তার এক সীমা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ; মানুষ পিছিয়ে যে কোথায় পড়ে আছে, তার সন্ধানেও তাঁর দৃষ্টি ছিল অতন্দ্র। পুরাকালের পুরাণ-ইতিহাসের থেকে শুরু করে বর্তমানে জটিল বাস্তবের নানাক্ষেত্রে তাঁর সেই সন্ধানের পরিচয় তিনি নিজেই রেখে গেছেন। সেকালের সত্যকাম জাবালকে, কুলহীন কর্ণকে তিনি মানুষের সত্যে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন। মানুষের বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত জীবনের কথা একালেও তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে মহত্ত্বের চেয়ে দুর্গতির কালিমাতেই কেবল যেখানে মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এমন ঘটনারও অভাব নেই। মানুষের খবরাখবরে কবির আগ্রহ কি সুদূর প্রসারী ছিল, কত ছিল তা আন্তরিক,—এই ঘটনাগুলির মধ্যে তারই পরিচয় প্রকাশ পায়।

শিলাইদহের ঘটনা। কবি "প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে" গিয়েছেন। "বৈঠকখানার এক জায়গায়" তক্তপোষের এককোণে দেখতে পেলেন "জাজিম-তোলা"। প্রজা-শ্রেণীর বিশেষ জাতের মানুষদের বসবার জন্য স্বাদেশিকতা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ নায়েবের কৃত এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা তিনি জানতে পেলেন। মানুষের অমর্যাদার বেদনাময় এই বাস্তব ঘটনা একদিন ফুটে উঠল তাঁর গদ্য-আলেখ্যে।

তাঁর সেই "ছেলেবেলার" চোরকে স্বচক্ষে দেখার ঘটনাটিও আমরা ভুলব না। লিখেছেন—"(চোর) আমাদেরই বাড়ী থেকে অত্যন্ত ত্রস্ত হয়ে দরোয়ানদের লক্ষ্য এড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিস্মিত হয়ে দেখলুম, সে নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই মতো, এমন কি তার চেয়ে দুর্বল।" এর পরে "আর একটি অভিজ্ঞতার কথা" উল্লেখযোগ্য। "এ ঘটেছিল পরের বয়সে।" কবি লিখছেন "একদিন কোলকাতার রাস্তায় যেতে যেতে দেখলুম, পুলিশ একজন আসামীকে—সে অপরাধ ক'রে থাকতেও পারে নাও পারে—কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে সমস্ত রাস্তার জনতার মাঝখান দিয়ে। মানুষকে এমন জন্তুর মতো ক'রে বেঁধে নিয়ে যাওয়া; এতে আমাদের সকলেরই অপমান। আমার মনে এত যে লেগেছিল তার একটা কারণ, এরকম কুদৃশ্য আমি ইংলণ্ডে বা ইউরোপের আর কোথাও দেখিনি। এর

মধ্যে দুটো আঘাত একত্রে ছিল—এক হচ্ছে মানুষের প্রতি অপমান ; আর এক, বিশেষভাবে আমার দেশের লোকের প্রতি অপমান—এক হচ্ছে আইন-ভাঙা অপরাধীর প্রতি নির্দয়তা : আর এক, আমাদের স্বদেশীয় অপরাধীর প্রতি অবজ্ঞা। সুতরাং সেই অবজ্ঞার ভাগী আমরা সকলেই। আমাদের দেশেই বিধিনির্দিষ্ট দণ্ড প্রয়োগের অতিরিক্ত অপমান-প্রয়োগ সমস্ত জাতকে লাঞ্ছিত করে।"

মানুষকে কবি স্বদেশেই কেবল দেখেন নি ; "মনুষ্যত্বের·········বিকৃতি" যেখানেই তাঁর চোখে পড়েছে, মূল্য বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষকে তিনি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে আপন সমবেদনার ধারায় সিঞ্চিত করেছেন, তাকে মানুষ বলে তুলে ধরতে চেয়েছেন মানুষের কাছে। লিখেছেন, "একটা দৃষ্টান্ত অনেকদিন পরে আমি আজও ভুলতে পারিনি। চীন যাত্রাকালে আমাদের জাহাজ পৌছাল হংকং বন্দরে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম, একজন চীনা ফেরিওয়ালা জাহাজের যাত্রীদের কাছে পণ্য বিক্রি করবার চেষ্টায় তীরে এসেছিল। তাদের নিষেধ করবার নিয়ম হয়তো ছিল। সেই কর্তব্য পালনের উপলক্ষে দেখলুম, আমাদের স্বদেশীয় শিখ কনেষ্টবল তার বেণী ধরে টেনে অনায়াসে তাকে লাথি মারলে। রূঢ়তা করার দ্বারা ঔদ্ধত্যের যে আনন্দ আদিম অসংস্কৃত বুদ্ধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে দণ্ডনীতির অসভ্যতাই তাকে অবারিত করবার সুযোগ দেয়।"

এ প্রসঙ্গে আরো দু-একটি ঘটনার কথা কবির লেখা থেকেই জানা যায়। লিখেছেন,—"আমি এক সময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগ্ন হয়ে শীতের মধ্যে তিনদিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক পাশ দিয়েই শতশত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁলো না। সেই অজ্ঞাত-কুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে। জাত বলে একটা কোন্ পদার্থ তাদের আছে মানব-জাতীয়তার চেয়েও তাকে বড়ো বলে জেনেছে।"

কবির জানা একজন প্রাচীন অধ্যাপক কবিকে বলেছিলেন, "তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয় রোগে পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নিচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই

চালা সে বললে পারবো না।···তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় রাত্রে শিলাবৃষ্টি হল ; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে মরে পড়ে আছে।" (কালান্তর) ঘটনাটির উল্লেখ করে কবি বলেছেন, "পাপপুণ্যের বিচার এত বড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে। মানুষকে ভালোবাসায় অশুচিতা, তাকে মনুষ্যোচিত সম্মান করার অপরাধ। আর জলে ডুব দিলেই সব অপরাধ স্খালন। এর থেকে মনে হয়, যে-অভাব মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো অভাব সে প্রেমের অভাব। সে প্রেমের অভাবকে সহৃদয়ে নিয়ে আমরা যাকে শুচিতা বলে থাকি, তাকে রক্ষা করতে পারি কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে পারিনে।" (কালান্তর)

কবি শিলাইদহ থাকার কালেই আরেকটি ঘটনা ঘটে। স্থানীয় জেলেদের উপর "জলকরের কর্তার কর্মচারী এসে অনধিকারে" ক্রমাগত জুলুম করত। সে-অন্যায় সহ্য করতে না পেরে জেলেরা একদিন কর্মচারীর "কান কেটে" দেয়। তখন, রাত্রি দু'পহরে কবির নিকট খবর এল জেলেপাড়ায় "পুলিশ লেগেছে"। পুলিশের "কঠোর আচরণ থেকে মেয়েদের ছেলেদের রক্ষা" করবার জন্য কবি তাঁর নিজের লোক জেলেপাড়ায় ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনাটুকুরও উল্লেখ আছে কবির "কালান্তর" গ্রন্থের লেখার মধ্যেই।

কবির জীবনে বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে অনেকই। জাতির অপমানে, দেশের দুর্ভিক্ষে ও নানাসঙ্কটে নানা সময়েই তিনি সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু পথেঘাটের ছোটখাটো এই ঘটনাগুলির মধ্যে মানুষের জন্য তাঁর "প্রেমের" গভীরতা আরো বেশী অনুভবযোগ্য।

কবি বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষের যে দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে-দেশে আপনিই বড়ো হয়। সেখানে মানুষ বড়ো করে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে এবং বাধা পেলে শেষপর্যন্ত লড়াই করতে থাকে।······যে জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎ-করতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবী করবার অধিকার পাচ্ছে। এই জন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কি করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে,

ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।” (কালান্তর)

এস্থলে মানুষের ভদ্রস্তরের যে ধারণা রবীন্দ্রনাথ দান করলেন, তার মাপ-কাঠিতে আমাদের জনসাধারণের অবস্থাটা কি পর্যায়ে আছে, উদ্ধৃত ঘটনাগুলির সাহায্যে তার তৌল করা চলবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—“আমরা বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এমনি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে নিজে হাত জোড় করে বলছে আমি ছোটো। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল্য করতে চেষ্টা করলে তারাই সবচেয়ে বেশী আপত্তি করে।”

রবীন্দ্রনাথের এই বাণী যাদের সম্বন্ধে ধ্বনিত হয়েছে, তাদের কাছে কি আজও রবীন্দ্রনাথকে আমরা পৌছে দিতে পেরেছি। যারা নিজেদেরই সম্বন্ধে উদাসীন, রবীন্দ্রনাথকে তারা যদি না জেনে থাকে, তাতে আশ্চর্য নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁদের আনন্দ, তাঁরা যতভাবে সেই আনন্দ উপভোগ করার আয়োজন করে থাকুন, তার সঙ্গে সামাজিক সর্বাঙ্গীণ যোগের কথাটি অবশ্যই তাঁরা স্মরণ রাখবেন এবং সেই সূত্রে আত্ম-অবজ্ঞাত জনসাধারণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ-সাধনার আয়োজনও আশা করা যায় তাঁদের আনন্দেরই বিষয় হয়ে উঠবে। পাড়াগাঁয়েরও ঘরে ঘরে রবীন্দ্র-উৎসবের সাড়া পড়বে, এমনটি হওয়া চাই। তবেই না, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত সর্বাঙ্গীণ যোগ এগোবে সার্থকতার পথে।

জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ সৃষ্টি, এই হচ্ছে মানুষের পরম ধর্ম। কত দিক দিয়ে সে যোগ সৃষ্টি কত গভীর করে করা যায়, তারই উপরে নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথকেও পাওয়া।

শহরের পাঁচিলে-পাঁচিলে আর পাড়াগাঁয়ের বনে-জঙ্গলে-ঘেরা হয়ে আলো-বাতাসের স্পর্শ থেকে আমরা থাকি বঞ্চিত। বেঁচে থাকার জন্য জানালা-কপাট খুলে, ঝোপঝাপ সরিয়ে আলো-বাতাসের চলাচলকে ওরি মধ্যে পথ করে দিতে হয় আমাদেরই। মানুষের মনের আলো-বাতাসের যোগান নিয়ে রয়েছেন চিরজ্যোতির্ময় রবীন্দ্রনাথ। সকলের জন্যেই তাঁর দান রয়েছে অজস্র ছড়ানো। জাতির সমৃদ্ধির জন্য তাঁকেও পাওয়ার পথ করে নিতে হবে জাতির ঘরে ঘরে জাতীয় চেষ্টাতেই।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের চিরসুহৃদ হয়ে আছেন—আনন্দের ক্ষেত্রে; তাঁকে পাই জীবনযাত্রায় সমস্যাসঙ্কুল নিত্যপ্রয়োজনের ক্ষেত্রেও। তিনি ধনীর, তিনি দরিদ্রের, তিনি দেশের, তিনি বিদেশেরও, শিশু, বৃদ্ধ, নর-নারী, ছোটো-বড়ো সকলেরই সমবয়সী তিনি। তাঁর কাছে এসে ফিরে যাবে না কেউ। তাঁর কাছ থেকে বয়ে আসছে প্রাণের প্রবাহ, তিনি যোগাচ্ছেন 'ভাববার কথা'।

মানুষকে ডাক দিয়েছেন তিনি সৃষ্টির কাজে। পশুরা ঠেকে আছে জৈব বৃত্তির বাঁধাধরা পুনরাবর্তনের সীমায়। মানুষ এগিয়ে চলেছে নূতন নূতন উদ্ভাবনার প্রবর্তনায়। রবীন্দ্রনাথের জীবন এই প্রবর্তনারই বিপুল বিচিত্র মহৎ এক পরিণতি। নিত্য নূতন ছন্দ ফুটেছে তাঁর কাব্যে গানে; নৃত্যে চিত্রে অভিনয়ে তাঁর আনন্দ সৃষ্টির নব উদ্দীপনা উৎসারিত। সেবা এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সৃষ্টির আবেগ জাগিয়ে মানুষকে উত্তীর্ণ করে নিতে চেয়েছেন তিনি তার পরম সার্থকতায়।

তাঁর 'চিরজনমের ভিটা' এই পৃথিবীর 'গিঁঠাতে গিঁঠাতে' তিনি জড়িত। আবার তিনিই গাইছেন,—"আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী।" তাঁর মধ্যে ভালোবাসার অন্ত নেই, তেমনি নেই গতিরও অন্ত। তাঁর সব কিছুর স্থিতি হচ্ছে এক সমগ্রের বোধের মধ্যে।

এই সমগ্রের বোধটিই হচ্ছে সংসারের শুচির সম্পদ। ঝড়ঝঞ্ঝায় যতই আমাদের বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত করুক, এই বোধ সমাজে জাগ্রত থাকলে সকলেই সকলের যোগে সবকিছু একদিন ফিরে পেতে পারি। আপাতদৃশ্য বিচ্ছিন্ন বিচিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমন্বিত সমগ্রের বোধ আনা যায় কি ক'রে, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বাণী তারই ইঙ্গিত দান করে থাকে। শিক্ষা ও সমবায়, এই দুটিই হচ্ছে রবীন্দ্র-সাধনার বিশিষ্ট ধারা।

রবীন্দ্রনাথকে মনে করবার দিনে ভিতরে-বাইরে ছোটোবড়ো নির্বিশেষে সমগ্রের যোগের জন্য সকলেরই প্রস্তুত হওয়া চাই সর্বাগ্রে। কেউ যেন কাউকে ভুলে না থাকি, ছেড়ে না চলি।—যৌথ এক সনাতন অধিকারের বিষয় রবীন্দ্রনাথ। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষা ও সমবায়ের সাহায্য নিয়ে, যাতে নব নব কালে, নব নব সৃষ্টির কাজে আপন আপন জীবন উৎসর্গ করি ও সেই সঙ্গে মানবতাকেও সমৃদ্ধ করতে থাকি,—এই হোক আমাদের যৌথ কামনা।

লোকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের কথা যতই আলোচনা করা যাবে, তাঁর সর্বতোমুখী অখণ্ড জীবনের পরিচয়-সূত্রটি ততই হবে সুগোচর। খ্যাত অখ্যাত নানাভাবে নানা কাজের মধ্য দিয়ে ছোটো বড়ো নানা জনের সঙ্গেই সে-যোগ ঘটেছে। রাজারাজড়া থেকে মজুর-ভিখিরী সকলেই আছে সে-ইতিহাসে বাঁধা।

ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের সঙ্গে কবির বহুকালের হৃদ্যতা ছিল। কবির 'ভগ্ন-হৃদয়' কাব্যের রাজ-সমাদরের কাহিনী কে না জানেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষকালের উপন্যাস—'রাজর্ষি'—ত্রিপুরার ইতিহাসকে ভিত্তি ক'রে রচিত। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে ত্রিপুরার অর্থ-সাহায্য বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। কবির বন্ধু বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ বসু। বিলাতে গবেষণা করার সময় তাঁকে অর্থ-সাহায্যের দরকার হয়। তখন ত্রিপুরার বদান্যতা কবিকে প্রীত করেছিল। 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধে কবি ত্রিপুরা-রাজ্যের কথা গৌরবের সহিত আলোচনা করেছেন। রাজ-পরিবার থেকে একাধিক কুমার শান্তিনিকেতনে এসেছেন বিদ্যার্থীরূপে। সোমেন্দ্র দেববর্মা, রাজকুমার নরেন্দ্র দেববর্মা ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ধীরেন্দ্র দেববর্মা শান্তিনিকেতনের ছাত্র।

অজ্ঞাতনামা সাধারণ লোকে কবিকে যেটুকু দেখেছে, পেয়েছে—সে অতি সামান্যই। মনের মণিকোঠায় প্রত্যেকেই তার সঞ্চয়কে রেখেছে পরম সম্পদের মতো ক'রে। শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন এবং জোড়াসাঁকোর আশেপাশে এমন অজস্র সম্পদ লোকের অগোচরে মনে-মনেই সঞ্চিত রইল।

কবির কাজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন নানা গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিরা; তাঁদের মধ্যে শিক্ষার আভিজাত্য আছে অনেকেরই; তাঁদের কথার মূল্য কম নয়; কিন্তু সে-পরিচয়ের পরম কথাটি শুনেছিলাম একবার জনৈক সাধারণ কর্মিকের কাছে। এখন থেকে চব্বিশ বছর আগের ঘটনা। উদয়নের দোতলার বাঁ-ধারের ছোট্ট কক্ষটিতে আমাদের অফিস। গুরুদেব থাকেন দোতলারই ডানদিকের বড় কক্ষটিতে। তাঁর আঁকা ছবি জমেছে হাজার খানেক। ফ্রেম-বাঁধাই-করার লোক এসেছেন কলকাতা থেকে। সেখানে তাঁর দোকান আছে। এই কাজে পক্ষকাল তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। আমাদের অফিসের সেই ছোটো ফালি কুঠরিতেই বসে তিনি বাঁধাইয়ের কাজ করতেন, আমরা ছবিগুলির তালিকা তৈরি করি। সে-ব্যক্তিই বলেছিলেন,—

"এ ছবিগুলি কিসের তা বলতে পারিনে। কিন্তু, দেখে ভালো লাগে; দেখতেই ইচ্ছে করে।" ছবিগুলির নাম ছিল না। কী নামে তালিকাভুক্ত করব, শেষে নিজেরাই মোটামুটি একটা বিষয়শ্রেণী ভাগ করে নিতাম, আর, প্রধানত সংখ্যা-বৈচিত্র্য দ্বারাই ছবিগুলিকে ধরা-ছোঁয়ার একটা ব্যবহারিক উপায় স্থির করা গিয়েছিল। ভদ্রলোককে যখন জিজ্ঞেস করলুম, "বলুন তো, এটার কী নাম হতে পারে। নাম না দিয়ে কবি এ কী করে রেখেছেন, লোকে বুঝবে কী করে?" তিনি শুধু একটু হেসে বললেন, "নাম দিলেই কি সব বোঝা যায়!" কবি ঠিক এই কথাটিই নানাভাবে শেষে বলেছিলেন একদিন ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে তাঁর 'খ্যাতি-ভোলা দিন' নামক চিঠিতে, প্রবাসীতে সেটি বেরিয়েছিল। নালন্দার গুহাচিত্র এবং মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কৃত শিল্প-উপকরণগুলির নাম-ছাড়া সাধনাই কবিকে সকল কাজের সার্থকতার ঠিক রূপটি দেখিয়ে মুগ্ধ করেছিল। তিনিও তো মুগ্ধ করবার, ভালো লাগাবার কাজই নিয়েছিলেন। তাঁর বিচিত্র প্রকাশ যে "ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে"—এই কথাটিকেই নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলবার প্রয়াস, তা তিনিও যেমন বলেছেন, লোকেও যে তাই বুঝেছে, সামান্য কর্মিকের কথাটুকুও তারই একটি সরল প্রকাশ মাত্র।

এই ভালো-লাগা আর ভালোবাসার টানেই এবং ভাষান্তরে ঐ ফোটো-বাঁধিয়ে-র কথাটিকে বলবার জন্যই, সুদূর পল্লী-অঞ্চলের একটি বাড়ির মেয়ে কবিকে যশোর থেকে পাঠিয়েছিল ঘরে বসে তাঁর নিজের আঁকা রবীন্দ্রনাথের একখানি বড়ো প্রতিকৃতি। কোথাও শিল্পশিক্ষা না নিয়েই সে এ চেষ্টা করেছিল এবং কবিকে চাক্ষুষ না দেখেই। তার চেষ্টা যে নেহাত বিফল হয়েছিল তা নয়। আর কিছু তার মূল্য না থাক,—একটি মূল্য আছে। সূর্যের তেজে সমুদ্রে যে আবেগ জাগে, তা থেকে বঞ্চিত হয় না নদীনালা খালবিল ডোবা-ও। তারই নজির বহন করে ছবি-পাঠানোর এই ঘটনাটি। আজও সেই শ্রদ্ধার্ঘটি লেখকের ঘরে রক্ষিত আছে। কবির অজস্র সম্পদের মধ্যে থেকে এবং ভালো আরো হাজার ছবির মধ্যে থেকে এইটুকুই তার চেয়ে-নেওয়া সমৃদ্ধি।

জনৈক যুবকের মুখে স্বপ্নলব্ধ-কাহিনীর ব্যাখ্যান শোনা ও তার পিতৃত্বের দায় স্বীকার করার দুর্ভোগ 'জীবনস্মৃতি'-তে সবিস্তারে কবি বর্ণনা করেছেন। সে ঘটনা থেকে পাতানো আত্মীয়তা সম্বন্ধে তাঁর সতর্ক হওয়ার সঙ্কল্পের কথাও

জানা যায়। কিন্তু যিনি পেতেছেন জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ, তাঁর আত্মীয়তার দেউড়ীতে বারে-বারে আগন্তুকের নাড়া না পড়বে এবং তিনিও যে তাতে সাড়া না দিয়ে একান্ত নির্লিপ্ত থাকতে পারবেন, এমন হওয়া কঠিন। এরূপ সম্বন্ধ পরে আর বেশী গড়ে ওঠেনি। যে-দু'একটি স্থলে হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে কবিকে আর ভুগতে হয়নি।

ভিক্টোরিয়া,—আমেরিকাবাসী মহিলা। পুরা নাম ছিল সিনোরা *ভিক্টোরিয়া ডি এস্ট্রাডা (Signore Victoria De Estrada)*। কবির আমেরিকা ভ্রমণের কালে এই স্প্যানিশ মহিলা কবির অসুস্থ অবস্থায় সেবা করেছিলেন। 'পূরবী' কাব্যখানি কবি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। কবিকে তিনি একখানি সোফা উপহার দেন। সেই সোফাখানিতে কবি শেষদিনগুলিতেও আগ্রহ করে বসতেন। কবির রচিত 'শূন্য-চৌকি' নামক কবিতাটি বর্তমানে সেই সোফার বুকেই 'রবীন্দ্র-ভবনে' রক্ষিত আছে। কবি 'ভিক্টোরিয়া'কে একটি বাংলা নাম দিয়েছিলেন 'বিজয়া'। 'পূরবী' কাব্যের উৎসর্গপত্রে সে নামই ব্যবহৃত হয়েছে।

দেশেও দু'একজনকে উপলক্ষ্য করে কবি আত্মীয়-সম্বন্ধের ক্ষেত্রটি মাঝে মাঝে বিস্তার না করেছিলেন, এমন নয়। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'-তে 'রাণু'কে আমরা পাই তেমনি একটি স্নেহের নিবিড়তায়। তাঁরি ছোটো বোন ভক্তি দেবীকে কবি ডাকতেন 'মাসি',—কিছুদিন তিনি শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছিলেন। কবি হেমন্তবালা দেবীর ছিলেন 'দাদা'। সমাজ ও ধর্ম নিয়ে বহু পত্রালাপ ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে। এমনি আরেক মহিলাকে কবি 'মাতঃ' সম্বোধনে পত্রযোগে কন্যাস্থানীয়া করে দেখেছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিশেষ-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার-কে লেখা কবির পত্রগুলিও সমাজ-ধর্মবিষয়ে অনেক আলোকপাত করে। স্বর্গত প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক অজিত চক্রবর্তীর স্ত্রী লাবণ্যদেবীকে তাঁর অভিভাবক ছোটো বেলাতেই শান্তিনিকেতনে কবির হাতে সঁপে দিয়ে যান। কবিও তাঁকে কন্যার মতো করে আশ্রমে রাখেন।

সমাজের কত ক্ষেত্রের কত রকমের লোকের কথাই না এসে পড়ে কবির কথা ভাবতে গেলে। ঘরে-বাইরে এঁরা ছড়িয়ে আছেন। শান্তিনিকেতনে দেখা গেছে, শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের দিক থেকেও আশ্রমের ও নানা-অঞ্চলের গাছপালার প্রতি কবির বিশেষ আগ্রহ ছিল; অধ্যাপক

তেজেশচন্দ্র সেন (অধুনা স্বর্গত) উদ্ভিদতত্ত্বানুরাগী থাকায়, বহু সময় তিনি কবির এ-বিষয়ের আলাপ-আলোচনা শোনবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন।

একবার কবির ইচ্ছা হয়, উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ তাঁর পুত্রের মতো নিজের কোনার্ক-গৃহের সম্মুখ-প্রাঙ্গণে একটি আমের চারাকে লতিয়ে তুলবেন। তেজেশবাবুই নির্বাচিত হলেন সহকারী। কবির কথামতো তিনি মাছের আঁশ, মাংসধোয়া জল ইত্যাদি নানা জিনিস গাছের খাদ্যরূপে রোজ ঢালতে লাগলেন গাছের গোড়ায় ; চারাটির মাথা ছেঁটে দেওয়া হল। বাঁশের মাচায় ও বেড়ায় ডাল-গুলিকে তার দিয়ে বেঁধে-বেঁধে চলল লতানোর চেষ্টা। কিন্তু, মূলেই ছিল গলদ। গাছের জাত-বাছাইয়ের দিকে কারো দৃষ্টি ছিল না। জাত-বদলের ব্যাপারে দেশি গাছেরও সাড়া মিলল না। কবিকেও চলে যেতে হল বিদেশে। পরীক্ষা রইল অসমাপ্ত।

কবি তাঁর শেষ-জীবনে আশ্রমের জনৈক নবাগত তরুণ সাহিত্য-শিক্ষককে দিয়ে সুখপাঠ্য ক'রে বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক রহস্য লেখাবার চেষ্টা করেন। দু'তিন খানি খাতার পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে এল। কিন্তু তাতে বিষয়ের তুলনায় বর্ণনার ভাগ হল বেশি। ফেনানো ভাষা ও গল্প বলার শিথিল ও কৃত্রিম ভঙ্গিটা বিজ্ঞানের বইয়ের পক্ষে কবির কাছে বড়ো বেশি জোলো মনে হল। পছন্দ হল না। তখন তিনি ভার দিলেন কলেজ-বিভাগের বিজ্ঞানের অধ্যাপকের উপর। তাঁর পাণ্ডুলিপির সংস্কার সাধন করতে গিয়ে বিজ্ঞানের গোটা একখানি বই-ই শেষপর্যন্ত লিখে ফেললেন কবি নিজেই।

কিশোর-বয়সে গৃহশিক্ষক সীতানাথ ঘোষ ও ডালহৌসী পাহাড়ে অবস্থান-কালে পিতা মহর্ষিদেবের শিক্ষাতেই কবির মধ্যে বিজ্ঞানের মন সৃষ্টি হয়। কবির রচিত প্রথম ধারাবাহিক রচনা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে। এলোপাথাড়ি অবৈজ্ঞানিক চেষ্টাকে তিনি দেশের কাজের ক্ষেত্রে ধ্বংসের পথ ব'লেই মনে করতেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশেষজ্ঞদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য ছিল তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ। তিনি চাইতেন শৃঙ্খলা সংযম ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সৃষ্টি। কোনো জিনিসের অপচয় তিনি সহ্য করতেন না। দেশের মঙ্গলামঙ্গলের দিক দিয়ে তিনি কবি হয়েও বিলক্ষণই ভাবতেন। কবির সে ভাবনার মধ্যেও অতি সামান্য বিষয়ের বেলায়ও লেগে থাকত বৈজ্ঞানিকের প্রবল যুক্তিবোধ। দেশীয় পোশাক, পারচ্ছদ, ঘর-দুয়োর বাগান, আহার-বিহার নিয়ে নানা সময়ে তাঁর নানা রচনা প্রকাশ

পেয়েছে। অল্পাহারের চেয়ে বেপরোয়া অতি-আহারেই অনেক স্থলে আমাদের দুর্গতি ঘটায়; কবির রচনায় এ বিষয়ে সতর্কতা মেলে। এই কুঅভ্যাসের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ক'রে তিনি দেশবাসীকে মিতাহারী হতে বলেছেন। *খাদ্যাভাবের দেশে আহারের বেলায় আমাদের অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি কিরূপে সহজ-পুষ্টিকরতাকে বর্জন ক'রে ক্ষতি ঘটাচ্ছে তার উল্লেখ* করেন ভাতের ফেনের পরিণতি দেখিয়ে। এ সবই ছিল 'কবি'র কথা। কিন্তু সবই যে কত কাজের কথা, বোঝা গেল একদিন তা একাধারে একজন বৈজ্ঞানিক ও জননেতার ভাষণে। শান্তিনিকেতনে কয়েকবারই এসেছিলেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। কবিকে প্রণাম ক'রে দেখা-সাক্ষাৎ সেরে তিনি 'সিংহ-সদনে' একবার একটি বক্তৃতা দেন। প্রসিদ্ধ দেশ-সেবকের কাছে সকলে দেশের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধেই আলোচনা আশা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর বক্তৃতার বিষয় সেদিন নির্বাচন করেছিলেন 'খাদ্যসমস্যা'। রান্নাঘরের নালা দিয়ে জাতীয় প্রাণশক্তির ধারা অনেকখানি যে নানাভাবে অপচয়ের পথে গড়ায়,—কবির পূর্বোক্ত এই কথাটিই ডঃ ঘোষের ভাষণের নানা কথার মধ্যে আরেকবার সকলে শুনতে পেল। কবির উপদিষ্ট মিতাহারেরও এক উদাহরণ সেবার কার্যত দেখিয়েছিলেন বটে ডঃ ঘোষ। কবির অফিসের এক কর্মী ছিলেন দেশসেবার ক্ষেত্রে এককালে ডঃ ঘোষের একজন প্রাক্তন সহকর্মী। সেই ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে তিনি সেবার তাঁর শান্তিনিকেতনের বাসায় ডঃ ঘোষের আহারের ব্যবস্থা করেন। রাত্রিতে সবাই খেতে বসেছেন। ডাল তরকারি, বিবিধ আমিষ ও মিষ্টান্নের আয়োজন রয়েছে। তার মধ্যে যেমন মাত্র ডাল-তরকারির পর মাছ পাতে পড়া, অমনি ডঃ ঘোষ তাঁর আহারে দাঁড়ি টেনে বসলেন। বাঁধা পরিমাণের সীমা পেরিয়ে গেছে—এই একটি কথা ব'লে তিনি যে হাত গুটোলেন, শত অনুরোধেও তাঁকে আর কিছু স্পর্শ করানো গেল না। মাংস-মিষ্টান্নাদি বাটিতে বাটিতে সব রইল প'ড়ে। এমনি কঠিন ছিল বৈজ্ঞানিকের আহারে মিতাচার। —ব্যাপার দেখে কবির উক্তিই কেবল মনে পড়ছিল।

কবির সাধনক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান সকল ধর্মধারাই এসে মিলেছিল; তেমনি কর্মধারার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন দল নানা সূত্রে কবির সংস্পর্শ লাভ করেছে। বিশ্বযোগের বেদিতে তাদের

বিশেষ-বিশেষ অর্ঘ জুগিয়ে তারা বিশ্বপ্রাণ-শক্তির বিচিত্র প্রকাশে সহায়ক হতে পেরেছে। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মের কর্মীরা এবং বামপন্থী শ্রমিক নেতারাও যেমন এসেছিলেন তেমনি বিপ্লবীদলেরও অনেকে কবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কবির 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'ভাইফোঁটা', 'নামঞ্জুর', 'রবিবার', 'বদনাম', ইত্যাদি নানা গদ্য রচনা এবং 'প্রশ্ন' ও বক্সা দুর্গের রাজ-বন্দীদের অভিনন্দনের উত্তরে রচিত কবিতা, 'বীথিকা' ও 'পুনশ্চ'—প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্গত নানা কথিকা, 'মিলন-যাত্রা' সে-সঙ্গে হিজলি ও চট্টগ্রামের বন্দিনিবাসে অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতায় মনুমেণ্টের তলায় অনুষ্ঠিত জনসমুদ্রের নিকট তেজোদৃপ্ত ভাষণ, ইত্যাদির মধ্যে কবির আহৃত বিপ্লবী-শাখার অভিজ্ঞতা কিছু-কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

শিল্প, সংগীত, কাব্য ছাড়াও কবির প্রকাশের কাজ আরো নানা এলাকায় ছড়ানো ছিল। কবির চিকিৎসা-বিদ্যানুরাগের কথা অনেকে জানেন। তবে কবিদের রাজা কবিরাজীর চর্চায় তেমন হাত দেননি। একবার লেখক অসুখে পড়েন। অফিসে তাঁকে সময়মতো না পেয়ে ভৃত্য মহাদেবকে খোঁজে পাঠান বাসাতে। অসুখ জেনে অমনি তার হাতেই পাঠিয়ে দেন একশিশি বড়ি। কিন্তু সে কবিরাজী বড়ি নয়, ছিল বায়োকেমিক ওষুধ। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (অধুনা স্বর্গত) বলেন, এক সময়ে প্রথমে হোমিওপ্যাথিতেই কবির বিশেষ নিষ্ঠা ছিল এবং তিনি এই মতে চিকিৎসায় কৃতকার্যও হয়েছিলেন, অনেককে এর চর্চায় উৎসাহিতও করেছেন, কিন্তু সাহিত্যচর্চা কবিকে এদিকে আর বেশী অগ্রসর হতে দেয় নাই। বহু অর্থব্যয়ে তিনি হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের পুস্তকাদি ক্রয় করেছিলেন ও বিদেশ হতে মূল্যবান ঔষধাদি আনিয়েছিলেন। এ সমস্ত পরে বিদ্যালয়ের কাজে আসে।

কবি ডাক্তারী বই-এর ভূমিকা লিখেছেন। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য-এর 'ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা' নামক সুবৃহৎ পুস্তকখানি সেই নিদর্শন বহন করছে। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় একস্থলে কবি লিখছেন,—"আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে হঠাৎ ভিষক ডাক্তার হতে হয়……। তার দৃষ্টান্ত দেই। সাঁওতাল পাড়ার মা এসে আমার দরজায় কেঁদে পড়ল, তার ছেলেকে ওষুধ দিতে হবে। যতই বলি আমি ডাক্তার নই, তার জিদ ততই

বেড়ে যায়। জানি, যদি তাকে নিতান্তই বিদায় করে দিই, সে তখনি যাবে ভূতের ওঝার কাছে, তার ঝাড়ার চোটে রোগ ও রোগী দুইই দেবে দৌড়। বই খুলে বসতে হল—বড়াই করতে চাইনে—পসার বাড়াবার ইচ্ছে মোটেই নেই—সে রোগী আজও বেঁচে আছে ; আমার গুণে বা তার ভাগ্যের গুণে সে তর্কের শেষ মীমাংসা কোনো উপায়েই হতে পারে না। বহুকাল পূর্বে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলুম ; সেখানেও রোগীরা আমাকে অসাধ্য রোগের মতোই পেয়ে বসেছিল—ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম। শেষকালে তাদেরই হল জিত। যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধ'রে পড়ে, তাদের তাড়া ক'রে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড়ো নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ ক'রে বসতে পারিনে যে পুরো চিকিৎসক নই ব'লে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরকেও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।" লোকের দুঃখ-বেদনা কবি ভিতব থেকে কিরূপ অনুভব করছেন এবং তাদের সঙ্গে রোগ-শোকের ক্ষেত্রে কিরূপ সাড়া দিয়েছেন তার পরিচয় এর মধ্যে পরিস্ফুট রয়েছে। পশুপতিবাবুর 'আহার ও আহার্য' নামক পুস্তকখানিও কবির তত্ত্বাবধানেই বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদ-গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থরূপে শান্তিনিকেতন-প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ আকাশের আলো-বাতাসের মতো।—ব্যাপ্ত ক'রে আছেন পৃথিবীর সকল স্তর। বিশেষ-বিশেষ দিক ধ'রে তাঁর খণ্ডভাবে আলোচনার একটা সার্থকতা আছে, কিন্তু শুধু সে-রকম পরিচয় নিয়ে ক্ষান্ত থাকলে অন্ধের হাতি দেখার মতো হবে। যে কবি বলেছেন—

> ইচ্ছা করে মনে মনে
> স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
> দেশে দেশান্তরে।"

এমন কবিকে সমাজের কোন্ স্তর হতে সরিয়ে রাখব !

হিন্দু-সমাজের শিরোমণি পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবির অনুরাগী ছিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণও একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। কবি তাঁকে আম্রকুঞ্জের বেদিতে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সমাজের ছোটখাটো শাখা-উপশাখার সঙ্গেও কবির

কিরূপ পরিচয় ছিল, তার সামাজিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবেই তার নিদর্শন মেলে। ছোটো বা বড়ো ব'লে নয়, বিশেষ-বিশেষ সমাজের ব'লেই নয়,—মানুষের প্রতি তাঁর সম্মান ও সহানুভূতির পরিচয় প্রকাশ পেয়ে এসেছে পূর্বাপর নানা সময়ে নানাস্থলেই। বর্ণগত ক্ষেত্রের একটি প্রশ্ন যখন ওঠে তথাকথিত পোদদের দিক থেকে,—তখনও কবি তাঁদের সম্মান ক্ষুণ্ণ না করার জন্য এবং মনেও আঘাত না লাগে—এই ভেবেই, তাঁদের প্রস্তাব-মতো নিজের পুরাতন রচনায় 'পোদের' স্থলে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' শব্দটি ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। কবির দপ্তর থেকেও গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের এ বিষয়ে আশ্বস্ত ক'রে পত্র দেওয়া হয়। 'রবীন্দ্র-সদনে' এ বিষয়ে কাগজপত্র মিলতে পারে।

শিখ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তিও এক-এক সময় কবির গোচরে আসে। তাঁর সহৃদয়তা ও ন্যায়বিচার ছিল সকলের জন্যেই। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে জোর ক'রে মুসলমানী শব্দের অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক আমদানির তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু আবার তেমনি তাঁদের নিষ্ঠাযুক্ত সাহিত্য-সাধনাকে সর্বান্তঃকরণে কিরূপ অভিনন্দিত করেছেন, তারও পরিচয় দান করে চট্টগ্রামের গল্পলেখক জনাব আবুল ফজল ও 'হারামণি'র লেখক মৌলভী মনসুরুদ্দীনকে লেখা তাঁর চিঠিপত্রগুলি। মৌলভী এক্রামুদ্দীনের লেখা 'রবীন্দ্র প্রতিভা' নামক সে যুগের আলোচনা-গ্রন্থটির কথা উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের কাব্যে ও ভাষাবিজ্ঞানের দিকে কবির কয়েকটি মন্তব্য আমাদের জেনে রাখা ভালো। নঙর্থক ক্রিয়াগুলির বেলায় কবি 'নে' বা 'নি'-কে ক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে বসাবার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন 'হয় নি' না-লিখে তাঁর নির্দেশ ছিল একত্র ক'রে 'হয়নি' লেখার। 'করি নে' নয়, হবে 'করিনে'। 'নি' বা 'নে'-কে তিনি ক্রিয়ারই অঙ্গ ধরতেন। 'অবদান' শব্দটিকে বলতেন আধুনিকতার অদ্ভুত আমদানি, এর প্রয়োগ তাঁর মনঃপূত ছিল না মোটেই। বলতেন—'নিজকে' নয়,—'নিজেকে'। 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়ে এলে একটি কপি তাঁর হাতে দেওয়া হল। তিনি বইখানিকে কিছুদিন তাঁর টেবিলে রেখেছিলেন হাতের কাছে। সময়-সময় নাড়তেন-চাড়তেন। ভাষাতত্ত্বের অন্তর্গত 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' বইখানি ইতিমধ্যে ছাপাখানায় গেল। সেটি ছাপা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অধ্যায়ে-

অধ্যায়ে বাকিটার সংশোধন চলেছে। ভাষাতত্ত্বের সূত্রগুলি কী কৌশলে কবি সে-সময় আবিষ্কার ক'রে চলেছেন তার রহস্য কিছু ধরা পড়বে হাতের কাছের 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' বইখানিতে। সেই টেবিলে-প'ড়ে-থাকা কপি-খানি এখন আছে 'রবীন্দ্র-সদনে'। তার মলাটের ভিতরদিকের বুক জুড়ে রয়েছে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে বিচিত্র শব্দালেখ্য।

এই সাহিত্য-কথাপ্রসঙ্গে মনে পড়ে, কবি বহু পূর্বে বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিলেন 'পদরত্নাবলী', তা সকলেই জানেন। একা শেষ-জীবনেও একখানি বৈষ্ণব-পদাবলী সংকলন তৈরি করেন। সেটা যাতে ছাত্রছাত্রীদেরও হাতে দেওয়া যেতে পারে, সেদিকে বিশেষ করে তাঁর লক্ষ্য ছিল। দুঃখের বিষয়, জিনিসটা ছাপা হয়নি।

সংসারের টাকাপয়সা সম্বন্ধে 'কবি'-লোকের কাছ থেকে অর্থবিজ্ঞানের বিচারে কিছু আশা করবার থাকে না। কিন্তু কবির শান্তিনিকেতনের প্রভাব সমাজের উপরে কোন্‌দিক দিয়ে কতটুকু কার্যকর হচ্ছে, এই কথা-প্রসঙ্গে এক ভদ্রলোক তাঁর সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি মজার কথা বলেছিলেন। একবার তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। ঘুরে-ঘুরে সকলে যেমন দেখে, তিনিও তাই দেখে ফিরছিলেন। উত্তরায়ণও দেখলেন। কিন্তু সব-কিছু দেখা জিনিসের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাঁর 'উদয়নে'র বৈঠকখানার কক্ষের ছোটখাটো দু'একটি গৃহসজ্জার উপকরণ। আসন-হিসাবে এখানে-সেখানে বিছানো রয়েছে লতাপাতা-আঁকা কাঁথা, আর শামুকের মধ্যে জ্বলছে বাতি। ঘরের দেওয়ালে আঁটা আছে শীতলপাটি। চৌকির উপর রাখা আছে শিল্পমণ্ডিত মাটির ছাইদানি। পিতল ও কাঠের তৈজসপত্র;—কিন্তু, সবই এক-একটি দেশীয় কারুকার্যের নিদর্শন,—তাই মন টানে। ঘর-দোরে সর্বত্র সামান্য জিনিসের পশ্চাতে রয়েছে অসামান্য সমাবেশের কৌশল। তাতেই অপরূপ হয়ে উঠেছে চারিদিকের চেহারা। মাটির ঘরও হল সেখানে একটা দেখবার জিনিস। কৃষক-মজুর ছোটোবড়ো সবাই মিলছে তার দোরে। সেখানটায় সংকোচের বা অহংকারের আড়ালটা হয়ে পড়ে শিথিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকেই সূক্ষ্ম একটি প্রাণের যোগসূত্র অনুভব করতে হয়। শান্তিনিকেতনের উৎসবও সেই ভদ্রলোকের চোখে পড়েছিল। কলকাতার চেয়ার-টেবিলের কাছে, আশ্রমের কাঁচা বেদির শোভনতা তাঁকে বিশেষ

তৃপ্তি দিয়েছিল। দেশীয় বাদ্যযন্ত্রাদির ঝংকার, নৃত্যসুষমা, এগুলিও তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য না করে পারেননি। কোনো বক্তৃতা বা উপদেশ না-বিলিয়ে কার্যত এই যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামান্যের সহজ সমাদর,—এইটিকেই তিনি বড়ো স্বাদেশিকতা ব'লে দেখেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট একজন দেশকর্মী,—নিখিল ভারত কাটুনিসংঘের বঙ্গীয় শাখার এককালের কর্মসচিব, তখনকার একটি বিশিষ্ট দৈনিকের সম্পাদক। আরো একটি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেন। প্রভূত পরিমাণ সিল্ক-ওয়েস্টের কাপড় ছিল গুদাম-জাত। প্রথম পরীক্ষার উৎসাহে সেগুলি 'কাটুনিসংঘ' থেকে তৈরি হয়ে অযথাই নষ্ট হচ্ছিল। প্রায় হাজার দশেক টাকা আটকে ছিল। লোকসানের দায় ঘাড়ে ক'রে সংঘ বিব্রত হয়ে পড়লেন। এমন সময় কলকাতায় কাটুনিসংঘের দোকানে এল শান্তিনিকেতন-কলাভবনের জনৈক অবাঙালী ছাত্র। তাঁর চাহিদা হল সেই মোটা খস্‌খসে অমসৃণ ওয়েস্ট-সিল্কের কাপড়। দেশের লোকের রুচিতে তখন মিহি খদ্দরও অপাংক্তেয় হয়ে ওঠবার উপক্রম হয়েছে মোটা সেই সিল্ক থেকে তো কবেই সকলে মুখ ফিরিয়েছে। হঠাৎ ছাত্রটির এই চাহিদায় সংঘের কর্মীরা বিস্মিত হলেন। তাঁরা কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন,—কেন এই অসাধারণ পছন্দ। ছেলেটি বললে, ঐ মোটা তুলা আর সিল্কের অমসৃণ বুনট ও তার মৃদু জৌলুসটাই শিল্পদৃষ্টিতে লেগেছে মনোরম। শান্তিনিকেতনের শিল্পরুচির ইংগিত ধরেই জামার কাপড়ের ব্যবহারে লেগে জিনিসগুলি অবশেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। কবির প্রবর্তিত নানা শিক্ষার পরোক্ষ-ফল যে কত সুদূরপ্রসারী,—অগোচরে তার প্রভাব লাভবান ক'রে দিনে-দিনে কত দিক দিয়ে দেশকে যে গ'ড়ে তুলতে পারে,—গল্প করতে করতে সে-কথাই ভদ্রলোকটি বলছিলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কাটিয়ে দিলেন, এক 'পঁচিশে-বৈশাখ', এমনি এক ঘরোয়া আলাপনে। তিনি বলেছিলেন টাকার গর্ব যাবে, রুচির রম্যতা আসবে,—এক কথায় এই হল কবির জীবনযাত্রা-ধারার একটি বৈশিষ্ট্য। কবির আবাসস্থল উত্তরায়ণের সীমানায় 'শ্যামলী'র সমাবেশ থেকে তারি আভাস তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। চারপাশে ওর যেটুকু আড়ম্বর,—বিপুল শক্তির বিচিত্র খেলায় সেটুকু উপরকণ না হলে কবির সব দিক এমন খুলত কিনা, সেও ভেবে-দেখার বিষয়।

শান্তিনিকেতনে অনেক বাড়ির নামই কবির দেওয়া। আশ্রমের উত্তর দিকে 'উত্তরায়ণ'। খাস আবাস 'উদয়ন'। রবির উদয়ের নিত্য-মহোৎসব

সেখানে। 'উত্তরায়ণ' হচ্ছে সীমার নাম, বাড়ির নাম নয়। সে সীমায় ছোটো ছোটো আরো কয়েকটি বাড়ি আছে। একটির নাম 'কোনার্ক'—পুরীর কোনারক মন্দিরের স্থাপত্য-কৌশলে সেটি নির্মিত। 'শ্যামলী', 'পুনশ্চ', 'উদীচী', 'উদয়ন' ছাড়াও 'উদয়নে'র দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উদ্যান-সংলগ্ন একটি গৃহ আছে। কবির পুত্রবধূ শিল্পী শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সেটি শিল্পকাজের স্থল। তার নীচের তলাটিতে পুত্র রথীন্দ্রনাথের কর্মশালা। মনোরম তার পরিবেশ। স্বভাবজাত ফুলে ও লতাপাতায় অতি পরিপাটি করে সাজানো। কবি স্টুডিয়োটির নাম দিয়েছিলেন 'চিত্রভানু'। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও এ গৃহে বাস করেছেন। 'প্রান্তিক' কাব্য তাঁর এ গৃহে লিখিত হয়।

'উত্তরায়ণে' আসার পূর্বে কবি থাকতেন 'দেহলি'তে। আশ্রমে প্রবেশের মুখে রাস্তার ধারে সে-বাড়ি। গৃহদ্বারের বাহিরের দাওয়াকে বলে দেহলি। আশ্রমসীমায় বাড়ির অবস্থান। কবির দেওয়া নামটিতে তার পরিচয় রয়েছে। 'দেহলি'র পাশেই এখানকার কলেজের ছাত্রাবাস। কবির দেওয়া নাম 'দ্বারিক'। সে-ও ঐ আশ্রমের গৃহদ্বার হয়ে আছে ব'লেই। কলা-ভবনের মিউজিয়মটি—'নন্দন'। দুটি তার তাৎপর্য। এক নন্দনতত্ত্বের সে সাধনাস্থল। অন্যদিকে সে-সাধনাস্থলের আচার্য নন্দলাল বসুর নাম-ও ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। সুরজ্ঞ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসস্থলের নাম কবি রেখেছিলেন 'সুরপুরী'। সুরের মূর্ছনায় বাড়িটি থাকত ভরপুর। তা ছাড়া, বাড়িখানির আদি মালিক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশাই। দিনুবাবুর মৃত্যু ঘটে কবি বেঁচে থাকতেই। তাঁর স্মরণে কবি আশ্রমের চা-চক্রের বাড়িটির নাম দেন 'দিনান্তিকা'। 'সুরপুরী'র পাড়াতেই 'রতন-কুঠি' রতন টাটার অর্থে নির্মিত, বৈদেশিকদের আবাস-গৃহ। আশ্রমের 'ডাক্তারবাবু'র আবাসস্থল ছিল ওর কাছে। আশ্রমের পূর্বদিক্-প্রান্তে বাড়িটি, নাম পেয়েছে 'দৈগন্তিক'। এরূপ সেকালের পশ্চিম দিক্-প্রান্তের আরেকখানি বাড়ির নাম দেওয়া হয়েছিল 'প্রান্তিক'। তার কাছেই কবির কন্যা মীরা দেবীর বাড়ির নাম—'মালঞ্চ'। বড়ো রাস্তার পাশে বাড়িটি। সুন্দর একটি বাগান সামনে। কবির শেষ-জীবনের 'মালঞ্চ' নামের উপন্যাসখানিও একটি বাগানকে পটভূমি ক'রে রচিত। কবির শেষদিকের আরেকখানি গ্রন্থের নামের সঙ্গে আশ্রমের পুরোনো দিনের আরেকটি বাড়ির মিল রয়েছে। খড়ের চালের সে বাড়িটি লোপ পেয়েছে। 'শালবীথি'র তলায় সেটি অবস্থিত ছিল। নাম পেয়েছিল

'বীথিকা'। 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থটি কবির মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মাত্র রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। 'শালবীথি' আশ্রমের মর্মস্থল। তার তলায় দিনেরাতে আশ্রমের বৈতালিক, সাহিত্য-সভা, ক্লাস, ক্রীড়া-কৌতুক লেগেই আছে। কবির বিচরণস্থল ছিল এই শালশ্রেণীর শীতল ছায়াতল। গাছের নামও কবি অনেক দিয়েছেন। 'উদীচীর'র পাশে খাড়া ছিল সাদা সাদা ফলের ছড়ায় ভরা লম্বা লম্বা গাছ। নাম পেয়েছে 'হিমঝুরি'। এমনি আরো দেশীবিদেশী কত গাছ আশ্রমে কবির নামকরণের সৌভাগ্য-মণ্ডিত হয়ে আছে। বিদেশী 'নীলমণি' লতার কথা কবির 'বনবাণী' কাব্যে পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর চিঠির মধ্যে পাই—ঠিক ওর জুড়ি আরেকটি লতা ওরি বিপরীত দিকে লাগানো ছিল কোনার্ক বাড়ির সামনে—তার নাম ছিল 'শ্বেতমণি'। কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবীকে কবি লিখছেন: 'আমার কোনার্ক বাড়ির সেই নীলমণি লতার বিপরীত দিকে যে শ্বেতমণি লতাটা বেড়ে উঠে আশ্রয় খুঁজছে, তার জন্যে জড়িয়ে ওঠবার একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিতে বলে দিস আর মধুমালতীর উর্ধ্বগতির জন্যে যে তিন তাল খাড়া হয়েছে তার তিনটে ঢালু চালের বাঁখারির জাফরি করে না দিলে তার উপর দিয়ে লতা উঠতে পারবে না। সুরেনকে ডেকে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিস।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃঃ ১০৬) মহুয়া, কুরচি ইত্যাদি অনেক সাধারণ ফুলের নামেও কবি কবিতা লিখেছেন, নিজের কাব্যেরও নামকরণ করেছেন ওদের নামে। 'বনবাণী'-কাব্যের 'চামেলি-বিতান' কবিতাটি কবি কোথায় বসে লেখেন, এককালে হয়তো গবেষণার বিষয় হয়ে উঠবে। এটুকু জানা যায় যে, আশ্রমে বর্তমান 'গৈরিক' নামক গৃহটির সম্মুখের বারান্দার দুপাশে বহুপূর্বে দুটি বড়ো চামেলি গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। এখন নেই। কবিও তখন এ বাড়িটিতে কিছুদিন বাস করেছিলেন। 'খেয়া' কাব্যের অনেকগুলি কবিতা এ বাড়িতে রচিত। তখন আশ্রমের দক্ষিণদিকের সুদীর্ঘ বাঁধে 'চিত্রা' ও 'সোনার তরী'-নামে দুখানি ডিঙি নৌকা কবি রেখে দিয়েছিলেন; তাতে আশ্রমবাসীদের দাঁড়-বাওয়া শেখানো হত। সে সময়তেই কবি রচনা করে-ছিলেন—"তুমি এপার-ওপার করো কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে" নামক কবিতাটি। আশ্রমের প্রাচীন প্রাক্তন শিক্ষক (অধুনা স্বর্গত) নগেন্দ্রনাথ আইচের নিকট এ তথ্যটি শোনা।

তাঁর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আরো যা জানা যায়, তাও এ সঙ্গে বলা

আবশ্যক। শান্তিনিকেতনে পুরোনো দিনে ঘরবাড়ির বিশেষ কোনো নাম দেওয়া ছিল না। প্রাক্তন অধ্যাপকদের নামে 'সত্য কুটীর' (সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), 'সতীশ কুটীর' (সতীশচন্দ্র রায়) ও 'মোহিত কুটীর' (মোহিতকুমার সেন)—এই তিনটি ছাত্রাবাসের নামকরণ হয় প্রথম। আর, এ নামকরণ করেন শিক্ষক এই নগেনবাবু। তারপর থেকে নামকরণ-রীতি শুরু হয়।

যা হোক পূর্বোক্ত সুদীর্ঘ বাঁধ কাছে থাকলেও আশ্রমের জলাভাব কোনো দিনই মিটল না। একে তা ছিল অগভীর, তাতে পুরোনো, পাঁকে ভরা। নূতন ক'রে তা কাটানো হয়। কবি তখন তার নাম দেন 'ভুবনসাগর'। বাঁধের পুরাতন মালিক রায়পুরের স্বর্গত জমিদার ভুবন সিংহের স্মৃতি রক্ষা করেন কবি এই ক'রে। আশ্রমের জলসরবরাহের নলকূপটি বহুবারের চেষ্টার পর, কার্যকর করে তোলেন ইন্‌জিনিয়র-কন্‌ট্রাক্‌টর শ্রীঅমূল্যকুমার বিশ্বাস। পূর্বে একবার সফলতার আভাস পেয়েই কবি নলকূপের উদ্বোধনে লেখেন—"এসো এসো হে তৃষ্ণার জল" গানটি। এবারে লিখলেন আরেকটি গান—"হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল"। উৎস এবং উৎস-উদ্ধারকের অভিনন্দনে একটি অনুষ্ঠান হয়। উৎসটির সঙ্গে অমূল্যবাবুর স্মৃতি বিজড়িত করে উৎসটিকে কবি "অমূল্যউৎস" নামে অভিহিত করেন। বারি-দুর্ভিক্ষের দেশে বিজ্ঞানী ও যান্ত্রিকের দানের অমূল্যতা কবি এইভাবে স্বীকার করেছিলেন। জলাভাব মেটাতে,—বহুদিনের কথা,—আশ্রমের মন্দিরের কাছে একটি পুকুর কাটানো হয়েছিল। তার গভীরতা ছিল, তার ভিতরে একটি কূপও কাটানো হয়েছিল, কিন্তু তাতেও জল মেলেনি। তার থেকে যে মাটি তোলা হয়েছিল, তা ফেলা হয় পূর্ব পাড়টিতেই বেশি। একটি টিলার মতো হয়ে ওঠে সেখানে। টিলার পাশে আগে ছিল হাসপাতালের বাড়ি। হাসপাতাল নূতন বাড়িতে স্থানান্তরিত হলে পরিত্যক্ত ঐ পুরোনো বাড়িটি কর্মীদের আবাসস্থলে পরিণত হয়। তখন থেকেই একদিকে ছোটখাটো 'গিরি' সন্নিকটবর্তী হওয়ায়, অন্যদিকে সরকারী রাস্তার পাশে সর্বদা ধূলিলিপ্ত হয়ে থাকায় বাড়িটি নাম পেয়ে যায় 'গৈরিক'। উপরে খড়ের ছাউনি, আর ভিতরে মাটির গাঁথনি,—এই নিয়ে ছিল তার গড়ন।

ঘরবাড়ি, লোকজন ও কাজকর্ম নিয়ে কবির আশ্রমে কবি সকলের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গেই নিজের বিকাশটি রক্ষা করে চলতে চেয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে বারো মাসই উৎসব লেগে আছে। মিলনের আনন্দ জমে। আজো সেখানে বেশি ক'রে সেই সঙ্গেই জাগে বিচিত্র সৃষ্টির সমারোহ। সংসারকে দেখেছেন কবি উৎসবক্ষেত্ররূপে। আজীবন তাঁকে টেনে নিয়েছে একটি বেদনায়। উৎসবক্ষেত্রের অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন সারাজীবন। নানাস্তরের বিচিত্র সকলের সঙ্গে মিশে বিচিত্র সুরে বাজিয়েছেন তাঁর একটি উৎসববাড়ির বাঁশি। তারই আলাপের রেশে মনে জাগে তাঁরি গান—

পুষ্পফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে
কে লয়ে যাবে সে-ভবনে॥

আজ থেকে ১০৮ বছর আগে সাতই পৌষ। এই বিশেষ দিনটিতে (১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একুশজন সঙ্গী নিয়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন কিন্তু গাছের আগে যেমন বীজ তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আদিতে পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব রয়েছে সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিরূপে। মহর্ষি এই দিনে তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৬০ বছর আগে, পুত্র রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্রমেই ৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁর বিদ্যায়তন। পুণ্য এই দীক্ষাবার্ষিকী পিতাপুত্রের যোগাযোগধারা অনুধাবনের সুযোগ প্রতি বছর আমাদের কাছে এনে ধরে।

প্রথমেই নিসর্গের প্রতি অনুরাগে কবি তাঁর পিতার স্বভাবকে মনে পড়িয়ে দেন। মহর্ষি উন্মুখ হয়ে থাকতেন, আকাশ, পর্বত, নদী, সমুদ্র, বন-প্রান্তর, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের শোভা-সন্দর্শনে। চিত্তকে প্রকৃতির মধ্যে গভীরভাবে ডুবিয়ে দিয়ে তিনি অনন্তের মহিমা অনুভব করতেন। "১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং অনন্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া তাহাদের স্রষ্টা অনন্তদেবের ভাব লাভ করেন।" (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী)

পারিবারিক পূজাপার্বণের সংস্রব এড়াবার নির্বিরোধ পন্থা হিসাবে তাঁকে বাইরে-বাইরে অনেক ঘুরতে হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণও তাঁর ছিল অতিশয়। পিতা-পুত্রে বুঝি এ ক্ষেত্রে আবার একটু গরমিল দেখা যায়। পিতা ছিলেন পাহাড়-পর্বতের অনুরাগী; অপর পক্ষে পর্বতে যদিও বার বার যাওয়া-আসা করেছেন, পুত্রের আনন্দ হত নদীতেই। অথচ দুজনেরই দৃষ্টি চাইত অসীমের উদার বক্ষে অবাধে ডুবে থাকতে। তার জন্য আবশ্যক হয় আকাশের উন্মুক্ত পরিসর। একজন যেখানে তা খুঁজে পেতেন, অন্যজনের সেখানেই হয়তো ঠেকত বাধা। সাধনাক্ষেত্রেও এই বৈপরীত্যটুকুই দুজনের জীবনের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ নদীর মতো সমতলের লোকের যতদিক দিয়ে যতখানি কাছে, মহর্ষিদেব তার তুলনায় বেশ একটু সমুচ্চ সুদূর-বিহারী। ঠিক যেন আমাদের হিমালয় পর্বত। মহর্ষি হিমালয়বাসে কাটিয়েছেন জীবনের বহুদিন। একটা রহস্যময় নাড়ীর টানই ছিল যেন তাঁর হিমালয়ের সঙ্গে। শেষ-জীবনে সেখানেই বেশি থাকতে চাইতেন।

দেহ-সৌষ্ঠবে পিতা-পুত্র দুয়েরই ছিল হিমালয়ের ঋজু দৈর্ঘ্য ও বিপুল গাম্ভীর্য; দেহবর্ণে তেমনি শুভ্রতা ছিল প্রতীয়মান। কর্ম এবং আত্মিক ক্ষেত্রেও তাঁরা দুজনেই হিমালয়ের রহস্যময় গভীরতার অনুভূতি জাগিয়ে থাকেন।

মহর্ষির নিকট ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধটি ছিল উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। বেদান্তের সোঽহংবাদ—অর্থাৎ আমিই যে সেই ঈশ্বর, এ কল্পনা তাঁর একেবারেই মতবিরুদ্ধ ছিল। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, "আমি স্বয়ং পরমেশ্বর, এমন অভিমান বড়ই অনর্থের বিষয়, ইহাতে জিব কাটিতে হয়। বিষয়ের শত পাশে বদ্ধ হইয়া—জরা শোকে, পাপে তাপে মগ্ন হইয়া আপনাকে নিত্য-মুক্ত স্বভাবান্ মনে করার চেয়ে আর আশ্চর্য কি হইতে পারে। শঙ্করাচার্য জীব ব্রহ্মে ঐক্য, মত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ মতে সন্ন্যাসীরা এবং গৃহস্থেরাও এই প্রলাপবাক্য বলিতেছেন যে, "সোঽহং"। "আমি সেই পরমেশ্বর।" (পৃ ১১১ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সং) "Real ঈশ্বরের অস্তিত্ব বলিতে গেলে, জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মকে পুরুষ শব্দে বুঝায়, ইঁহাকেই আমরা উপাসনা করিয়া থাকি।" "ব্রাহ্মধর্মকে তিনটি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রথম বিঘ্ন পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় বিঘ্ন খৃষ্টধর্ম, তৃতীয় বিঘ্ন বৈদান্তিক মত।"

(আত্মজীবনী, শাস্ত্রী সং পরিশিষ্ট পৃ ১০৩)

নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক মহর্ষি; অবিমিশ্র দ্বৈতবাদী। তিনি লিখছেন—"আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে?...আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী।...এই জন্যই ভাষ্যের পরিবর্তে আমার আবার নূতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি লিখিতে হইয়াছিল।"

পুত্র রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম" সোঽহং-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু সে-তত্ত্ব অনেকটা মহর্ষির অনুমোদিত দ্বৈতবাদ-ঘেঁষা। তার মর্ম এইরূপ— ঈশ্বর বা পরমাত্মা এক ও সর্বগত। আমি সেই সর্বগত সত্তার এক অংশ বিশেষ। সুতরাং খণ্ড হলেও আমি সেই ঈশ্বরেরই এক বিচিত্র প্রকাশ। সকল কিছুর মধ্যে একাত্মভাবে সেই আমার "বড়ো আমি"-কে উপলব্ধি করাই হচ্ছে 'সোঽহংত্ব' লাভ করা। মহর্ষি বলেন,—"ব্রহ্মধর্মের মতে ঈশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, তিনি বিশ্বরূপ নহেন।" সেই ঈশ্বরের কাছে মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মোচিত প্রার্থনা—"হে পরমাত্মন্, মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং মঙ্গলস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" মহর্ষি এর পরে লিখেছেন— "১৭৬৭ শকে ব্রাহ্ম সমাজে এই উপাসনা-প্রণালী প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তখন স্তোত্র-পাঠের সময় তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ ব্যবহৃত হইত না। ১৭৭০ শকের পরে স্তোত্রের বাঙ্গলা অনুবাদ পাঠ আরম্ভ হয়। এই উপাসনা প্রণালী ব্রাহ্ম সমাজে প্রবর্তিত হইবার পূর্বে সেখানে কেবল বেদ পাঠ, অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোক পাঠ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতা পাঠ এবং ব্রহ্ম সংগীত হইত।" (দশম পরিচ্ছেদ)

১৭৯১ শকে '১০ই মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনা'-স্থলে মহর্ষি যে উপদেশ দান করেন, তার মধ্যে তিনি খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেন, "আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে খ্রীষ্ট ব্যবধান না হয়। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, তার ত্রিসীমানায় যেন কোন অবতার দণ্ডায়মান না থাকে।"

অবতারবাদ রবীন্দ্রনাথও মানেননি। তবে খ্রীষ্টের মানবতা ও আত্ম-ত্যাগের আদর্শ মানুষের সাধনার বিষয়রূপে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রতিভাত

হয়েছিল। সেদিক দিয়েই খ্রীষ্টের প্রতি তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ প্রশ্ন তোলেন—"রামমোহন রায় কি অভিপ্রায়ে এই ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন? ব্রাহ্মধর্ম এই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য? কি চীনদিগের জন্য?" এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন প্রশ্নকর্তা নিজেই—"একমেবাদ্বিতীয়ং—ঈশ্বরের উপাসনা যাহাতে হিন্দু-সমাজে প্রচারিত হয়, তিনি এই উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেও এবং বিদ্যা-বাগীশ এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগকে আচার্যের কর্মে নিয়োগ করিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভাওজি শাস্ত্রীকে বেদপাঠে নিযুক্ত করিলেন এবং সুললিত বঙ্গভাষায় ব্রহ্ম-সংগীত রচনা করিয়া স্বদেশীয় রাগরাগিণী দ্বারা হিন্দুদিগের ভক্তিকে আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। হিন্দু-সমাজকে ব্রাহ্মধর্মভুক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এই আদি-সমাজ সংস্থাপিত হয়, তথাপি এই ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনাতে সকল দেশের সকল জাতির যোগ দিবার অধিকার আছে—এই ইহার উদারতা ও মহত্ত্ব।"

(শাস্ত্রী, পরিশিষ্ট পৃ ৬০)

ব্রাহ্মধর্মে শ্রদ্ধাশীল হিন্দু সকলকে সমাজের উপাসনাতে যোগযুক্ত রাখবার পক্ষে মহর্ষির যুক্তিগুলি উদারতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচায়ক। যোগ্য অব্রাহ্মণকে আচার্যত্বে বরণ সম্বন্ধে তাঁর যে কোনো আপত্তি ছিল না, কেশব-চন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ আখ্যা দিয়ে আচার্য করে বেদীগ্রহণ করানোই তার অন্যতম পরিচয়। এক সময় ব্রাহ্মগণকে তিনি লিখছেন: "অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্বে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময় অবধি যাঁহারা উৎসাহপূর্বক শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারও দুর্বিষহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। বর্তমান-অনুষ্ঠান প্রণালী এবং তোমাদের ন্যায় উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লাভ করা তাঁহাদিগেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্যের ফল ...যাঁহারা যে ভাবের সহিত এতকাল পর্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সেই ভাব সত্ত্বে কি প্রকারে তাঁহারদিগকে পূর্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে যে সকল অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্য্যগুণে তাহা সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল

উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।"

প্রথম প্রস্তাবে উক্ত ব্রাহ্মগণ এই চেয়েছিলে যে, "ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য বা উপাচার্য বা অধ্যেতা কোনো সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।" এর উত্তরে মহর্ষি জানাচ্ছেন জাতিবিভাজক ও গোত্র প্রকাশক যে সকল উপাধি সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদসূচক। দীপ্যমান চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে, বোধহয় তাহা রহিত করা তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদসূচক একমাত্র উপবীতই তোমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য। আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না।" এর পরে মহর্ষি ১৭৮৯ শকের ১১ কার্তিক "ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান" নামক বক্তৃতায় বলেন, "কালেতে অবশ্যই হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম প্রবেশ করিবে।" কেন না বরাবরই মহর্ষির মত যে "হিন্দুস্থানের সকল শাস্ত্রেই এই প্রতিপন্ন করে যে মুক্তিলাভ ব্রহ্মোপাসনাতে। পৌত্তলিকতা দুর্বল বুদ্ধির নিমিত্তে।....আমাদের হিন্দুস্থানে ব্রহ্ম অপরিচিত বস্তু নহেন।...পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রহ্মের উপাসনা অরণ্যের মধ্যে ছিল। অরণ্য হইতে ব্রহ্মের উপাসনা আমাদের ব্রাহ্মধর্মের আদেশে গৃহের মধ্যে, নগরের মধ্যে সমাজের মধ্যে আনিতে হইবে।...আপনার ধর্মকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া পূজনীয় পিতামাতার ধর্মের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হইবে না—ইহাই সর্ববাদিসম্মত শিষ্টাচার।...ব্রাহ্মেরা এই প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজে ক্রমে যুক্ত হইতে পারিবে"—প্রসিদ্ধ এই বক্তৃতাটি শেষ করেছেন মহর্ষি এই আহ্বান জানিয়ে—"হে ব্রাহ্মগণ!...স্বীয় আত্মাকে উন্নত কর, পরিবারকে উন্নত কর, হিন্দু সমাজকে উন্নত কর।"

ব্রাহ্মরা হিন্দু কিনা, এই নিয়ে পরেও প্রশ্ন ওঠে। রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু-সমাজের একটি উন্নত শাখা বিশেষই মনে করতেন, হিন্দু থেকে ব্রাহ্মকে বিযুক্ত করে দেখতেন না। "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধে নিজেকে তিনি হিন্দু ব্রাহ্ম-রূপেই পরিচিত করে এসেছেন। শুধু উপাসনাতে নয়, মানুষের জীবনধারা বিস্তারের মূল সূত্রই তিনি নির্দেশ করেছেন মহর্ষির উক্ত সেই—"সকল দেশের সকল জাতির যোগ দিবার অধিকার" স্বীকার করা ও আচরণ করা। বিশ্বভারতী সেই সূত্রেরই কার্যকরী রূপ।

মহর্ষির তত্ত্ববোধনী সভার আগে থেকেই রামমোহন রায়ের সংস্থাপিত

'ব্রাহ্ম-সমাজ' চলে আসছিল। পিতামহীর মৃত্যুর ঘটনা থেকে প্রবল বৈরাগ্য জন্মাবার পর মহর্ষির মধ্যে ক্রমে নিরাকার এক ব্রহ্মের উপলব্ধি ঘনীভূত হয়। তিনি প্রতিমা পূজাদি পৌত্তলিক ধারা ত্যাগ করেন। জনকয়েক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দল বেঁধে যখন 'তত্ত্ববোধিনী সভা' গড়েছেন এবং এই নূতন জ্ঞান ও আচরণ নিয়ে একত্রত হয়ে তাঁরা ক'জন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন, তখন মহর্ষির দৃষ্টি যায়—রামমোহনের 'ব্রাহ্ম-সমাজের' প্রতি। তিনি লিখেছেন—"আমি…ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম এবং তত্ত্ববোধিনী সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। নির্ধারিত হইল, তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম-সমাজের তত্ত্বাবধান করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম-সমাজের মাসিক উপাসনা ধার্য হইল এবং ২১শে আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনীর সাম্বৎসরিক সভা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিবস ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ প্রবর্তিত হইল।" (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) মহর্ষির এ কথাগুলির সহিত তাঁর আর-একটি কথাও এখানে আমাদের স্মরণযোগ্য: "অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্ম-সমাজ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।" সুতরাং দেখা যায় ব্রাহ্ম কথাটি বহু পুরাতন।

সার্থক মহর্ষির বাণী। ব্রাহ্মধর্ম আজ হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে হিন্দুধর্মকে আধুনিককালে অনেকখানি উদারতর করছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহর্ষি বলেছিলেন—"শরৎকালে উৎসব আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু দুর্গাপূজা আর থাকিবে না।" দেশ থেকে পূজো উঠে যায়নি, কিন্তু মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত কোনো কোনো সমাজ-সম্মিলন, নববর্ষ ও ঋতু উৎসবাদি সম্প্রদায়নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজের উৎসবে পরিণত হতে চলেছে, তার আভাস পাওয়া যায়। "শিব পূজা না করিলে পিতা রুষ্ট হন না" কিন্তু "বিদ্যালয়ে না গেলে পিতা রুষ্ট হন।" মহর্ষির এ কথাটি যে আরো বেশি সত্য তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই প্রতি বছর প্রমাণ করে। মহর্ষি স্থাপন করেছিলেন অবৈতনিক বিদ্যালয়, শিক্ষাচার্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় হন তার প্রথম শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথও পরে ছাত্রদের 'বিদ্যালয়ে যাওয়া'র পথই প্রশস্ততর করেছেন। তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রেখেছেন একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের উপাসনা, যা শুধু হিন্দু নয় সকলেরই উপাস্য। সেই

থেকে শান্তিনিকেতনকে রবীন্দ্রনাথ শেষে এমনস্থলেই চালিয়ে নিয়ে এসেছেন, যেখানে শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং নিরীশ্বর লোকেরাও অবধি এসে অবাধে মিলতে পারে—সেই "সকল দেশের সকল জাতির যোগ দিবার অধিকার" নিয়ে। এ সবই সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মূলত সেই "সর্ববাদীসম্মত শিষ্টাচার" গুণেই। মহর্ষি প্রবর্তিত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের এই আদি গুণটি এক রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে যতখানি মহর্ষির স্বপ্নকে সার্থকতা দিয়েছে, সমগ্র ব্রাহ্ম-সমাজের কাজের তুলনায় তার-ও ফল নেহাত কম নয়।

৫

রামমোহন রায় হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেই তাঁর যা-কিছু সংস্কার-কার্য করেছিলেন। সংস্কারগুলি তাঁর কাছে হিন্দু সমাজের পরিচ্ছন্ন রূপ বলে গণ্য হয়েছিল। সহজ অধিকারবোধেই তিনি আপন সমাজের উন্নতি ও সেবার কাজ করতেন; সে-কাজে অন্য কারো বাধা, সহযোগ, নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা রাখতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হয়ে উঠেছিল ধর্মসাধনা। সমাজে বিপ্লবের ঝড়ও তুলেছিলেন তিনি সেই একটি দিক দিয়েই।

বিপ্লব বা স্বাধীনতার ধর্মই এই যে, একবার একটি দিক দিয়ে তার অঙ্কুর দেখা দিলে, তা নানা দিক দিয়ে নানা বাধা ভাঙতে থাকে। মহর্ষি বিপ্লব এনেছিলেন বটে, কিন্তু সময়ের অপেক্ষা এবং সাধ্যের বিচার করে তিনি সকলকে কাজে অগ্রসর হতে বলতেন। তিনি বলেছেন—"ক্ষিপ্রকারী হইয়া যদি সময়কে সঙ্কোচ করিতে যাও, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে।" এই সদুপদেশটি দিয়ে প্রগতির মূলনীতিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "আর একবার যখন আমি আদি সমাজের সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে, 'আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের আচার্য বসেন না, ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না। তিনি তখনই আমাকে বলিলেন, বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহাব প্রতিকার

করিও।' যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম, প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি, কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়। ঠিক লোককে আহ্বান করিব, এমন জোর কোথায়। ভাঙ্গিয়া সে-জায়গায় কিছু গড়িব, এমন উপকরণ কই। যতক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো, ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন।"

স্বাধীনতার প্রেরণা মহর্ষির মধ্যে সহজাত ছিল। তার সঙ্গেই তিনি পেয়েছিলেন হিতাহিত বিচারের দূরদর্শিতা বা ভূয়োদর্শন। এই ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি আপন কার্যক্ষেত্রটিকে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রেখে-ছিলেন; তার উপরে অপরের যথেচ্ছ হস্তক্ষেপে বিশৃঙ্খলা ঘটতে দেননি। প্রতিপক্ষের কার্যক্ষেত্রে তিনিও হস্তক্ষেপ করতে যাননি। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিগুলি 'আত্মজীবনী'র প্রিয়নাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে সঙ্কলিত পত্রাবলী ও কয়েকটি ভাষণ থেকে জানা যাবে।

মহর্ষির মধ্যে গোঁড়ামির বালাই ছিল না। উপযোগিতা যাচাই না করে তিনি কোন বিষয়ে বিমুখ থাকেন নি। তাঁর মধ্যে জানবার স্পৃহা ছিল প্রবল। জানার পরে চলেছে বিচার। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান বহু ধর্মের তীর্থ ও উৎসবাদির ক্ষেত্রে তিনি গিয়েছেন, তাঁদের ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন। নানা ধর্মের নানা লোকের সঙ্গে মিশেছেন; আর, সবকিছুর মধ্যে সত্যের সঙ্গতি খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। এই করেই তাঁর জীবন কেটেছে। তাঁরই ভাষায় সে-কাজকে বলা যায়—"জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি"-চেষ্টা। সেকালে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতে মহর্ষির প্রধান চারটি বক্তৃতা সঙ্কলিত ছিল। একটি বক্তৃতার নাম ছিল "জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি"। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই "জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি"-চেষ্টা বিশেষভাবেই স্ফূর্তিলাভ করেছে। তাঁর সর্ব-কর্ম ও প্রেমের মূলে পিতার জ্ঞানস্পৃহা নিহিত থেকে শক্তিদান করেছে। জ্ঞানপন্থী মহর্ষির রচিত প্রথম গান—"হবে, কি হবে দিবা আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।" তিনি আত্মজীবনীতে

লিখেছেন—"আমি সেই সমাধিস্তম্ভে বসিয়া একাকী এই গানটি মুক্তকণ্ঠে গাইলাম।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

মহর্ষির দেশভ্রমণের অভ্যাস সঞ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। মহর্ষি বরাবর কিছুদিন পরে পরেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। লিখেছেন,—"সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না—জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে, বিপদে, সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার পালনী শক্তি অনুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়িতে থাকিতে পারিলাম না।" (আত্মজীবনী, ১৪শ পরিচ্ছেদ।) কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, সিমলা, কোথায় বোম্বাই, পুরী—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সিংহল (১৭৮১ শক আশ্বিন), ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ও মুসলমান, পুরীতে বৈষ্ণব, কাশীতে শৈব, বোম্বাইয়ে জৈন আর্য, থিয়োসোফিষ্ট, অমৃতসরে শিখ ও সিমলার নিকটস্থ সোহিনী নামক স্থানে তান্ত্রিক সুখানন্দ স্বামী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। খ্রীষ্টধর্মের 'ফরাশীস মহাত্মা' ফেনেলনের স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ তিনি তাঁর উপাসনায় আবৃত্তি করেছেন। জেনারেল ওয়াকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতে আসতেন, চিঠিপত্রে তাঁকে সম্বোধন করতেন 'Reverend Father' বলে। দেশীয় খ্রীষ্টান লালবিহারী দে প্রভৃতিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

এমন কি, চাষী-মজুর সাধারণ গৃহস্থ এবং আদিবাসীরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে মহর্ষিকে কাছে পেয়েছিল। জলপথে ভ্রমণকালে ভোজপুরে বজরা থেকে নেমে তিনি একবার সুদূর গ্রামাভ্যন্তরে হেঁটে চলে যান। সেখানে "একটা বাগানে একটা পড়ো শুকনো আমের গাছের গুঁড়িতে ছায়ায়" বসে চক্ষু বুজে ভজন গান করছিলেন, "তাহা শুনিয়া গ্রামের লোকেরা" তাঁকে দেখতে একত্র হয়েছিল। তিনি তাদের হিন্দিতে উপদেশ দিতে দিতে তাদের সঙ্গেই অবশেষে বজরার অভিমুখে ফিরে আসেন। হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণের সঙ্গী ছিল অনেক পাহাড়ী, অনেক সময় আশ্রয়দাতা ছিল তারাই। আত্মজীবনীর চতুর্থ পরিচ্ছেদের "পদ্মার মাঝি"-র গল্পটি স্মরণীয়। এদের মত সাধারণ লোকের এক-একটা কথা পথে-ঘাটে তাঁর মনে অনেক সময় প্রেরণার উদ্রেক করেছে।

অন্ধ দরিদ্রের সাহায্যার্থে মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর লক্ষ টাকা দান করে যান। পরবর্তীকালে "ব্যক্তিগত ব্যয়ের টাকা হইতে বাঁচাইয়া" সে পরিমাণ অর্থ গবর্ণমেন্টের হাতে দিয়ে তার সুব্যবস্থা না করা অবধি মহর্ষি স্বস্তি পাননি। ১৭৮২ শকে পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। ১২ চৈত্র তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাস্থলে ভাষণে সেই ঘটনার উল্লেখ করে সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সংগৃহীত হাজার তিনেক টাকা ও জিনিসপত্রাদি দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য যথাস্থানে পাঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথও শিলাইদহে এবং শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেবার বিবিধ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। একমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রাজ্যেই কবি ধর্মকে নিবদ্ধ রাখেন নি, ধর্ম রূপ নিয়েছিল বাস্তব কর্মেও। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা ছিল তার অন্যতম বিষয়। অন্ধদের প্রতি তাঁর সহৃদয়তা মহর্ষির আচরণেরই অনুরূপ। অন্ধদের একটি সেবানিকেতনের উদ্বোধনও কবি সম্পন্ন করেছিলেন। একটি গানও তিনি লিখেছিলেন সেই উপলক্ষে। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা ইত্যাদিতে নানা সাহায্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে দুর্গতদের দুর্গতিমোচনেব চেষ্টা কবি অনেকবার করেছেন। জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার আকুলতা-মাখা তাঁর গান, কবিতা, নানা লেখা; ভাষণও আছে অজস্র।

সমাজ ও স্বদেশের হিতসাধন-উদ্দীপনা মহর্ষির মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" স্থাপনের ঘটনাটি তার আদি উদাহরণ। জাতিকে দুর্গতি থেকে বাঁচিয়েছিলেন সেদিন বিশেষ করে তিনিই। খ্রীষ্টান না হয়ে যাতে যথার্থ স্বাজাতীয়ত্বের দীক্ষায় ভবিষ্যৎ বংশধরেরা গড়ে উঠতে পারে সেই সৃষ্টিধর্মী কাজকেই তিনি 'বিদ্যালয়' রূপে ধরেছিলেন দেশের সামনে। গড়াকেই করে নিয়েছিলেন বিরুদ্ধ শক্তিকে ভাঙার উপায়। তাঁর সেই সংগঠন-শক্তিই শেষে পরবর্তী জীবনে ধর্মকে প্রধান অবলম্বন করে প্রবাহিত হয় নানা আধ্যাত্মিক কাজে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতচর্চার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে কাশীতে রেখে উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন। কিন্তু এদিক দিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবহেলা দেখান নি। সহজ শক্তির সঙ্গে ঐকান্তিক অনুরাগে নিজে বাংলায় নানা রচনা লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ভূমিকা তৈরির কৃতিত্বও কতকটা দেবেন্দ্রনাথের। মহর্ষির আত্মজীবনী সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান।

সংস্কৃতি প্রচারকল্পে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৭৬১ শক ২১ আশ্বিনে রবিবার প্রতিষ্ঠা-দিবস) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৬৫ শক) তাঁকে কর্মের দিক দিয়ে স্মরণীয় করে রাখবে। কর্মমার্গে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রমুখী বিপুল ও বিস্তৃততর প্রচেষ্টার দ্বারা পিতৃপ্রদর্শিত পথেরই যে আরও পূর্ণতাসাধন করেছেন, তার পরিচয় নানা ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। শুধু ধর্মে নয়, জ্ঞানে কর্মে নানা দিক দিয়েই সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট সমাজই তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কবি গড়েছেন বিশ্বভারতী। তাতে নানা দেশের শিল্প বিজ্ঞান এবং নানা ভাষা ও সাহিত্যের সমাবেশ ঘটেছে। মহর্ষির আলোচনার বিষয়ের মধ্যে একদিকে ছিল যেমন স্বদেশীয় বেদ পুরাণ উপনিষৎ গীতা ভাগবত তন্ত্রসংহিতা "বাল্মীকি-রচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ" ও জয়দেবের গীত-গোবিন্দাদি কাব্য—তেমনি অন্য দিকে ছিল বিদেশীয় মুসলমান-সাধক কবি হাফেজের বয়েৎগুলি; অনর্গল তা তিনি আবৃত্তি করতেন, লেখায়ও তা ব্যবহার করতেন। এর দ্বারা সংস্কৃত ও ফারসীতে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় মেলে। হিন্দীতেও তাঁর দখল ছিল (দ্রঃ বেরিলি বক্তৃতা)। অনেক স্থলে হিন্দী ভাষণও তিনি দিয়েছেন। ইংরেজীতে ব্রাহ্ম-সমাজের নানা প্রচার-কার্যের ভার দিয়ে রেখেছিলেন তিনি রাজনারায়ণ বসুর হাতে। ইংরেজীর আলোচনা তিনি নিজেও বিশেষভাবেই করতেন। লিখেছেন: "একদিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপরদিকে ইংরাজী। আমি ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম।" (আত্মজীবনী ৩য় পরিচ্ছেদ)

তাঁর শিল্পানুরাগী মন সর্বত্রই যথোচিত সাজসজ্জা ও পারিপাট্য পছন্দ করত, কিন্তু তিনি অসংযম বা উচ্ছলতার প্রতি ছিলেন বিরূপ। মৌলমিনে ব্রহ্মদেশীয় নৃত্যগীত এবং সিমলার পথে পাহাড়ীদের অঙ্গভঙ্গি সহকারে সরল আমোদ তিনি উপভোগ করেছেন। সঙ্গীতের অনুরাগ ও উৎসাহ রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছে যথেষ্ট পেয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে অমৃতসরের গুরুদরবারের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত।" ভগবৎ তন্ময়তার সঙ্গে পিতার এই গান বা গানের প্রতি অনুরাগও বহু স্থলেই পুত্রের মনে রেখাপাত করেছে। তিনি লিখেছেন,

—"যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তাঁহাকে তখন ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি :

'তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে,
কে সহায় ভব অন্ধকারে।'

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।"

মহর্ষি নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে পরিবারের লোকদের পর্যন্ত কিরূপ উৎসাহিত করতেন, একটি নাট্যশালা উদ্‌ঘাটন সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা ছোট একখানি পত্রে তা জানা যায় : "পূর্ব্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে।...সদ্‌ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বিজ্ঞান-শিক্ষায়ও কবির প্রথম দীক্ষা পিতার কাছেই।

কবি লিখেছেন, (হিমালয়-যাত্রার পুর্বে) "প্রক্টরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় আমাকে মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন, আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।" এর আগে বোলপুরের মাঠে কবিকে তাঁর পিতা "সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন। ডালহৌসি পাহাড়ে ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্ব্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।"—(জীবন-স্মৃতি)।

বাল্যকালে ভাষা, গণিত এবং নানা সহবৎ ও কৃত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনের সংগঠন হয়েছে অনেকটা তাঁর পিতারই হাতে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাধারা প্রবর্তন করেন, তারও মূল সূত্রগুলি সেখান থেকেই পাওয়া। এর মধ্যে বড় কথা যেটি, তার বিষয়ে নিজেই কবি বলছেন, "ভুল করিব বলিয়া তিনি [মহর্ষি] ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন

হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন; কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।” রাশভারী স্বভাবের গভীরতা এবং তারই পাশাপাশি সহজ মেলামেশা ও হাস্যকৌতুক গল্পগুজব দ্বারা চিত্তের সরসতাও মহর্ষি পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করে গিয়েছিলেন। জীবনস্মৃতিতে আছে; “পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারও চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর কাহারও কাছ হইতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বড়দাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোন চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কি করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে; এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই সমস্ত কায়দাকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।...তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন।”

অথচ ইঁহারই সম্বন্ধে কিছু আগে লেখা আছে—“নেড়া মাথার উপরে টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, ‘মাথায় পরো।’ পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু, পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।...তাঁহার সঙ্কল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয় যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনও কারণে কোনও বাধাই দিতেন না; যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।”

মহর্ষি জীবনযাত্রার ধরণ ছিল বিষয়-উদাসীন সন্ন্যাসীর মত, কিন্তু তা বলে বিষয়-কর্ম তিনি বর্জন করেন নি। তিনি বেঁধে দিয়েছেন তাঁর বিষয়ের বাঁধুনি, কিন্তু বিষয় তাঁকে বাঁধতে পারেনি। জমিদারীর নথিপত্র, ব্যবসায়ের হিসাব—সব তিনি দেখতেন, তার সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যেকটি ক্রিয়াকর্মের নিখুঁত ব্যবস্থার নির্দেশও যেত তাঁর কাছ থেকেই। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখছেন—“বড় বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে

হিসাব দিতে হইত সেই দিনের কথা আমার এইখানে মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক ষ্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। পূর্বেই বলিয়াছি মনের মধ্যে সকল জিনিস সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল—তা হিসাবের অঙ্কই হোক, বা প্রকৃতির দৃশ্যই হোক, বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে, প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাড়েন নাই।" মহর্ষি এসব নানা কাজকর্ম পরিচালনা করিতেন; আবার একই সঙ্গে মনকে ডুবিয়ে রাখতেন পরমাত্মার ধ্যানে। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একাধারে এই কর্মপরায়ণতা ও বৈরাগ্যের সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু এ সবলেরই মূলে ছিল ঐকান্তিক ঈশ্বরানুরক্তি।

মহর্ষির সেজ ছেলে হেমেন্দ্রনাথ মারা গেছেন। মহর্ষি আছেন চুঁচুড়াতে। সংবাদ দেওয়া হ'ল সন্তর্পণে। বৃদ্ধবয়সে বয়স্ক পুত্রের শোক। মহর্ষি শুনে বললেন "মৃত্যু হইয়াছে"? বলিয়া একটু দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাঁহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা বাঁধ ছিলেন, এখন সে বাঁধ ভাঙিয়া গেল, জল আবার আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জান যে, মৃত শরীর কিভাবে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হস্তপদাদি সমানভাবে রাখিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করতঃ অভ্রমিশ্রিত ফল্গু ও পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না? আর বিদ্যারত্নকে এখানে আসিতে লেখ, কি প্রকারে হেমেন্দ্রের শ্রদ্ধা করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা উচিত।" পত্নী সারদা দেবীর মৃত্যুদিনে মহর্ষির অবস্থার বর্ণনাটি পাই 'জীবনস্মৃতি'তে 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।"

রবীন্দ্রনাথও বিষয়কর্মের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তাঁর 'সর্বাস্তিবাদ'

ধর্ম আচরণ করেছেন। পুত্র, কন্যা, পত্নী, দৌহিত্র, জামাতা প্রভৃতির অকাল বিয়োগের নিদারুণ ক্ষণেও তাঁর সে পরম চিন্তার ধারা রুদ্ধ থাকেনি। নিজের মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘদিনব্যাপী দুঃসহ রোগযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে চলেছেন সেই উপলব্ধিরই আনন্দে। এপার-ওপার পূর্ণ করে বিরাজিত তখন তাঁর কাছে শুধু সেই এক 'আনন্দরূপম্' সত্তার অমৃত জ্যোতি।

মৃত্যুর উপক্রম পিতার মত পুত্রেরও ঘটে—দু'বার। প্রথম বারে আশ্চর্যরূপে মহর্ষির সঙ্কট কাটে, রবীন্দ্রনাথেরও তাই হয়। 'মৃত্যুর দেহলি' থেকে তিনি ফিরে আসেন। প্রথম সঙ্কটের পর, বছর পাঁচেকের মধ্যেই পিতাপুত্র দু'জনে যথাক্রমে একই বয়সে ক্ষতযন্ত্রণায় ভুগে প্রায় একই ক্ষণে পৈতৃক আবাসে পরে-পরে দেহত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুশয্যায় রবীন্দ্রনাথ পিতাকে উপনিষদ থেকে মন্ত্র আবৃত্তি করে শোনান,—দু'জনে পার্থিব যোগাযোগের শেষ ঘটনাটি এই। পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপনিষদের আত্মিক আলোই কবির সমগ্র জীবনপথকে আলোকিত করে রেখেছিল।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে, হিমালয়যাত্রার প্রারম্ভে কিছুদিন তাঁদের "বোলপুরে থাকিবার কথা হয়।" বোলপুর মানে তখন শান্তিনিকেতন। বোলপুরে এসে এখানকার মাঠের থেকে নুড়ি কুড়িয়ে এনে পুত্র রোজই পিতাকে দিতেন। পিতা উৎসাহ দিয়ে বলতেন—"কী চমৎকার! এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে?···ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।" পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসতেন বর্তমান মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পুকুরের দক্ষিণ পাড়ির উঁচু ঢিপিতে। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তর সীমায় সূর্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন।"

শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় ছিল মহর্ষির সূর্যাস্ত দেখার বেদী। রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমার মনে পড়ে, সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না—সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা।" (প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন, পৃঃ ৭৪১-৪২।) ছাতিমতলার ধ্যানাসনের শীর্ষফলকে মহর্ষি তার প্রিয় মন্ত্র "শান্তং শিবমদ্বৈতং" লিখিয়ে

রেখেছিলেন। আত্মজীবনীতে (বিংশ পরিচ্ছেদ) মহর্ষি বলেছেন—"এতদিন ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনাতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" এই দুই মহাবাক্য ছিল। ইহা অপূর্ণ ছিল। এখন তাহাতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" যোগ হওয়ায় তাহা পূর্ণ হইল। সমাজের উপাসনাপ্রণালী প্রথম প্রবর্তিত হইবার তিন বৎসর পরে ১৭৭০ শকে আমি তাহাতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" যোগ করিয়া দিই।…যিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আপনাতে আপনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন যে, জ্ঞান ধর্মে, প্রেম মঙ্গলে সকলে উন্নত হউক—তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতং"। সাধকদিগকে এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন।" এই মন্ত্রটি মহর্ষির জীবনে পরম আসন অধিকার করেছিল।

মহর্ষির নোট বইয়ে নানা মন্তব্য লেখা ছিল। তার একটি এইরূপ :

"I examined, I doubted, I believed that the strength of the human mind is sufficient to solve the problems presented by the universe and man and the strength of the human will is sufficient to regulate man's life according to its law and moral end. It is my profound belief that God, Who created the universe and man, governs and preserves or modifies them, either by those general laws which we call natural laws or by special acts emanating from his perfect and free wisdom and from his infinite powers which, he has enabled us to recognise in their effects. I see him present and acting not only in the permanent Government of the universe, and in the innermost life of men's souls but in the history of human societies."

মানুষের মন জাগতিক সমস্যা সমাধানের শক্তি রাখে এবং পার্থিব যাবতীয় নিয়মতন্ত্র ও নৈতিক সিদ্ধির দিকে মানুষের জীবনকে চালিত করে নেবার পক্ষে মানুষের ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট সক্ষম।—মহর্ষির এই কথাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের মানব-মহিমাব্যঞ্জক কথাগুলির বিলক্ষণ মিল আছে।

ব্রাহ্মধর্ম স্বতন্ত্র ধর্ম নয়। হিন্দুধর্মেরই একটি বিশিষ্ট শাখা ব্রাহ্মধর্ম। "হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মধর্মভুক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এই আদি-সমাজ সংস্থাপিত হয়"—এই কথা দ্বারা এবং আরও নানা স্থলে মহর্ষি হিন্দুসমাজের এই বিশিষ্ট 'সমাজ'টিকে তার সুনির্দিষ্ট শীর্ষস্থানে সমাসীন দেখতে চেয়েছেন। এ কাজে অগ্রসর হয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "কেবল আপনি উন্নত হইলে হইবে না, কিন্তু সকলকে সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন:

চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর॥

(সোনার তরী)

'মুক্তি' কবিতায় বলেছেন:

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি বসে রব মুক্তি-সমাধিতে?

(সোনার তরী)

দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিপ্লব অনেক দোষের।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পিতার জীবন ছিল বিপ্লবেরই কেন্দ্র। পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে আপন হিন্দু-সমাজে ও পরিবারে তিনি এই বিপ্লবেরই সূত্রপাত করেন। আবার এই পৌত্তলিকতাশ্রয়ী অথচ ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগী হিন্দু-সভ্যদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে এবং অবতারবাদ-রোধের প্রবল চেষ্টা করে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও বিপ্লব এনেছিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের দিক থেকে সমাজকে কিছু যদি দেবার থাকে তবে যাদের তা সংগ্রহ করে নেবার তারা তা আসা-যাওয়ায় মেলা-মেশায় আপনি দেখে শুনে বুঝে নেবে। স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা সেই সত্যই অক্ষয় রূপে কাজ করে চলবে সকলের মধ্যে। ব্রাহ্মণদের দিয়ে বেদ পাঠ করানোতে অনেকে তাঁকে রক্ষণশীল মনে করতেন। কিন্তু সেদিকেও তাঁর যুক্তি ছিল। কাজের ক্ষেত্রে যোগ্যতারই সমাদর করতেন। আচার্যের কাজে যে তাঁর জাতিগত কোন মোহ ছিল না—কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' আখ্যায় ভূষিত করে আচার্যত্বে বরণ করার ঘটনাই তার প্রমাণ। মনে রাখতে হবে, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্র তাঁরই রচনা। তবে তিনি বরাবরই বলতেন—'শান্তভাব চাই, ভূয়োদর্শন ও ধৈর্য চাই।"—এসব বলতে এবং করতে গিয়ে ঘর ভেঙে গেল,

বাইরেও সেদিন দেখা দিল দারুণ ঝড়। তিনি কিন্তু লক্ষ্যপথে চললেন এগিয়ে ; ক্ষয়-ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপহীন, সংগঠনে একাগ্র, পরিশ্রমে নিরলস ; শান্ত সৌম্য দীপ্তিমান তিনি, সর্বক্ষণ অদম্য এবং আত্মসমাহিত।

মহর্ষির হৃদয় ছিল অনুভূতিশীল ; কিন্তু নীতিতে ছিলেন তিনি অবিচল। নৈষ্ঠিকতা বা বৈষয়িক দ্বন্দ্বের অনুকূল শুষ্ক কঠোরতা তাঁর চরিত্রের বা কাজের মধ্যে প্রাধান্য পায়নি। রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে 'হিমালয় যাত্রা' অধ্যায়ে লিখেছেন যে, তাঁর বাল্যকালে মহর্ষি তাঁকে নানা বই পড়াতেন। ছেলেকে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনী পড়াতে মহর্ষির ভাল লাগত না। "ফ্র্যাঙ্কলিনের হিসাব-করা কেজো ধর্মনীতির সঙ্কীর্ণতা পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।" মহর্ষির আধ্যাত্মিক আগ্রহ সর্বদার তরেই জাগ্রত ছিল। এক ঈশ্বরের আচ্ছাদনে তিনি সকলকে আবৃত করে দেখতেন। এর মূলে ছিল অনুভূতির প্রভাব।

মহর্ষি ও তাঁর পুত্রের জীবনের উদ্বোধন-অধ্যায়েই মেলে দুটি অনুভূতিঘন ঘটনা। পিতার ঘটেছিল পিতামহী-বিয়োগের বেদনাতে মুহ্যমান অবস্থায় বৈরাগ্য ; তার মধ্যে একদিন হঠাৎ উপনিষদের উড়ে-এসে-পড়া এক জীর্ণ পত্রাংশ থেকে "ঈশাবাস্য" মন্ত্রটি তিনি পড়লেন। তাঁর জীবনে প্রথম সেই পরম উপলব্ধি হ'ল। পুত্রেরও রুদ্ধ-গৃহের-বাঁধা প্রাণের বেদনা পাক খেত গুমরে গুমরে। বাল্যে সেই বালকও একদিন দোতালায় দাঁড়ানো অবস্থায় প্রভাতের আলোর মধ্যে পেয়ে গেল আপনার পরম লোকের উৎসবের ডাক। অনুভূতির এই বিচিত্র লীলা রয়েছে দুয়ের জীবনকেই ঘিরে। দু'জনের মহাজীবনের পথ খুলে দিয়েছে আবেগের এক-একটা তীব্র সঙ্ঘাত। একজন হয়েছেন ধর্ম-প্রবর্তক, অন্য জন হয়েছেন কবি।

সাহিত্য-সমীক্ষায়

১

১৩৪৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে শান্তি নিকেতনে কবির আবাস "উদয়ন"-এ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু কয়েকদিন ধ'রেই সাহিত্য-শিল্পাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। সকলেই জানেন, সে-সব আলোচনার মর্ম তখন সাময়িকপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়, ইতিমধ্যে গ্রন্থেও তা নিবদ্ধ হয়েছে।

কবির দপ্তরে কাজ করবার উপলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে আশেপাশে থেকে উপরোক্ত আলোচনা কিছু-কিছু শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আলোচনা শেষ হয়ে গেলে, কৌতূহল-বশে স্মৃতি-থেকে-লেখা সেই আলোচনার প্রতিবেদনের একটি খসড়া ক'দিন বাদে কবিকে একবার দেখাই। সেটি উপলক্ষ্য ক'রে এক সকালে উদয়নের দ্বিতলে বসে কবি অনুবৃত্তি স্বরূপ আরো কিছু বলেন। সবটা টাইপ ক'রে তাঁকে দেওয়া হল। তিনি দেখে দিলে প্রকাশার্থে পাঠানো হল 'প্রবাসী'তে।

'প্রবাসী' থেকে যথাকালে প্রতিবেদনটির প্রুফ এল। পূর্বে তাঁর অনুমোদন পেলেও, তাঁর অভ্যস্তরীতিতে প্রুফে যদি কিছু শেষ-সংশোধন বা সংযোজন তিনি আবশ্যক মনে করেন, এই আশাতে প্রুফটি তাঁর কাছে রাখা হল। কিন্তু দেখা গেল প্রত্যাশিত সংশোধনের জন্য যে-পরিশ্রম আবশ্যক, কবির স্বাস্থ্যের পক্ষে তখন তার ঝুঁকি নেওয়া অনুকূল নয়; কারণ, ক'দিনের মধ্যে আকস্মিক এমনি পরিবর্তন ঘটেছে। প্রুফে তাঁর সংশোধনের অভাবে এবং তাঁর অসুস্থতার দরুন যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় সেই সব নানা কারণেই লেখাটির প্রকাশ বন্ধ রইল।

অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই এর প্রায় কথাই কবির নানাগ্রন্থে নানা উপলক্ষ্যে উল্লিখিত হয়েছে। তবে, স্বকীয় আধারে রবির কিরণ ধ'রে রাখে শিশিরকণাও; মানুষের বেলায় সে-আগ্রহ দুর্বলতাই হোক্, আর যা-ই হোক্,—লেখাটি সযত্নেই রক্ষিত ছিল; বিশেষত, এর পাণ্ডুলিপিতে কবির স্পর্শ আজো অম্লান রয়েছে;—তার আকর্ষণও ছিল দুর্নিবার। তিনি স্বহস্তে নূতন কিছু লিখে দেননি সত্য, কিন্তু কপিটি আগাগোড়াই দেখেশুনে স্থলে-স্থলে বর্জনীয়

অংশগুলি নিজের হাতেই কেটে দিয়েছিলেন ; তাঁর পেনসিলের সেই কাটা-দাগ এক পাতায় নয়, তিন পাতাতে সুস্পষ্ট রয়েছে এবং তাতে, কবির কথা নয়, অন্যকথার অংশই বেশি বাদ পড়েছে। যা-কাটেননি আর যা কেটেছেন—সব মিলেই নির্দেশ করে যে, একবার এই ভাষণের মর্ম ইতিপূর্বেই তৈরি হয়ে গেলেও, এর প্রতিও কবির কী দৃষ্টি ছিল এবং কেন এরও প্রকাশ তখন-পর্যন্ত তিনি অনাবশ্যক মনে করেননি। যা হোক, তখন থেকে 'প্রবাসী'র প্রুফ এবং সেই টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি, দুইই বাক্সে প'ড়ে সেদিনকার স্মৃতি রক্ষা করছিল মাত্র।

ইতিমধ্যে এসে গেল কবির জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। উপচারচয়নে সকলেই বিশেষ উৎসুক। বলা বাহুল্য, উৎসবের বড়ো উপচার—তাঁর জিনিসগুলি। সেই-সকলেরই স্থান আজ সকলের আগে। তা ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক,—মলিন হোক জীর্ণ হোক,—সে-সবের সংগ্রহই এখন প্রধান কাজ।

রবীন্দ্র-সংস্কৃতি-বিস্তারে সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান কলকাতার 'গীতবিতান'। তাঁদের পরিকল্পিত 'গীতবিতান পত্রিকা'র রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী-সংখ্যায় নানা বিষয়ক রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রভাষণের অনুলিখন বিষয়েও একটি বিশেষ আলোচনা সংগ্রথিত করবার কথা তাঁরা জানালেন। সেই উপলক্ষ্যে যখন তাঁদের খোঁজ-খবর চলছিল, তখন প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত অপ্রকাশিত অনুলেখনটিরও কথা ওঠে। 'গীতবিতান পত্রিকা'র সম্পাদনা-দপ্তর তাঁদের সংকলনে অনুলেখন-সূচীর পাশে এরও ঠাঁই ক'রে দিতে আগ্রহী হন।

এককালে কবি যা বাদ দিয়েছেন, এরূপ লেখাও তাঁর রচনাবলীতে লোকের আগ্রহের দাবি মিটিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। কবি-জীবনের শেষ-পর্বে সর্বশেষ এই আলাপ-আলোচনাটি বিষয় ও স্থানকাল পাত্রবিচারে এমনিতেই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁর রচিত ও অনুমোদিত ভাষণসমূহের পাঠ সকলের জানা আছে বলেই, আমাদের এই পাঠান্তরটি পাশাপাশি মিলিয়ে নিয়ে, এরও মূল্যনিরূপণের কাজ আজ সহজ হবে।

এ কথা একদিক দিয়ে যতই সত্য হোক, আরেকদিকে আমাদের হল উভয় সংকট! প্রকাশে গোড়াতেই ঘটেছে এর বাধা ; অথচ, চিরকাল একে বাদ দিয়ে রেখে দিই-বা কোন অধিকারে ? একবার বলা হয়ে গেলেও একই বিষয় দু'বার বলাতে বাহুল্য-দোষ এসে পড়ে জানি ; কিন্তু, প্রকৃতই এ সবটা একই রকমের একই-বিষয় কিনা, সেটাও যে কেবলি দ্বিধা জাগাচ্ছিল।

সেই দ্বিধা-মুক্ত হতে আজ কবি যে "নিরবধি কাল" ও "বিপুলা পৃথ্বী"র অবিনশ্বর সম্পদ হয়ে আছেন, সেই কালের দরবারে সাধারণের গোচরে লেখাটি রেখে দেওয়ার ব্যবস্থাই অতঃপর সংগত মনে হল। ভালো-মন্দ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিচার ইচ্ছামতো তাঁরাই করবেন।

এ-লেখাটির উপসংহার-অংশে এক জায়গায় আছে—"বলতে গিয়ে বলার ধরনের জন্যই একই বিষয়ে অনেক সময় নূতন আলোকপাত ঘটে, বা, ক্ষেত্র বিশেষে কথার স্পষ্টতায় উজ্জ্বলতা বাড়ে,"—এ কথাটুকু তিনি দেখে দিয়েছিলেন, তাও ভুলবার নয়। সুতরাং, একে প্রকাশ ক'রে যত অপরাধের দায় বাড়ুক, সাধারণের নিকট একটিমাত্র নিবেদন রইল যে, গোটা লেখাটি পাঠ ক'রে তাঁরা স্থির করবেন, এটিকে নিয়ে অনুলেখকের পক্ষে এ ছাড়া আর কী করার ছিল!

ভরসা যোগাল তাঁরই বাণী—

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।"

এ তো কেবল তাঁর জীবন সম্বন্ধে নয়, জীবন ও বাণী—উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

তাঁর কথাকে তিনি 'অবর্জিত' হতে দেখে যতই বিরূপ হয়ে থাকুন, আমাদের আশ্বাসের বাণীকে আমরা চিরদিনই খুঁজে ফিরব 'ধুলা'র মধ্য থেকেও। এই জন্যই সেদিনকার পড়ে থাকা লেখাটিকে আজ নিম্নে উদ্ধার করে দেওয়া গেল।

বিষয়টা ছিল, "সাহিত্য সৃষ্টিতে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রভাব।"

জ্যৈষ্ঠের সকালবেলা। কবি তাঁর অভ্যাসমতো উদয়ন-গৃহের দক্ষিণ বারান্দাটিতে এসে সোফায় বসেছেন। রোগের কাতরতা এই প্রাত্যহিক রীতিটির কাছে আজো পরাহত। সুদীর্ঘ শুভ্র দেহে বর্ণদ্যুতি ঈষৎ পাণ্ডুর। দূরে দেখা যায়, মেঘছেঁড়া রৌদ্র-বিকাশে ক্ষ'য়ে-যাওয়া খোয়াই ডাঙার মৃদু আরক্ত আভা। সামনের বাগান থেকে পাপড়িমেলা ফুলগুলির গন্ধস্রোতে বহমান একটি মিষ্টি আমেজ। মাটির স্নিগ্ধতা দিকে দিকে।

তারপরে একথা-সেকথা অনেক কথার মাঝে এক সময়ে বুদ্ধদেববাবু ধরিয়ে

দিলেন তাঁর প্রশ্নটি ;—কবি ব'লে চললেন,—"সাহিত্য সমস্যা মিটাবার জিনিস নয়, সে হচ্ছে নিছক উপভোগের সামগ্রী। অন্য সব কিছু সার্থকতাই তার গৌণ। সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রভাবান্বিত রচনায় সমস্যা আলোচনার প্রবণতাটাই দেখা যায় মাথা ফুঁড়ে ওঠে অধিক, লেখকের অজ্ঞাতেও অনেক সময় তা হয়ে থাকে, তা থেকে তৎকালীন সমস্যা সমাধানের সাহায্যের কাজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শতাব্দী পরে সেই আধুনিক কাল আর আধুনিক থাকে না, তার সে-সমস্যাও হয়ে যায় পুরোনো, আধুনিক, অকেজো, আর তখনই মাত্র আসে তার প্রাণশক্তির পরীক্ষার এবং সাহিত্য-হিসাবে সার্থকতা প্রতিপন্নতার যথার্থ সময়। আধুনিক সাহিত্য, যে-কালের মধ্যে ব'সে লেখা যায় সেই সদ্যকালের ছেঁকে-ধরা আদর রচনার প্রকৃষ্ট স্থায়ী মূল্য বিচারের সঠিক মানদণ্ড নয়, তার সঠিক পরিচয় দূর-কালের রসানুভূতির মধ্যে। সেদিন থাকে তার কাছে লোকচিত্তে রস যুগিয়ে, মাত্র আনন্দ যোগাবারই দাবি। আজ সাহিত্য রসিকদের কেন, প্রায় সকল লোকেরই মন টানে রামায়ণ মহাভারত প্রথমত তার রূপ এবং রসেরই আবেদনে,—লোকের মনে নীতিবোধ সঞ্চার বা বিচিত্র তথ্যগত জ্ঞান আহরণের কাজ তা করে গৌণভাবে। রচনা যদি আধুনিক বিষয় নিয়ে হয়, সে-ক্ষেত্রে পটভূমি লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্থল হওয়ায় যেমন তার আদর লাভের একদিকে আছে অপেক্ষাকৃত সুবিধে, তেমনি দেশের কালের দূরত্বের যে জাদু রচনাকে করে স্বাভাবিক মায়ার আবেগে স্বতই সাহিত্য-রসায়িত, সে-সুবিধে থেকে সে হয় বঞ্চিত। এজন্য অনেক সময় দেখা যায়, সমসাময়িক ইতিহাসের পটভূমিতে তৈরি রচনাতে চিন্তা এবং সমস্যার ভিড়, কিন্তু বিরল থাকে তাতে সাহিত্যিক স্থায়ী রসে উত্তীর্ণতার দুর্লভ গুণ। এই দুর্লভ গুণ যিনি রচনায় দেখাতে পারেন তাঁর গৌরব অবশ্য খুবই বেশি। জনাদর লাভ বা এই স্থায়ী রসের জাদুস্পর্শ লাভের সুবিধা এবং অসুবিধা আধুনিক অনাধুনিক দু'ক্ষেত্রেই আছে। সুতরাং সাহিত্য সৃষ্টিতে একাল সেকালের প্রভাব নিয়ে গোঁড়ামিটা মোটেই কোনো কাজের কথা নয়। যুগের মৌলিকতায় বা প্রয়োজনীয়তায় চিন্তার জিনিসগুলি যতই মূল্যবান হোক সাহিত্যের আসরে পরিবেশনের বেলায় সেগুলিকে রসিয়ে দিতে হবে অনুভূতির মাধুর্যে, এই হোলো সাহিত্যের একমাত্র দাবি। সুতরাং আজকের দিনের তরুণ সাহিত্যিক শুধু কেবল কতকগুলি আইডিয়া বাজারে ছেড়ে দেবার উদগ্র উদ্যম না দেখিয়ে তার স্থলে

স্থায়ী রস-সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে যদি তার স্বকীয় অন্তরগত প্রেরণার আশ্রয়ে সাধনা ক'রে চলেন তবে তাঁর অবদানও এ-যুগ থেকে এ-যুগের অর্ঘ পাঠাতে সক্ষম হবে ক্লাসিক সাহিত্যের অমর-লোকে।

এই কথাই সত্য, সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে মূলত স্রষ্টার মনের বিশেষ এক রকমের প্রেরণা বা রসতৃষ্ণা থেকে। বঙ্কিমের মনে যে বিশেষ একটি রসতৃষ্ণা ছিল তার তাগিদই তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ, আনন্দমঠ ইত্যাদি। মরুভূকে বন্যাজলে ডুবিয়ে উর্বর চাষভূমিতে পরিণত ক'রে গেল তাঁর এই সৃষ্টি। আর, তখন সেই-যে প্রেরণার কাজ শুরু হয়েছে, তার ধারা বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে সাহিত্যে নূতন নূতন প্রেরণা জাগিয়ে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি-ক্রিয়া রেখেছে অব্যাহত। আশ্চর্য এই যে, যে কালে ব'সে তিনি লিখেছেন, তখন কোথায় সেই মোগল-সম্রাটের হারেম, কোথায় বা সন্ন্যাসীদের রাষ্ট্রবিপ্লবের উদ্যম, আর, সাগর-সৈকতের নাটকীয় ঘটনাবর্তের সম্ভাবনাই বা কোথায়।

সেদিন চারিদিকে ছিল একটা শুষ্কতা, অকিঞ্চিৎকরতা, সেই শ্বাস-নিরোধী দুঃসহ অবস্থার মধ্যে থেকে পড়লেন তিনি স্কট প্রভৃতির উপন্যাস, তার ভিতর-কার নানা রকম বিচিত্র উদ্দীপনায় তাঁর মনে জাগল আনন্দ। যদি ইতিহাসের কথা বলো তো, ঐটুকুই ছিল আর কিন্তু ইতিহাসের কোনো প্রত্যক্ষ রূপ ছিল না। সেদিন তাঁর সামনে রাজপুত দাপাদাপি করেনি, সেদিন কেবল নির্জীব অলস এত রকম একঘেয়ে দিনযাত্রার প্রেরণা, তার থেকে বাঁচতে তিনি সন্ধান করে আনলেন বিদেশী নভেল থেকে এমন সব ঘটনা যা তাঁর দেশে নেই; চতুর্দিকে ইতিহাসের মধ্যে কোনো জায়গায় তারা স্থান পায়নি। সেদিন কেবল বঙ্কিমই তখনকার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার ভিতর দিয়ে এই সকল ঐতিহাসিক আখ্যানের রস অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তার আগে ছিল গোলেবকাওয়ালি, মৎস্য-নারীর উপাখ্যান, বিজয়-বসন্ত ইত্যাদি। কিন্তু এইখানেই এলেন একলা বঙ্কিম। সেদিন সমস্ত লেখক মণ্ডলীর মাঝখানে তিনি একলা এই রোমান্সের রস উপভোগ করেছিলেন এবং তার বিস্তার ক'রে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় আর-কেউ করেনি, এই একাকীত্বেই সাহিত্যের বিশেষত্ব এবং তার গৌরব। ঐতিহাসিকতার পরিবেষ্টনটাও গৌণ। হয়তো এই রোমান্সের ভূমিকা যে-স্কটের নভেলের মধ্যে ছিল, সে ছিল দাশুরায়ের নাগালের বাইরে। সে রোমান্সের ভিতর থেকে একটা নূতন আনন্দের দৃশ্য

দেখতে পাওয়া নিশ্চয়ই বিশেষ ইতিহাসের ধারা বেয়ে এসেছিল; কিন্তু সেটা সাহিত্যের মূল কথা নয়। মূল কথা আছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টিকর্তা আপনার একলা অনুভূতিতে আনন্দিত। তাই বঙ্কিমের সাহিত্য বঙ্কিমেরই। সেইখানেই তার সাহিত্যরূপ, আর যা-কিছু সমস্তই অবান্তর, যত তার গুরুত্ব থাক্ তবু তা অবান্তর। বঙ্কিম-সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে বঙ্কিমের আনন্দ। ফিউড্যালিজম প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্য হয়তো তাকে ইন্ধন যুগিয়েছে কিন্তু আগুন যোগায়নি। সেদিন সমস্ত বাঙালীর রসের যজ্ঞে ঘৃতাগ্নি এনেছিলেন বঙ্কিম, ইতিহাসের ইন্ধন অবলম্বন করে। সে অগ্নি আর-কারো, মন্ত্রে জাগত না,—এই ছিল তার সাহিত্যিক গৌরব।

কবি পরদিন সকালে, তাঁর নিজের জীবনের কয়েকটি বিশেষ উপলব্ধির কথা উল্লেখ ক'রে সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্বন্ধের কথাটি আরো পরিস্ফুট ক'রে বুঝিয়ে দুটি পত্র-প্রবন্ধ লিখে বুদ্ধদেববাবুর হাতে দেন। এখানে কবির সেই উপলব্ধির কথাগুলি প্রসঙ্গত বিশেষ স্থান-উপযোগী ও উপভোগের বিষয় হবে ব'লে, মোটামুটিভাবে তা এখানেও যোগ করে দিলাম। এ-প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পড়বার সময়েও এইস্থলে এসে কবি প্রসঙ্গত আবেকবার আমাকে তা বলেছিলেন। বিস্তারিত মূল লেখা-দুটি বেরোবে আশ্বিনের 'কবিতা' পত্রিকায়।

"আমার ভিতরে আমি পেয়েছি আরেক রসের তাগিদ। মনে পড়ে, সেদিনের শীতের সকালগুলি। দারুণ শীতে কাঁপতে-কাঁপতে বিরলবস্ত্র সেদিনের বালক রবি ঠাকুর দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াত বারান্দায় রেলিং ধ'রে; পুকুরের কোণে শিশির-ভেজা নারকেল পত্র-ঝালরের ফাঁকে-ফাঁকে জ্যোতির্ময় সূর্যোদয় দেখবার জন্য কী তার সেদিন অধীর আগ্রহ। প্রতিদিন ঘুম ভাঙতেই ভয় হত বুঝিবা সেই পরম মুহূর্তটি হাত-ছাড়া হয়ে ফস্কে যায়। সে বালকের পক্ষে তাতে কতটুকুই বা ক্ষতি। কিন্তু একদিনও কি তাকে ফাঁকি দিতে পারত সে-সূর্যোদয়। সে মনে করত সেদিনের সব বালকেরই এমনি বুঝি এক সাধারণ মনস্তত্ত্ব। সকলেই বুঝি সকাল হলে লেপ ফেলে শীতের কাঁপুনি গায় নিয়ে সূর্য দেখতে দৌড়য়। কিন্তু কৈ, একজনও বালক কিংবা বালিকা কি ছিল, এই ঔৎসুক্যে যাদের মন টানত। সেটা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তি-গত প্রেরণা। সেটাই আজ জানতে চাই তার পিছনে ঐতিহাসিকতা ছিল কোনখানে। সূর্যোদয় দেখে এখনো যে রস পাই, সেটা কোনো ঐতিহাসিক কারণে নয়, ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব থেকেই তার আনন্দের উৎস।

তারপরে আরো মনে পড়ে, সেই দিনটি, আকাশে মেঘ করেছে, তার দুকূল-প্লাবী শ্যামসমারোহ দেখে দেখে চোখ আর ফেরে না, ছবির পুঞ্জিত ভাব মনকে একেবারে ছেয়ে ফেললে। পৃথিবীর বাস্তবতা ছাড়িয়ে কোথায় সেদিন উধাও হোলো সমস্ত চেতনা সেই মেঘের সঙ্গে; সেদিন এই তন্ময়তা আর কারো ভিতরে লক্ষ্য করিনি। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মনের নিমজ্জন-উল্লাস,—কোন্ সমসাময়িক ঐতিহ্য এনে দিয়েছিল সেদিন এই অঘটনের প্রেরণা আমার ভিতরে, আমি তো আশেপাশের পরিমণ্ডলে তার সংক্রামতার কোনো সুদূর সম্ভাবনা সূত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি।

আর-একদিনের কথাও তার বিশিষ্টতায় উল্লেখযোগ্য। যেদিন দেখলুম একটা ধোবার গাধার বাচ্ছাকে গাভী সস্নেহে লেহন করছে, সে যা আনন্দ। অর্থাৎ জীবনের প্রতি জীবনের স্নিগ্ধ যে-আনন্দ দৃশ্য দেখেছিলুম, আজো তা ভুলতে পারিনি। আমার সমস্ত মনকে তা উৎসাহিত করেছিল। সেদিনকার এই দৃশ্য তুমি সমস্ত বালকদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করো, আর কেউ সে-আনন্দ পেতে পারে কি না। ব্যাপার কি না,—একটা গাধাকে একটা গাভী লেহন করছে। এ অনুভব কী আর-কোথাও থেকে কোনো কিছুর প্রভাবে সম্ভব হয়েছে? এ-ও সম্ভব করেছে কবির ব্যক্তিগত আনন্দ-উৎস। অর্থাৎ সেদিনকার কোনো বালক ইতিহাসের কোনো সূত্র নিয়ে এত আগ্রহের সঙ্গে এই আনন্দ-রস উপভোগ করেনি, এইটেই হচ্ছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রবীন্দ্রত্ব এবং সাহিত্যত্ব। এ সমস্তই সেদিনকার ইতিহাসের অতীত। রবীন্দ্রনাথের এই মনস্তত্ত্বের আশ্রয় সাধারণ মনস্তত্ত্বে সেদিন পাইনি।

যে সৃষ্টিকর্তা,—আপন একাকীত্বের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দে সে বিহ্বল হয়ে থাকে, সেখানে তার কোনো অংশীদার নেই, সে একক। বিধাতা যেমন একা তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে, কবি সেই রকম একা তার সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে। সেই একাকীত্বের বলেই তার প্রতিভা উজ্জ্বল।

আর্টিস্ট হলেন একা, ইতিহাস হোলো জনসংঘকে নিয়ে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে লোকে দেশোদ্ধারের কাজ করে। যেখানে লোক কর্মী, ইতি-হাসের আশ্রয় সেখানে তার অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরদিন একাই ছিলেন এবং আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে যথোপযুক্ত সঙ্গ দিতে পারেনি। 'সোনার তরী' একলা রবীন্দ্রনাথেরই কল্পতরী, তাতে যদি আরো পাঁচজনের মনের অংশ থাকত তাহলে তা নিয়ে

তাঁকে এতটা আক্রমণ সহ্য করতে হত না। কিন্তু সে-আক্রমণ ঠেলে রেখেই তিনি লিখে গিয়েছেন তাঁর কাব্য, এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর অন্তরগত প্রেরণাতে, কোনো ঐতিহাসিক কারণে নয়, সে-প্রেরণা লোকের উৎসাহ থেকে সংগ্রহ করে আনতে হয়নি। বাস্তবে যেটুকু অভাব মনে হয়েছে, নিজের মনের কল্পলোক থেকে তা পুরিয়ে নিয়ে কবি সৃষ্টি করে নিয়েছেন তাঁর নিজের জগৎ,—হয়তো সেটা দুদিন বাদে সকলেরই জগৎ হয়ে উঠেছে। শহরের অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে যে-দেখা, তা ঘ'টে ওঠেনি বটে, ঘটেনি তো ঘটেনি তা কী করব বলো, কিন্তু যখন যেখানে যেটুকু দেখবার সুযোগ হয়েছে, মন নিরলসভাবে তার থেকেই রস গ্রহণে ভ্রমরের মতো নিবদ্ধ হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি-প্রয়াসেও ছিল না তার শৈথিল্য। এই ক'রে লিখেছি তো অনেক, কিন্তু যা লিখেছি সেটা, এখনকার কালেরই হোক বা তখনকার কালেরই হোক, সে-লেখা শিল্পের সুচারু নৈপুণ্যে মনের থেকে অন্য মনে বেদনা সঞ্চার করেছে কিনা, তারই উপর নির্ভর করছে তার সাহিত্যে উত্তীর্ণতা। রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ নির্ভর করে শুধু প্রেরণার গভীরত্বেই নয়, তার শিল্প-সমৃদ্ধ প্রকাশ গৌরবেরও তা অপেক্ষা রাখে। নয় তো, অনেকেরই অনেক কিছু দেখা এবং লেখার জিনিস থাকে, অনেকে তা লেখেও, কিন্তু সকলের সব কথা মনোহারী হয় না, আর মন তা ধরেও রাখে না। আবার অনেকে আছেন যাঁদের তুচ্ছ কথাটিও রাঙিয়ে যায় মন এবং মনে তা হয় স্থায়ীভাবে মুদ্রিত। নিজ নিজ চিন্তাধারার সঙ্গে তার মিল না থাকলেও তার রসোপভোগে কারো ব্যাঘাত ঘটে না, সে নিজস্ব রসের এবং রূপের বিশিষ্ট আবেদনের জোরেই লোকের মন অধিকার করে নেয়। প্রকাশের গুণের উপর নির্ভর করে লোকের এই ভালো লাগা। সেখানেই তার শিল্পের কাজ। এই ভালো-লাগানোর কাজে সাহিত্যিক ব্যবহার করে কত কল্পনা, কত উপমা, কত আভাস-ইঙ্গিত, কত বলা এবং না বলা। এই ক'রে শিল্পের ইন্দ্রজাল-বিস্তারে ভালো লাগাতে পারলেন তো পারলেন, না হয় যিনি পারলেন না, কোনো কৈফিয়ত দিয়ে, সমসাময়িক সমস্যা বা কোনো মতবাদের ঢাক-পিটোবার দাবিতে সাহিত্যিকের আসনে তিনি স্থান নিতে পাববেন না কোনোকালেই, অথচ আজ দেখি সাহিত্যের রাজ্যে মত প্রচারের উদ্যমই হোলো মুখ্য, অবান্তর হয়ে উঠল, রসসৃষ্টির কথাটা, শেষে এও দেখতে হোলো সমাজ থেকে তাড়িত হয়ে সাহিত্যে এসে স্থান নিল অস্পৃশ্যতা। কে বুর্জোয়া,

কে সাম্যবাদী এই ব'লে লেখকের জাতবিচার চলছে, শুধু তার লেখার বিষয়বস্তু ধ'রেই নয়, বিচার চলছে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় খুঁটেখুঁটে। এখানে নিরস্ত থাকলেও ক্ষতি ছিল না, শঙ্কার বিষয় এই যে, জাতবিচারেরই যা অনিবার্য ফল,—সাহিত্যের আধুনিক রঘুনন্দনরা পাঁতি জারি করে নির্দেশ করেছেন লেখার পাংক্তেয় অপাংক্তেয়তা, সৃষ্টি করেছেন ছুঁয়াছুঁয়ির শুচিবাই। রসসৃষ্টির দিক থেকে যাই হোক না কেন, তাগিদ দেখছি, আজকের-লেখা সাহিত্যকে সর্বাগ্রে নিতে হবে বিশেষ ক'রে আজকের দিনেরই শ্রেণীবিশেষের সমস্যাব ছাপ। আর তার বর্ণনা হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যতই বিশদ ততই তা পাতে উঠবে আধুনিক এবং বাস্তব ব'লে,—তার হবে সাত খুন মাপ। সাহিত্যে সমাদরে গ্রাহ্য হবার সর্বপ্রথম ও প্রধান আবশ্যিক লক্ষণ হবে সমসাময়িকতার ছাপ,—এই মতবাদ চিন্তা-জগতের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে লোকের রসবোধকে এরা দিচ্ছে গুলিয়ে। লোকে ভুলে যাচ্ছে যে, সকলকালের রসোত্তীর্ণ সার্থক রচনামাত্রেই চির-কালের আদর্শ সাহিত্য, সমসাময়িক বিষয়াশ্রিত ব'লে তার কোনো বিশেষ দাবি খাটে না। তখনকার সমসাময়িক আধুনিক সমস্যাগুলির আশ্রয় না নিয়েও বঙ্কিম এককালে রহস্যময় সব ঘটনার সমাবেশে নিজের প্রেরণার কথাটি বলে গেছেন, তাতে যেখানে রসসৃষ্টি হয়েছে, সেখানেই তিনি একমাত্র সেই রসসৃষ্টির দুর্লভগুণেই চিরকাল বেঁচে থাকবেন রসিকজনের আদরের মধ্যে, তেমনি আজকের আধুনিক সংসারের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার রূপ যাঁদের মন অধিকার করেছে, তাঁদের সেই প্রেরণার বিষয়কে তাঁরা ভালো ক'রে রূপ দিন, যাতে মনে হবে; লেখক হাৎড়ে-পাৎড়ে মতের কথাটা যেমন-তেমনভাবে শুনিয়ে যাবার জন্য নয়, লিখেছেন তিনি এমনভাবে যেন ভূতাবিষ্টের মতো যন্ত্রমাত্র হয়ে তাঁর মনের কথাটা বেদনার তাগিদে না লিখে গিয়ে থাকতে পারেননি অথচ সে সহজে-নির্গলিত লেখার ভঙ্গীটি হয়ে চলেছে চিত্তচমৎকারী। একই কালে এই তন্ময়তা ও প্রকাশ-নৈপুণ্যে অপূর্বতার সংগতি ঘটানো দুরূহ। সে হচ্ছে ঐন্দ্রজালিকতা; রচনার এই ইন্দ্রজাল বিস্তার দুর্লভ শক্তির কাজ, সকলে তা পারেন না, যিনি পারেন তিনিই সাহিত্যিক কিংবা বলতে হয়, জন্মসাহিত্যিকরাই তা পারেন;—মনহরণ করবার মতো সেই সাহিত্যিক ঐন্দ্রজালিক ছোঁয়া থাকলে এঁদের এই সাম্প্রতিক বিষয়ক লেখাও চিরদিনই সাহিত্যে আদরণীয় হবে সন্দেহ নেই।

কিন্তু যেহেতু কেউ এ যুগে বসে লিখছেন সেহেতু এ যুগেরই সমস্যাক্রান্ত জীবন তাঁর লেখার বিষয়বস্তু রূপে তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে, না হলে লেখক গণ্য হবেন অনাধুনিক ব'লে, আর সে তথাকথিত অনাধুনিকতার অপবাদেই হবেন নাক সিঁটকোবার পাত্র, তাঁর রচনা হবে ঘৃণিত, এমন তো কোনো জবরদস্তি নেই। পক্ষান্তরে কারো যদি অন্যকালের অন্য কোনো বিষয় ভালো লেগেই থাকে এবং তার কথা যদি তিনি হৃদয়গ্রাহী করে বলতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই তা হবে বিদগ্ধ সমজদার-মণ্ডলীতে সম্পূর্ণ-মনেরই আদরের সামগ্রী। বরং তাঁকে তার সাধারণ প্রাপ্য থেকে একটু বেশি গৌরব দেওয়াও অত্যধিক হবে না এইজন্য যে, তিনি সাম্প্রতিকতার সুলভ পটভূমিতে শস্তা রঙের ছবি আঁকার লোভ এড়িয়ে দেখিয়েছেন সহজে নাম-কেনার মোহে সংযম।"

আরো অনেক বিষয় নিয়ে কবি সেদিন একটানা প্রায় তিন ঘণ্টা ব'লে গিয়েছিলেন তাঁর শরীরের অত অসুস্থতা সত্ত্বেও। মনে হোলো, কোপাইএর কথা, আজ সংকীর্ণ খাতে শীর্ণ ধারায় সে প্রবহমান, কিন্তু সময়-বিশেষে এই নদীই আবার দুর্বার বেগে কলনাদে বান ডাকিয়ে ছুটে যায় দিক্‌বিদিকে, পায় যখন সে বর্ষা মেঘের ডাক। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এখন এ-রকম দীর্ঘ-আলোচনা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এমন কি লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা-করাও তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থায় সমূহ ক্লান্তিজনক এবং তার ফল চিকিৎসার পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়ে ব'লে এ বিষয়ে ডাক্তারেরও নিষেধ আছে। এবারেও তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে সেই নিষেধের সার্থকতা বোঝা গেল।

সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে মাত্র মুখ্য বিষয়টি ধ'রে কয়েকটি কথা, যার একটু বিশদ আলোচনা সাহিত্য রসিকদের আগ্রহের বিষয় হতে পারে মনে হয়েছে, লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তার মোট কথা হচ্ছে এই,—সাহিত্য সৃষ্টি-ব্যাপারে আদিতে লেখকের মনে প্রেরণা-বীজ থাকাই অপরিহার্য, ঐতিহাসিকতার পটভূমি নয়। প্রেরণা যদি থাকে আর সমসাময়িক ইতিহাস যদি সে-প্রেরণার অনুকূল হয়, তবে তা থেকে সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, কিন্তু যদি সে-প্রেরণার রসতৃষ্ণা তাঁর কাল না মিটাতে পারে তবে তাঁর কালে লেখক একক হয়েও প্রবণতা-সংগত অসাময়িক বিষয়ে সাহিত্য রচনা করে থাকেন। এতে কাল হিসাবে তিনি তাঁর সমসাময়িক লেখকদের জগতে কোথাও বা আগে আগে চলেন, কোথাও চলেন পিছিয়ে, তাতে কিছু আসে

যায় না; লেখার কাজ রসসৃষ্টি, তাতে সার্থক হওয়াই হোলো মূল কথা—তা সে যে-বিষয়; যে-ভাষা, যে ভঙ্গী দিয়েই হোক না কেন। সে-ক্ষেত্রে সার্থকতা দেখিয়ে বঙ্কিম হয়েছেন সাহিত্য স্রষ্টা, কবি নিজেও তার নিদর্শনস্থল, এবং আজকেও বাংলাসাহিত্যে সে-দৃষ্টান্তের অভাব নেই,—সেদিনকার আলোচনার ভিতরকার এ কথা কয়েকটির সুস্পষ্টতা নিয়েই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

কবি লেখাটি দেখে প্রসঙ্গত আরো কয়টি কথা মুখে-মুখে তখনি ব'লে গেলেন ও বলতে গিয়ে বলার ধরনের জন্যই একই বিষয়ে অনেক সময়ে নূতন আলোকপাত ঘটে বা ক্ষেত্রবিশেষে কথার স্পষ্টতায় উজ্জ্বলতা বাড়ে, এজন্য সেদিনকার তাঁর মুখের অর্থ-ঘন কথাগুলি তাঁর ভাষাতেই টুকে নিয়ে এখানে তা বসিয়ে দেওয়া গেল। তিনি বলেছিলেন—

"সাহিত্য মানুষের দ্বিতীয় সত্তা। একটা বিধাতার সৃষ্টি, আর একটা তার নিজের সৃষ্টি। বিধাতার সৃষ্টি তার মনের মতো না হবার আশঙ্কা আছে। তার জন্যে সে বরাবর একটা তার মনের মতন দ্বিতীয় মানবলোক আপনার পরিমণ্ডলরূপে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে তুলছে। সাহিত্য তার সেই পরিমণ্ডল, তার সেই আত্মকৃত সৃষ্টি, তার দ্বিতীয় সত্তা। তার আপনার চেয়ে তার এই সৃষ্টির উপরে বেশি দরদ, বেশি শ্রদ্ধা। এর থেকে সমস্ত অসম্পূর্ণতা সমস্ত বিকার দূর ক'রে সে এ'কে সুসম্পূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা করছে। তার সেই স্বরচিত মানবলোক তার মহাকাব্যে তার মহানাট্যে।

যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু মহান সাহিত্যে তারি প্রকাশ,—তা ঠিক নয়। সুন্দর সে তো গৌণ। ভীমসেন সুন্দর না হতে পারেন কিন্তু তিনি বিরাট। নিজের সেই বিরাট রূপের প্রতিবিম্বে মানুষ তৃপ্ত হয়।

একটা কথা হচ্ছে এই, মানুষ পেয়েছে তার জীবনকে। তার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে তার মনকে। তাই মন কেবলি "মনের-মতোকে" আপনার জীবনের সঙ্গে যোজনা করতে চেয়েছে। তারি থেকে তৈরি হয়ে উঠেছে তার শিল্প, তার সাহিত্য।

কী তার মনের মতো তারি দ্বারা তার বিচার হয়। যা তার মনের মতো তা যদি বর্বর হয় তবে তার পরিচয় হয় অশ্রদ্ধেয়। কেবলি যদি তাতে থাকে শক্তির দম্ভ, কিন্তু না থাকে মহত্ত্বের প্রকাশ, তবে সেই সাহিত্যের স্রষ্টা মানবকে জানব সে শক্তির উপাসক, সে শক্তিকেই মহান ব'লে জানে। সেই পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে তার মনুষ্যত্বহীন পালোয়ানির রূপ দেখে দম্ভ

করতে থাকে, সে হয়ে ওঠে সাহিত্যের হিটলার, দয়া মায়া ক্ষমা বিবর্জিত। মানুষের বিকৃত রুচিও এই শ্রেণীভুক্ত। তাতে মানুষের কদর্য রূপই প্রকাশ পায়। মানুষের মধ্যে হয়তো অশ্লীলতা নিয়ে চোখ টেপাটেপি চলে সেই হিসেবে তাকে বলা যেতে পারে বাস্তব। কিন্তু তাই ব'লে সাহিত্যের সত্যের পঙ্‌ক্তিতে তাকে আসন দেওয়া অন্যায়, কেননা সাহিত্য মানুষের চারদিকে জ্যোতির্মণ্ডল রচনার ভার নিয়েছে—কলঙ্ক স্থাপন করতে নয়।"

২

প্রত্যক্ষ জগতের বাস্তবতা আর সাহিত্যের বাস্তবতা এক নয়—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। স্থূল বস্তু যার শুধু ইঙ্গিতই দিতে পেরেছে—সেই অদৃশ্য অ-ধর রসসত্তাকে জানবার এবং অব্যবহিত প্রত্যক্ষগোচর রূপে তাকে ধরে রাখবার আকর্ষণেই মানুষ ছুটেছে বস্তুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার উপরকার কল্পনা-রাজ্যে। কল্পনা থেকে আহরিত আশ্চর্যকে দিয়ে বস্তুর অসম্পূর্ণতাটুকু পূরণ করে নিয়েই সে হয়েছে পরিতৃপ্ত এবং সেই সম্পূর্ণতর সত্তাকেই সে জেনেছে সাহিত্যের খাঁটি বাস্তবতা বলে। সাহিত্যে যখন বাস্তবতার কথা ওঠে তখন সংসারের হুবহু বাস্তবকে সেখানে নিয়ে দাঁড় করালে চলবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক চোখ দেখেছিল একটি যাত্রার দলের ছন্নছাড়া ছেলেকে, দেখেছিল কলহপরায়ণা মুচি-বৌকে—তাদের প্রত্যক্ষ অবস্থা যতটা সহানুভূতির উদ্রেক করেছে, সেখানেই মন তৃপ্তি হয়নি, মন তাদেরকে ঘটনাস্রোতে ফেলে সম্ভবপর পরিণতির পথে ঠেলে নিয়ে ক্রমে বৃহত্তর বেদনার মধ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। তাদের সুখে-দুঃখে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে লেখক নিজ রচনায় তাদের মনের মতো রূপ দিয়ে মিটিয়েছেন নিজ রসতৃষ্ণা। বস্তুর এই মনের মতো পরম সত্তা আছে লেখকের কল্পনায়, আর বস্তুর এই মনের মতো রূপচিত্রই হচ্ছে সাহিত্যের বাস্তবতা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বস্তুটা হচ্ছে গৌণ, তাকে উপাদান হিসাবেই মাত্র গ্রহণীয়—তা সে এ-যুগের বা সে-যুগের যে-যুগেরই হোক, তা রাজারাজড়ার ব্যাপার হোক, দেব-দানবের যুদ্ধ হোক, কিংবা ভিখারীর দিন যাপনের কাহিনীই হোক। তা বলে ভিখারীদের কথা বলতে গিয়ে কেবল তার

নোংরামিটার বর্ণনাই রং চড়িয়ে-চড়িয়ে করে গেলে প্রাণ পাবে না সাহিত্যের ভিখারী। প্রাণ না দিতে পারলে কারো সহানুভূতিই জাগবে না তার উপরে, বরং তুঁষের মতো সে বিবরণী মুমূর্ষু মানুষটাকে আরো দেবে চাপা, তার মৃত্যুকে আরো আনবে ঘনিয়ে। আর ব্যাপার দাঁড়াবে এই যে, ঐ নোংরা আবেষ্টনটা, যা মানুষ মাত্রের, এমন কি ঐ ভিখারীদের মনে-মনেও নিজ বীভৎসতায় চিরদিন পীড়াই জন্মিয়ে এসেছে, এ ছাড়া যার অন্য কোনো সার্থকতাই নেই—সাহিত্যেও আর-একটা সেই আঁস্তাকুড় তাতে বাড়ানো হবে মাত্র। তার খুঁটিনাটি বর্ণনা পড়ে লোকের মন আরো-একবার বীভৎস রসের দুর্বিষহতায় ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়ে খুঁজবে একটা ফাঁকা জায়গা। কিন্তু আফসোস এই যে, যে ক্ষেত্রটি সত্যিসত্যিই বাস্তবের অসম্পূর্ণতা ও কুশ্রীতা থেকে হাঁফ ছাড়বার জন্যই মানুষের স্বপ্ন সাধ দিয়ে থাকে মনের মতো করে তৈরি-করা সেই সাহিত্যের ক্ষেত্রটিই এই করে হয়ে যায় যখন বীভৎসতার লীলাভূমি তখন আর লোকে নিঃশ্বাস ফেলবে কোথায়। অগত্যা মানুষ ক্রমে ক্রমে ঐ নিরুপায় ভিখারীদের মতোই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, নোংরা আবেষ্টনে পড়ে-পড়ে মরে-বাঁচাতেই হয়ে পড়ে অভ্যস্ত।

পঙ্কজকেই লোকে চায়—চায় না কেউ পঙ্ককে। তবু পঙ্কজের কথায় সময়ে সময়ে পঙ্কের কথাও এসে পড়ে বটে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও কেবল বিপরীত পরিবেষ্টনীতে অমন সুন্দর একটি জিনিসের সমাবেশে সৌন্দর্যের সঙ্গে বিস্ময়করতার যোগে পুষ্পসমাজে পঙ্কজের আপেক্ষিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসাবেই ঐ পঙ্কের কথা আলোচিত হয়, এবং তাও মাত্রা রেখেই। তেমনি মাত্রা রেখে, শুধু গৌণভাবেই নোংরামির কথা বর্ণনীয়। এক জায়গায় নোংরামির উপরেও ভিখারীরা মানুষ, সব মানুষের মতো প্রাণ-ঐশ্বর্যের সম্ভাবন বহন করেই তারাও যে এসেছিল পৃথিবীতে, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে বা ঘটনা-সংঘাতে তারা সেই দুর্লভ ধনের কাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য থেকে রইল আজীবন বঞ্চিত,—তাদের জীবন থেকে এক টুকরো ঘটনা বেছে নিয়ে চারদিক থেকে তার রহস্য ঘনিয়ে এনে শেষে একটি চরম মুহূর্ত সৃষ্টি করে দেখাতে হবে সেই বেদনার আভায় উদ্ভাসিত তাদেরও সম্ভাব্য একটুকরা মহনীয়তা—যা তারা হয়নি, কিন্তু হয়ত বা হতেও পারত; এই হয়ত-বা-হতেও-পারত মহত্ত্বটুকু হচ্ছে মানুষের উপর মানুষের বেদনার দানে বাস্তব অবস্থার অসম্পূর্ণতার উপর আরোপ করা বাকি ঐশ্বর্য,— এটুকু দিয়েই মানুষ সকল তুচ্ছকে করে নিয়েছে মহনীয়। তুচ্ছ কাবুলিওয়ালা

এই হতে পারত পিতৃত্বের বেদনা নিয়েই উজ্জ্বল, উজ্জ্বল সেই পোষ্টমাষ্টারটি, ছোট্ট তার নিম্নজাতীয়া পরিচারিকা বালিকাটির প্রতি বুকভরা মৌন সহানুভূতি নিয়ে; দীপ্তিময়ী সেই মুচি-বৌ, তার অভিমানের অনমনীয় দৃঢ়তায়। 'গল্পগুচ্ছ' তো এদের দীপ্তিতেই উজ্জ্বল, সব সার্থকতার উপরে তার এই সার্থকতার দাবি। বাস্তব সংসারের অসম্পূর্ণ বস্তুর এই মহান্ রূপ নিয়েই গড়ে উঠেছে চিরকালের বনেদি সাহিত্য, মানুষ নিজেকে দেখেছে তুচ্ছতা ছাড়িয়ে বিরাট করে, হুবহু তার তুচ্ছ রূপ আর অনুভূতির তীব্র তিক্ত সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জন্য তো চোখের উপরেই চলছে মানুষের বাস্তব সংসারের বাস্তব জীবন,—কিন্তু মূলে মানুষ স্বভাব থেকে অসীমের পিয়াসী, সে চায় বস্তুর বাঁধনহারা 'আরো-বিরাটত্বকে', এখানেই সে নেয় কল্পনার আশ্রয়, এখানেই তার সাহিত্য মিটায় মনের অবাস্তব ক্ষুধার উদ্দামতা—মিলায় তার মানস-মুক্তি।

তুচ্ছ মানুষকে তার নিম্নতার নোংরামির উপর এ-ভাবে ধরতে প্রথমেই যে-জিনিসটির প্রয়োজন—সে হচ্ছে মানুষের অপরিসীম দরদ। এই দরদ থাকলে, মানুষ কখনোই মানুষের নোংরামিকে মুখ্য করে এঁকে পেতে পারে না রসোপভোগের আনন্দ, তাতে তার নিজের মন থেকেই আসে বেদনার বাধা। সত্য যেটুকু বলতে হয়,—শুধু চরিত্র বা পরিস্থিতি ফোটাবার জন্য,—সে বলাটুকুর সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে প্রকাশ পায় তার সেই বেদনাই। যে-নোংরামির বর্ণনায় লেখকের এ বেদনা জড়িয়ে থাকে, সে-নোংরামি ছোঁয় গিয়ে মানুষের মহান্ চেতনা। কিন্তু শুধু অসাধারণ একটা নূতন কিছু বিষয় বা পরিস্থিতি দেখিয়ে নূতন কিছু মনস্তত্ত্বের বা সমাজতন্ত্রের সূত্র আবিষ্কারের অভূতপূর্ব উদ্যমে পাঠককে বিস্মিত করে দেবার আগ্রহে লোক যখন এই বস্তি-সাহিত্য লেখে, তখনই জাগে সে-লেখার সাহিত্যিক সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন। তাতে লাগে না সহানুভূতির স্পর্শ, এসে পড়ে ভিড়-করা অসংলগ্ন অবাছাই ঘটনার বিবৃতি, তা হয় রিপোর্টধর্মী, না হয় গবেষণা-পত্র। এ জন্য দেখা যায় দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণীদের কথা নিয়ে অজস্র বই বেরোলেও জাগে না তাতে দেশের মধ্যে নিম্নশ্রেণীদের জন্যে জীবনপণ-করে-কাজে-নামার কোনো উদ্দীপনা। পক্ষান্তরে, যেথানে আছে সহানুভূতি, সেখানে বস্তির বীভৎসতার চরম বর্ণনা পড়তে পড়তেই লোকের অশ্রু বাঁধন মানে না—এমন ব্যাপারও দেখা যায় "ইয়ামা দি পিট"-এ এবং "মাদার" বা "হাঙ্গার"এর মতো বই

জাগায় যে-বেদনা, তার থেকে সৃষ্টি হয় বিশ্বব্যাপী নির্যাতিতের মুক্তি অভিযান। "আঙ্কল টমস্ কেবিন" দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদে প্রেরণা জাগায়।

অবশ্য মানুষকে কাজে নামানো দিয়ে সাহিত্যের চরম পরীক্ষা নয়। সেটা তার প্রতিক্রিয়ার গৌণ ফল। চরম পরীক্ষা হল শিল্পচাতুর্যের সহিত বেদনার মনোজ্ঞ প্রকাশ দ্বারা চিত্তে একটি অপার্থিব আনন্দলোক সৃষ্টি করা নিয়ে। তাতে সার্থক হয়ে রচনা খাঁটি সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হলে পর দেখা যায় তার পাঠের ফলশ্রুতিই কর্মোদ্দীপনা জাগিয়ে লোককে নামায় কাজে, অর্থাৎ খাঁটি সাহিত্য কাজের প্রেরণা সঞ্চার করে, আর সে-প্রেরণা থেকে লোকে কাজ ক'রে বাস্তবকে দিতে চায় তার সাহিত্যে-পাওয়া মনের মতো আদর্শরূপ ; এই ক'রে পূর্বের বাস্তব বদলে গিয়ে সৃষ্টি হয় বস্তুজগতেরও নূতন বাস্তব। তাই,—"সাহিত্য গড়ে ইতিহাসকে," একথা নিতান্ত মিথ্যা নয় বলে, দেখা যাবে, শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাসই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাত্রেই তার নিজস্ব ধ্রুব-দৃষ্টিতে দেখতে পান যেই কাল, যেই দেশ, যেই পাত্রকে, তারা তাঁর সমসাময়িক হতেও পারে, নাও হতে পারে। বেশি ক্ষেত্রে না হয়েই থাকে। তাঁরা যা দেখেন তা হয়তো একশো বছর পরেই বাস্তব সংসারে কার্যতঃ ঘটে, তখন তা অন্য সকলের দৃষ্টি-গ্রাহ্য হয়, যেমন মনীষী টলষ্টয়ের দেখা এবং লেখা। আজ এই যে সমসাময়িক সাহিত্যে গণদেবতার পূজা নিয়ে এত গোঁড়ামি,—যে ভগীরথ এর আদি প্রেরণা-উৎস প্রবাহিত করিয়ে দেন প্রথম লোকচেতনায়,—সেই ঋষি টলষ্টয় সুদূর অতীতে যেদিন তাঁর নিজস্ব বেদনার মধ্যে বোধ করেছিলেন নিঃসহায় নির্যাতিত জনগণের মর্মন্তুদ দারিদ্র্যযাতনা, ধনী অভিজাতদের বিলাসিতা ও যথেচ্ছাচার, আর এসব কথা নিজের বেদনার তাগিদেই লিখে গিয়ে লেখার মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন একটি সুস্থ ন্যায়ানুগত আদর্শ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন বাণী, সেদিন কোথায় তাঁর চারিদিকে সেই গণবিপ্লবের সক্রিয় সংগ্রামাত্মক অবস্থা। তা তখনই তাঁর কালে জ্বলন্ত না থাক, কিন্তু তাঁর প্রেরণাই কি সেই বিপ্লবকে এগিয়ে আনবার কাজ করেনি ? সেই ঋষির বাণী কাজ করেছে দিনে দিনে তাঁর দেশে, জাগিয়ে তুলেছে সেখানে বিদ্রোহ, ক্রমে সেই বাণীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে ভাবীকালে, স্পষ্টতরভাবে, সাম্যবাদের দাবানল জ্বালিয়ে সে হল পৃথিবীব্যাপী। তিনি দেখেছিলেন শুধু দুর্দশা আর দুর্নীতি, সেটুকুই, তাঁর কালের ইতিহাসের দান। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন অভিজাত, জমিদার। জনগণের থেকে পৃথক পরিবেষ্টনীতে ছিল

তাঁর বংশগত সম্ভোগপুষ্ট আরামের সুখাসন। জীবনের বহুদিন সেই বিপরীত পরিবেষ্টনীতে থাকা সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত যে জিনিসটি তাঁকে লিখিয়েছে সেই দরদ বা বেদনাবোধটা তাঁর নিজের, সৃষ্টিটাও তাঁর নিজস্বই। তাঁর কালের বাস্তব অবস্থা তাঁকে পারেনি তৃপ্তি দিতে, তিনি গড়ে নিয়েছিলেন তাঁর মানসলোকে আর-এক বাস্তব, যেখানে রিসারেকশনের নায়ক নেক্লুডভ করে সাধনা —সকল বড় স্রষ্টাই গড়ে নেন বাস্তবে কল্পনায় মেশানো সেই অভিনব জগৎ। আমাদের বঙ্কিমও তাই গড়ে নিয়েছিলেন। তার পরে আজ আমরা সেই আনন্দ মঠের চেয়েও আরও বড়ো বিদ্রোহের আবহাওয়ার মধ্যে বিচরণ করে ভাবি,—এটা কেবল আমাদের কালেই হয়েছে সম্ভব,—এই সাম্প্রতিক প্রগতিশীল বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কাছে বঙ্কিম হয়েছেন আজকে অপেক্ষাকৃত অনাধুনিক, যেমন ভাবি অনাধুনিক সেই টলষ্টয়কেও। কিন্তু এই ধারণা নিয়ে তাঁদের মহিমা খর্ব হবে না, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যরস উপভোগ ও শিল্পাদর্শের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হব বরং আমরাই। আজকের সমসাময়িকতার ধুয়া নিয়ে ধোঁয়াটে অনেক বিকৃতরূপ নিকৃষ্ট কাঁচা লেখাও পাঠকের হাতে-হাতে ফিরছে। আর দেখা যাচ্ছে দেশে 'ক্লাসিক' লেখাগুলির প্রতি অবহেলা। নানা অপবাদে তারাই আজ অস্পৃশ্য। এর চেয়ে শোচনীয়তা আর কি হতে পারে। আধুনিক অনেক উগ্র এবং উৎকট চিন্তা বা মতবাদের চটক দুদিন পরে আপন নশ্বরতায় যাবে উবে কিন্তু অবিনশ্বর এই সাহিত্যের প্রেরণা যা চিরদিন গভীরতার বেদনায় আমাদের নূতন নূতন দৃষ্টি ও সৃষ্টির কাজে নব-নব উদ্যমের পথে প্রবর্তিত করতে পারে, দিতে পারে সাহিত্যের বিশুদ্ধ আনন্দ, তার সম্ভাবনাকে আমাদের জীবনে ব্যর্থ হতে দিলে হবে সমূহ ক্ষতি। আজ এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হয়ে ভাববার দিন এসেছে।

মোট কথা চাই সেই দরদ, যা তুচ্ছতার ভিতরেও দেখাবে মহীয়ানের সম্ভাবনা, আর তার সঙ্গে চাই সেই শিল্পবোধ যা সেই দরদকে প্রকাশ করবে হৃদয়গ্রাহী করে। এ দুয়ের যোগে লেখা হবে যে সাহিত্য, তা যদি আজকের দিনের তুচ্ছ অনুন্নতদের সংগ্রাম নিয়েই হয়, তাও লোকে, অবধারিত, আদর করে পড়বে। পড়বে শুধু আজকের বা কালকের নিম্নশ্রেণীর কথা বলে নয়, পড়বে লোকে সত্যিকার রসসৃষ্টিতে উত্তীর্ণ খাঁটি সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে— যেমন পড়ে তারা রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি দেশবিদেশের নিত্যকালীন কাহিনী।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমতগুলি একান্ত প্রণিধানযোগ্য—

"যে-সব সাহিত্য বনেদি তারা বহুকালের আর বহু মানুষের কানে কথা কয়েছে। তাদের কথা দিন-আনি-দিন-খাই তহবিলের ওজনে নয়। বনেদি সাহিত্যে সেই শোনবার কান তৈরি করে তোলে। যে-সমাজে অনেক পাঠকের সেই শোনবার কান তৈরি হয়েছে সে-সমাজে বড়ো ক'রে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়, কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যবসা সেখানে চলে না। সেখানকার বড়ো মহাজনদের কারবার আধা নিয়ে নয়, পুরো নিয়ে। তাদের 'আধা'র ব্যাপারী বলব না, সুতরাং জাহাজের খবর তাদের মেলে।...

"গল্প-বলার সর্বজনীন আদর্শটাই ফলাও ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে। সেই আদর্শটা খাটো হলেই নিমন্ত্রণটা ছোটো হয়—সেটা পারিবারিক ভোজ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের যে তীর্থে সকল দেশের যাত্রী এসে মেলে সে তীর্থের মহাভোজ হবে না।

"কিন্তু মানুষের কানের কাছে সর্বদাই যারা ভিড় করে থাকে, যাদের ফরমাশ সবচেয়ে চড়া গলায়, তাদের পাতে যোগান দেবার ভার নিতে গেলেই ঠকতে হবে; তারা গাল পাড়তে থাকলেও তাদের এড়িয়ে যাবার মতো মনের জোর থাকা চাই। যাদের চিত্ত অত্যন্ত ক্ষণকালবিহারী, যাদের উপস্থিত গরজের দাবি অত্যন্ত উগ্র, তাদেরই হট্টগোল সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। ...আবদারের প্রাবল্যকেই প্রামাণ্য মনে করার বিপদ আছে।

"যে লোকের অন্তরেই বিশ্বশ্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহানীরব যদি তাঁকে বরণমালা দেয় তাহলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তাহলে বাইরের নিত্য-মুখরকে তিনি দূর থেকে নমস্কার করে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।"

—সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৮৫-৮৬।

"সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই—সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।"

—সাহিত্যবিচার, সাহিত্যের পথে, পৃ ১০২।

"বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রস-সাহিত্যে।"

—সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, পৃ ২০৫।

"আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য প্রচার—মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়—তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।

"সংসারধর্মে মানবচরিত্রে সত্যের সেই-সব প্রকাশকে তাঁরা চিরকালের মূল্য দিয়েছেন যাকে তাঁরা সর্বকাল ও সর্বজনের কাছে ব্যক্ত করবার ও রক্ষা করবার যোগ্য মনে করেছেন। যার মধ্যে তাঁরা সৌন্দর্য দেখেছেন, মহিমা দেখেছেন, তাই তাঁদের রচনার আনন্দকে জাগিয়েছে।···আমাদের মনের ভিতর যে-সব বেদনা, যে-সব আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং যাকে আমরা অন্তরে অন্তরে খুব আদর করি, সেই আদরের যোগ্য ভাষা পাই না ব'লে বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, পূজা করতে পারি না, অর্ঘ্য দিতে পারি না। আমাদের সে সম্পদ নেই, আমরা মন্দির রচনা করতে জানি না, যাঁরা রচনা করেন ও যাঁরা দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন আমরা তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ ক'রে আমাদের পূজা সেখানে দিই। বড়ো বড়ো জাতি সাহিত্যে বড়ো বড়ো পূজার জন্যে আমাদের অবকাশ রচনা করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ সেখানে তাঁদের অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে।"

"···সমাজের পথযাত্রার পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই মনে তার জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই—তাকে সংসারযাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ মহৎ থাকে এবং এই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ যতক্ষণ লোকের কাছে মূল্য পায়—ততক্ষণ সে জাতির মধ্যে যতই দোষ থাক তার বিনাশ নেই।

"আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে।

আমাদের সমস্ত চিত্তকে ও শক্তিকে জাগরূক করে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তাহলেই আমরা বাঁচব। নইলে পদে পদে আমাদের পরাভব। আমাদের মজ্জার ভিতর জীর্ণতা; এইজন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে আমাদের যেটা তপস্যার দান সেটাকে যেন আমরা নষ্ট না করি, তপোভঙ্গ যেন আমাদের না হয়। মানবজীবনকে বড়ো করে দেখার শক্তি সব চাইতে বড়ো শক্তি। সেই শক্তিকে আমরা যেন রক্ষা করি।"

—সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্যের পথে, পৃ ২১৮-২২১।

"জলপাত্রের চরম কথাটা এই যে, তাতে ক'রে বেশ ভালো ক'রে জলসঞ্চয় বা জল পান করতে পারা চাই—সেই সঙ্গেই গৌণভাবে তাকে সুন্দর করা ভালো।"—২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত।

বি, ভা, প ৭ম বর্ষ ১৩৫৬ বৈ-আ পৃ ১৮৩।

ধর্ম-ধারণায়

১

রবীন্দ্রনাথের জীবনকে আজ নানাদিক থেকেই দেখবার ও জানবার চেষ্টা চলছে। সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র সবদিকেই আলো পড়ছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার দিকটা এখনো লোকের কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন। তাঁর ধর্মমত বা দার্শনিকতার আলোচনা যদি বা মেলে, ব্যবহার-জগতে সাধনা পরিচয় দুর্লভ। এদেশ ধ্যান-ধারণা, জপ-তপের দেশ—এখানে সাধারণের কাছে একজন মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা পান অনেকটা এই সব প্রক্রিয়ার ঐশ্বর্যে। কোন গুরুর নাম শুনলেই লোকের কৌতূহল জাগে আগে তাঁর তপস্যার দিকটাতেই। লোকে দেখে তাঁর বিভূতি, তাঁর শিষ্য-সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথও আখ্যা পেয়েছেন—'গুরুদেব'। কিন্তু বাস্তবিক তিনি জপতপ আদৌ কিছু করতেন কিনা, কিংবা কি সব করতেন, তার কথা বড়ো একটা জানার মধ্যে নেই। অথচ ভারতের একজন গুরু, সেই তপস্যাধারার কিছু চিহ্ন না নিয়ে কি ক'রে তিনি গুরুদেব হয়েছেন, সেই হচ্ছে কৌতূহলের বিষয়।

অবশ্য সাধনার কথা গুহ্য কথা। নিতান্ত অন্তরঙ্গ এবং উপযুক্ত ধারাবাহী ছাড়া এ সব বিষয়ে কথা কইবার অধিকারী যে-সে হতে পারে না। কিন্তু এদিকে এখনো তেমন কোনো আলোক-পাতের সহায়তা সাধারণ পায়নি। না পেয়েছে বরাবর তাঁর কাছ থেকে, না অন্য কারো থেকে। তাই এ প্রশ্ন কেবলি জাগে, 'গুরুদেবে'র গুরুত্ব কোথায়?

তাঁর মৃত্যুর মাসাধিক আগে, মধ্যাহ্নে স্নান সেরে গুরুদেব এসে উদয়নের একতলায় বসেছেন আহারের প্রতীক্ষায়, সে সময়কার পার্শ্বপরিচয় তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মশায়ও বসেছেন এক পাশে। তাঁর সঙ্গে কবির যখন-তখন অনেক কথাই হত, তা গভীর হালকা সব ভাবেরই। কথায়-কথায় সেদিন কবি তরল আলোচনা হিসাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি আস্তিক, না নাস্তিক"। উত্তরে সুধাকান্তবাবু বললেন, "আমি মশায়, আস্তিক এবং নাস্তিক মিশ্রিত জীব।" কবি বললেন—"সেটা কি রকম?" সুধাকান্তবাবু

বললেন—"আমার চিন্তায়, প্রচলিত ভূত ও ভগবান আমার কাছে উভয়ই সমান। ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেখানো হয়েছে, ভূতকে ভয় এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আমিও ভগবান কি, না জেনেই সকলের সঙ্গে মিশে সাকার-নিরাকার ভগবানকে গৌণভাবে নমস্কার জানাতাম এবং ভয় না পেয়েও শ্মশানে-মশানে ভূতের ছবি কল্পনা করতাম। অথচ এই উভয় বস্তুর সঙ্গেই কোনকালে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি"। ঈশ্বর-প্রসঙ্গে সুধাকান্ত-বাবু একটু অবিশ্বাস ও পরিহাসের ছলেই এই উক্তি করে ফেলেছিলেন। অমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাব-স্থৈর্য পরিহার করে আহত চিত্তের উগ্র প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন। সুধাকান্তবাবু কবির এই গম্ভীর ও গভীর উক্তিতে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক একটানা স্রোতে কবি এই বলেছিলেন—"ঈশ্বর আছেন, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মহাজন যাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, শ্রদ্ধায় তাঁদের কথা উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত; তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্যও অনেক বেশী। তাচ্ছিল্য করে তা ওড়াবার জিনিস নয়। স্খলিতভাবে নাস্তিকতার গর্ব করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক, তা অন্যায়ও বটে।" কবি ঈশ্বর-সাধক ছিলেন তাঁর গভীর সত্তা থেকে। এই ঈশ্বরের বোধ অবশ্য কালে কালে নানাভাবেই ক্রম-পরিণতি লাভ করেছে তাঁর জীবনে। শেষাবস্থায় এই ঈশ্বর তাঁর "মানুষের ধর্ম" নামক গ্রন্থে এবং কাব্যসমূহে ভক্তিরসের ব্যক্তিস্বরূপের চেয়ে জ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক আনন্দরূপেই যেন বেশী প্রতিভাত। মন্ত্র ছিল তাঁর ওঁ। পত্রে সে কথা আছে। আর একটি মন্ত্রও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল সেটি "শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।" "যাত্রী" গ্রন্থে লিখেছেন, "যে সত্য বিশ্বপ্রকৃতি, লোক-সমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ ক'রে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে "শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্" মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানিনে।" একটি মন্ত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন শেষদিকে, সেটি হচ্ছে—"সোহং"। আর এক স্থলে বলেছেন, "আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার-বার ধ্বনিত হয়েছে। এই সঙ্গেই আরও বলেছিলেন, "বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনও বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখছি, তা নিয়ে তর্ক কেন? স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্য, তার মৃত্যু নেই।" এই উক্তি থেকেই বুঝা যায়, বিশ্বের সকল বস্তুকে স্বীকার করে তার বস্তুরূপের আশ্রয়ে

যে রস-সত্তা তাকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভিতরে বাহিরে বস্তুতে ও অনুভূতিতে (বা রসে) বিশ্বের সমগ্রভাবের সেই উপলব্ধি দ্বারাই তিনি অমৃতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন।

দেখা যায়, একটি মূল প্রেরণা তাঁর আদর্শরূপে চিরদিনই তাঁকে ভিতর থেকে চালিয়েছে। সেই প্রেরণাটি তাঁর উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ সত্য, ধর্ম-কর্মের মূল, সে জিনিস তার—বিশ্বযোগ। এই যোগ-প্রেরণা তাঁর ভিতরে প্রথম অঙ্কুর মেলে শৈশবের উপনয়নের পর গায়ত্রী মন্ত্র থেকে। তিনি বলেছেন—"এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন, তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব : বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলেছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।"

ধর্ম প্রেরণার মূল রেখাপাত কবির এইখানে, একেই সাধন করেছেন সারা জীবন। প্রক্রিয়ার কথা পরে আসবে, এখানে মূল নির্ধারণের সঙ্গে আর একটি তথ্যের দিকে ইঙ্গিত করা যাচ্ছে যে, জীবন-আলো দর্শনের সাহায্যে এসে কবির ধর্মগুরুর কাজ করেছেন, একভাবে বলা যায় তাঁর পিতাই। কারণ তিনিই কবিকে বুঝিয়ে দেন এই গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্য, পিতারই সযত্ন তত্ত্বাবধানের শিক্ষা কবিকে নিয়ে যায় শৈশব থেকেই সংস্কৃত চর্চার পথে—ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং বিশেষ ক'রে উপনিষদের জ্যোতির্লোকে। কবির নিয়মিত উপাসনার অভ্যাসও ঐরূপে তাঁর পিতার নিকট থেকেই পাওয়া। শেষদিকে এ কাজটি কবি করতেন লোকের অগোচরে, অতি প্রত্যুষে। লোকে জেগে দেখত তিনি হাত-মুখ ধুয়ে দিনকর্মে প্রস্তুত। মধ্য জীবনে যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গড়ে তুলছেন, সে সময়ে এই উপাসনার কাজটি বাইরে একটু স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে অন্তরঙ্গ আশ্রমিকদের কাছে। তাঁদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, পূর্বপার্শ্বে মন্দির-সংলগ্ন যে ছোট্ট বারান্দাটি আছে; কিছুদিন প্রভাতী আলো-আঁধারে গুরুদেবকে দেখা যেত সেখানে, প্রশান্ত ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে সমাসীন। ঐ পর্বেই তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাষণ ধারার

সূত্রপাত। তা'ছাড়া, সচরাচর তাঁর বাসগৃহ দেহলী ভবনের দ্বিতলস্থিত সঙ্কীর্ণ খোলা ছাদটুকুতেই তাঁকে উক্ত অবস্থায় প্রতি উষায় আসীন দেখা গেছে। ভোরে উঠে এই উপাসনার অভ্যাসের কথা তাঁর দেশবিদেশের জীবন-প্রাসঙ্গিক অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়। সমাধিস্থ হলে যে ভাবতন্ময়তা আসে তার পরিচয় কোনও জপধ্যানের প্রক্রিয়া থেকে কবিজীবনে সুলভ নয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিশেষ-বিশেষ দৃশ্যে মন তাঁর এক-এক ক্ষেত্রে তেমনি অবস্থাই যে প্রাপ্ত হয়েছে, গদ্যে-পদ্যে তার উদাহরণ আছে বহু। সে অবস্থাকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দোপলব্ধির পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। জীবন স্মৃতিতে বর্ণিত শৈশবের সেই নারিকেল গাছের পত্রঝালরের ফাঁক দিয়ে দেখা সূর্যোদয় থেকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'প্রভাত উৎসব' কবিতা এবং শেষজীবনে সিঙ্কল পাহাড়ের সূর্যাস্ত থেকে 'পত্রপুট' কাব্যের প্রথম কবিতার প্রেরণা-দৃশ্যগুলি—এইরূপ দুর্লভ অপার্থিব আনন্দ সম্ভোগেরই অন্যতম সাক্ষ্য বহন করে। পদ্মাপারে জমিদারীতে কুঠির দোতলায় দাঁড়িয়ে নব বর্ষা-দিনের একটি উপলব্ধির কথার সঙ্গে, স্নানের ঘরে যাবার পথে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার থেকে আর একবার ঐরূপ ভাবাবেশের অবস্থা ঘটে বলে উল্লিখিত আছে। প্রভাত-সঙ্গীত পর্বের সূর্যোদয়ের থেকে যে অভিজ্ঞতা হয় সেইটিই কবির প্রথম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলে তিনি নিজেই বলেছেন,—"সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।" ধ্যান-প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান দেখা যায়নি সত্য, কিন্তু তার ফল তাঁর জীবনে ফলতে দেখা গেছে। চৈতন্যকে আয়ত্তে এনে অনেকবার কবি শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার হাত এড়িয়েছেন। জাহাজে চলবার সময় জানলার একটি পাটের চাপ পড়ে আঙ্গুল একবার থেঁৎলে যায়, সেই দুঃসহজ্বালার সময় মনকে পিষ্টস্থান থেকে সরিয়ে রেখে কেমন করে বেদনা ভুলেছিলেন, চিঠিতে তা লিখে গেছেন। অনেক শোক-দুঃখের মুহূর্তে অনুভূতিকে বশ করেছিলেন এই করে। 'চিঠিপত্র' জাতীয় বইয়ে তার অনেক সন্ধান মিলবে।

দেখা যেত সহজে এমনিতেই তিনি সোফায় বসে চোখ বুজে আছেন স্থিরভাবে, কোনও বিশেষ বাঁধা সময় করে নয়—যখন তখনই এবং কোনও বিশেষ আসন বা মুদ্রার আভাসও নেই। ধ্যান-ধারণার চেয়ে এই গভীর মননের প্রক্রিয়াই তাঁতে বেশী প্রকট ছিল।

মানব জীবনের পূর্ব ও পরলোক রয়েছে যবনিকার ও-পারে। ইহলোকের

মধ্যে যা আছে, সেই পঞ্চভূতের কারবারই তবু যা সাধারণের প্রত্যক্ষ। এই কারবারের তত্ত্ববিচার ও প্রণালী নিরূপণ নিয়েই বিজ্ঞান। দেখা যায়, কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানানুরাগী। তার এই অনুরাগের মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সর্বমানুষের যোগ-প্রেরণাই তাতে নিহিত। কবিতালোচিত অনুভবের রাজ্যটি তাঁর অপ্রত্যক্ষের, চিন্তাও তাঁর অনেকখানি অপ্রত্যক্ষকে নিয়ে। কিন্তু বিষয়কে যথাসম্ভব সকলের বুঝবার স্তরে এনে বলতে গিয়ে যোগ রেখেছেন বিজ্ঞানের। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাষণগুলির অনেক স্থলেই দেখা যাবে সাম্প্রতিক ঘটনা এবং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যর বহুল সমাবেশ। তাঁর গানে আছে—

"সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে"।

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

মন ছিল তাঁর লক্ষ কোটি প্রাণী অভিমুখী। সকলের সঙ্গে মেলা যায়, এমন একটি সহজ সাধারণ স্বাভাবিক যোগস্তর নিয়েই তিনি ছিলেন স্বধর্ম পালনে সক্রিয়। জ্ঞানকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই মানুষের সেই যোগভূমি হওয়ার কথা, যেখানে শিক্ষা উপলক্ষে জাতি বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সব মানুষ এসে মিলতে পারে একত্রে। পিতা মহর্ষিদেব গড়েছিলেন শান্তিনিকেতন। কবি কার্যত করলেন তাকেই জ্ঞাননিকেতন, কিন্তু সেটাই তাঁর কাছে তাঁর নিজের সাধনা-পীঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'আশ্রম' শব্দের যোগ, বিশেষ করে তাঁর ভারত-পথের ধর্মপ্রবণতাই সূচিত করে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, যে, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অগ্রজ মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন পরম ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাছাড়া, ঠাকুর-পরিবার একটি শাখা ধর্মের ধারাবাহী। প্রাচীন সংস্কৃতির পঠন ও অনুধ্যানের সঙ্গে কবির স্বীয় শিক্ষা জীবনের পরিমণ্ডলগত এই ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের ধর্মপ্রভাব ও পরিণত জীবনে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার বেলায় স্কুল-কলেজের স্থলে এই আশ্রম গড়াতে ভিতরে ভিতরে কিছু কাজ করে থাকবে। লোক-সমাজে তাঁর 'ঋষি' আখ্যার হেতু এই আশ্রমও যে কিছু না হয়ে আছে এমন নয়। সুতরাং ধর্মকেন্দ্রিক এই 'আশ্রম'-তত্ত্বটির তাৎপর্য বিশেষভাবে এখানে বুঝে নেওয়া দরকার।

স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষাধারায় প্রত্যক্ষ জগতের বস্তুজ্ঞানকেই মুখ্য

ধরা হয়। খেয়ে প'রে চলার ব্যবহারিক কাজ চালানোর কাজই সেই শিক্ষার প্রয়োগ, এবং তা সংসারে কাযকরীও বেশী, এ জন্য আদরও তার বেশী। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বাহ্যত জেনে রাখা হয় মাত্র। এই করে অপ্রত্যক্ষ জীবনাংশ সেখানে গৌণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ মিলিয়ে বৃহৎ করে সম-ভাবেই জীবনকে সত্য বলে দেখেছেন। প্রত্যক্ষের বাস্তব জগতেই পরিসমাপ্ত ভাবে জীবনকে খণ্ডরূপে দেখা হয়। অপ্রত্যক্ষ অসীম অনন্ত সম্ভাবনাময় জেনে তাকে সমগ্রভাবে এক বৃহৎ সভায় উপলব্ধি করা,—এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা। গোড়া থেকে তাই ঈশ্বর নামে এক বৃহৎ সত্তা বা বৃহৎ জীবনকেই করা হয়েছে মূল ভিত্তি। ঈশ্বর সম্পর্কীয় যে আচরণ, ব্যবহারিক ভাষায় তাই হ'ল ধর্ম। উপাসনা ইত্যাদি ঐ প্রকারের ধর্মকৃত্যাদি দ্বারা সেই বৃহৎ জীবন ধারারই অনুভব এই খণ্ড জীবনে বহন করা হয়। সেই অনুভবে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনকে নির্দিষ্ট প্রণালী মতে চিন্তায়, কথায় কাজে প্রতিদিন গড়ে তোলাই ছিল পুরাকালীন আশ্রমের শিক্ষা। বড়ো জীবনের সাধক রবীন্দ্রনাথ খণ্ড জীবনগুলিকে গড়ে তোলার সাধনায় সেই আশ্রমের প্রণালীতে আশ্রমেরই পত্তন করলেন। তাই ধর্মের সংযোগে জীবনের যাবতীয় শিক্ষালাভ গোড়া থেকেই হ'ল এখানকার উদ্দেশ্য। সে ধর্ম সাধুচিন্তা ও সদাচরণের মধ্যেই প্রধানত অনুষ্ঠিত হলেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ঈশ্বরের নিরাকার সত্তার উদার সাধনাশ্রয়ী। আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যা দু'বেলা এবং প্রতি বধুবার সকালে মন্দিরে সমবেত উপাসনায় ভগবৎ স্মরণ বা অধ্যাত্ম মননই এর আনুষ্ঠানিক অঙ্গ। বহিরঙ্গের হাত মুখ ধোয়ার সমান্তরাল অন্তর শুদ্ধির জন্যও এই উপাসনা বা মনন জীবনের মূল প্রেরণা-শক্তির উৎস হিসাবেই এখানে দিনচর্যারূপ অবশ্য কর্তব্যশৃঙ্খলার অন্তর্গত। বুধবার মন্দিরে উপাসনার পর উপদেশস্থলে আচার্য অনেক সময় স্বউক্ত ব্যাখ্যান দিয়ে ধর্ম-প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন।

উপাসনার অবশ্য কর্তব্যতা সম্বন্ধে ঐই উপলক্ষে কবির অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁর শিক্ষা ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক চিন্তার মহার্ঘ্য মূল্য দানই নির্দেশ করে। এ বিষয়ে যে তিনি কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন আর একটি কার্য তার পরিচায়ক। এই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই আবার এমন কোন ধর্মানুষ্ঠান কোনও আশ্রমবাসীকেই তিনি করতে দিতেন না, যা আশ্রমের সর্বধর্ম-সমন্বয়ী জীবনশৃঙ্খলার পরিপন্থী। এই নিয়ে কোন কোনও স্থলে তার কার্যে রূঢ়তারও

হয়ত কটাক্ষ আসবে। কিন্তু বিচারশীল দৃষ্টির কাছে সেই কটাক্ষপাতের বিষয়টিই স্বভাবকে তাঁর আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। কারণ তদ্দ্বারাই প্রতিভাত হবে যে, তিনি ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানের ধর্মের চেয়ে জাতি-ধর্মের গণ্ডী মুক্ত মানব-সমাজের বৃহত্তর যোগের সামগ্রিক জীবনকেই বড় বলে জানতেন, তা-ই নিয়েছিল তাঁর প্রথম পূজার আসন।

পিতৃ চরিত্রের আত্মস্থতার প্রভাব তাঁকে অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে সাহায্য করেছিল। উপনিষদের শিক্ষাও তাঁকে ভাব-ব্যাকুলতার স্থলে বীর্যবত্তাতেই মন স্থির রাখবার প্রেরণা যুগিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে—শান্তিনিকেতনে প্রতি বুধবার মন্দিরে গান ও উপাসনা হয়। দেশের অনেক অনুরূপ আরাধনায়, যেমন কীর্তনে ব্যাখ্যানে আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রবৃত্তি কতকটা শিথিল হতে পারে, এখানে তা হয় না। যা হয়, তাকে রাশভারি অবস্থাই বরং বলা চলে। শান্তিনিকেতন বাস কালে সমর্থাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রতি বুধবার মন্দিরে নিয়মিতভাবে আচার্যের কাজ করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, কখন কখন গানও করেছেন, তাতে উপলব্ধির আনন্দ জমেছে, উন্মাদনা জাগেনি। লোকের অন্তর্নিহিত বিবেকবুদ্ধিকেই তিনি সশ্রদ্ধ সম্মান দিয়ে তার বিচারের কাছেই নিজের মননটি যেন প্রাত্যহিক আলাপের ভাষায় স্থাপন করতেন, যোগ-প্রক্রিয়ার ঐশ্বর্য অবতারণায় আত্মমহিমা বৃদ্ধির সুযোগ নিতে চাননি। তাতে যেন তাঁর এক রকমের সঙ্কোচই ছিল। লোকে যেমন করে তাঁকে ভাবত, লোকের সেই 'গুরু' ভাবনাই ছিল তাঁর মনের পক্ষে গুরু পরিপাকের বিষয়। বার-বার বলেছেন—"আমি গুরু নই"। কিন্তু তবু তিনি গুরুদেবই রয়ে গেলেন। কোনরূপ ধর্মের ভেখ দ্বারা অন্যের বিবেকবুদ্ধির উপর সম্মোহ বিস্তারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাকে আশঙ্কার চোখে দেখতেন সর্বদাই; এজন্য কাউকে দীক্ষাদানে তাঁর মন ছিল না। নিজে গুরু হতে চাননি, কিন্তু তা বলে এই গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ছিল না তাঁর কোন কালেই। কালে কালে বিশ্বের যেখানেই যাঁরা গুরু বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন, তাঁদের সকলের সাধনা তিনি বুঝে উঠতে পারুন আর নাই পারুন, বিনয়নম্র নমস্কারে সকলকে তিনি ভক্তি জানিয়েছেন এবং সকলকে তেমনই ভক্তি জানাতে বলেছেন।

কবি কাজ করেছেন আমরণ, সে-কাজ সকল মানুষের মুক্তির জন্য সকলকে দিয়ে সকল মানুষের যোগের কাজ। য়ুরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের ধর্মের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ দুই ধারাকে এক করে মিলিয়ে তিনি ভিতরে বাইরে পূর্ণাঙ্গ

জীবনের সাধনা করেছেন তাঁর "বিশ্বভারতী"তে। এজন্যই আশ্রমের আবাসিক জীবনে আচরিত ধর্ম—এবং বিজ্ঞান মানে মোটের উপর ক্লাসের বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষা—দুই দিক দিয়েই বিশ্বভারতীর গুরুত্ব আছে; এবং তার আশ্রমিক জীবনেও যে এই দুই বিষয়েরই সমান গুরুত্ব আছে, এ কথাও মনে রাখা দরকার। ধর্ম ও নিছক শিক্ষা উভয়কেই কবি এখানে সামঞ্জস্যে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন। পাছে এই আশ্রম শুধুই পড়া দেওয়ার নেওয়ার একটা ক্লাস রুমের রুটিন বাঁধা স্কুল-কলেজ মাত্রে পর্যবসিত হয়, এই ভয়ে সর্বদাই ছিলেন তিনি শঙ্কিত। অনেকবার এই শঙ্কা থেকে আশ্রমের কোন কোন কর্মবিভাগ বর্জনেও তিনি উদ্যত হয়েছেন। আবার তেমনই ভাবনা ছিল, পাছে এই ধর্মের দেশে ধর্মোন্মাদনার প্রাবল্যে কোন দিন এটা একটা মঠ-মন্দির মোহান্তেরই জায়গা না হয়ে ওঠে।—মঠ-মন্দির বা ভগবানের নাম করে কোন একটা উপলক্ষে ঝুলি পাতলেই আর্থিক বনিয়াদের দিক দিয়ে বিশ্বভারতীর জন্য তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতেন, এই সম্ভাব্য সুযোগের কথা অনেকবারই তিনি কৃত্রিম আপসোসের সহিত পরিহাস করে বলতেন, তাতে তিনি টাকা পেতেন কিন্তু মানুষ পেতেন না। কিন্তু তাঁর সকল মানুষকেই যে পাওয়া চাই! বিশ্বমৈত্রীই যে তাঁব বড় সাধনা। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মিলিত বিশ্বই যে তাঁর কাছে অখণ্ড সত্তার ভগবান। জ্ঞানে তাঁর সামগ্রিক উপলব্ধি, কর্মে তাঁর নিবিড় সংযোগ। কোন আচারে বা প্রচারে কারু সঙ্গে মিত্রতা বাধা পেলে সে যে তাঁর সাধনারই বাধা।

সারা জীবনের সকল কাজই ভগবৎ কর্ম, কবি তাঁর জীবনে এইভাবেই সব কাজকে মর্যাদা দিয়ে দেখেছেন এবং তাই নিয়েই নিশ্চিন্তে নিয়ত সংসারের সকলের মধ্যে থেকে কর্মরত ছিলেন। জপতপের বিশেষ প্রক্রিয়া সেই মর্যাদাকে হীন করে বিশেষ পুণ্য গৌরবের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর জীবনে বা তাঁর আশ্রমে বিশেষ স্থান পায়নি। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, এ জীবনে কিছু হ'ল না, শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে সাংসারিকতায় জীবন ব্যর্থ গেল, পরম ধন পাওয়া গেল না —এ সব সুলভ নৈরাশ্যের দীন বাণী তাঁর শেষ দিনগুলিকে ক্লান্ত বা নিষ্প্রভ করেনি। এ পারেও তাঁর পাওয়া, ও পারেও। কোথাও হায়-আপসোস নেই। "সময় হয়েছে, খেলাঘরের এক কোঠা থেকে অন্য কোঠায় চলে চলে যাচ্ছি।" এই যেন তাঁর শেষের ভাবখানা। হয়তো প্রচলিত মতে তাঁকে সাধক বলতে বাধা ঠেকবে, তাঁর আনুষ্ঠানিক জপতপের অভাব দেখে—কিন্তু মানুষ হিসাবে

তাঁরই ভাষায় সেই "দুই হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছোঁবার" মতো বিশ্বদরদী মানুষও সচরাচর বোধ হয় এমন কমই মিলবে।

সবার বড়ো সংস্কার শিক্ষা। মানুষের জীবন গড়ে শিক্ষায়, জ্ঞান থেকে। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকেই তাঁর মুখ্য সাধনার বিষয় বলে বেছে নিয়েছেন গোড়া থেকেই। আর সেই শিক্ষার আচারে ও প্রচারে জীবনের প্রধান অংশই ব্যয়িত করছেন একনিষ্ঠায়। এক রকম বলতে গেলে, এই বিশ্বের জ্ঞানই নিয়েছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের স্থান, শিক্ষা ছিল সেই ঈশ্বরের সাধনা আর তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁর কাছে সেই ঈশ্বরের নিত্যনৈমিত্তিক পূজামন্দির। শিক্ষা শুধু বসে বসে পঠন-পাঠন নয়, তার বিষয়ে ও প্রণালী-বৈচিত্র্যে তা যেমন সুপ্রসন্ন, তেমনি দৈনন্দিন আহার-নিদ্রায় উৎসবে-ব্যসনে, ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত গণ্ডিতে মিশিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে সুষ্ঠু চেষ্টায় সে শিক্ষা পরম উপভোগ্য রূপে সত্তার পূর্ণতা বিকাশী। সেই শিক্ষার সাধনা তাঁকে শেষপর্যন্ত পূর্ণ আনন্দের মধ্যে নিয়ে গেছে, সে আনন্দও মুনিঋষির মুক্তির আনন্দের চেয়ে তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু কম নয়। প্রত্যক্ষত, বিশেষ করে শিক্ষাই যাঁর সাধন-প্রক্রিয়ার অন্যতম বিষয় ছিল, স্বভাবত শিক্ষিতদের মধ্যেই তিনি গুরুদেব হয়ে রয়েছেন। তিনি রসে মগ্ন ছিলেন, ঘর-সংসার, আত্মীয়স্বজন, নাচ-গান এবং মেয়েদের তাঁর জীবনে ও অনুষ্ঠানে সহজ স্থান দিয়ে। কবির একটি কথা এ সম্পর্কে স্মরণীয়, এক স্থলে তিনি বলেছেন,—"আনন্দকে সুন্দরকে নানা মূর্তিতে নানা উপলক্ষে প্রকাশ করা চাই···আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন সাধনায় জ্ঞান ও কর্মই যথেষ্ট। কিন্তু বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনি প্রাণ আসে। তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়, সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।" জ্ঞান কর্মের সঙ্গে কবির সাধনা সমভাবেই শেষপর্যন্ত উৎসবময়ী রসময়ী হয়ে ছিল ও আছে।

আর কোথাও নয়, মানুষেই চরমতত্ত্ব, এই মানুষের পৃথিবীতেই জ্ঞানে কর্মে অনুভবে মানুষের সঙ্গে মিলেই মুক্তি পাওয়া যাবে, এই বলে লোকান্তরের দেবদেবী স্বর্গ নরক ছেড়ে পৃথিবী ও মানুষের মর্যাদা এবং মানুষের উদার সর্বজনীন মিলনের আবশ্যকতাকে একান্ত করে ধরে পৃথিবীর মানুষেই দৃষ্টি

নিবদ্ধতা, এই লক্ষণেই রবীন্দ্র-সাধনা বিশ্ব-গুরুদের সাধনা-স্তরে বিশিষ্ট হয়ে থাকবে। আর কোনও ধারার সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক, নিজস্ব পথে ভাল-মন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাঁর লেখায়, তাঁর গানে, নৃত্যে, তাঁর উৎসবে, তাঁর সেবায়, তাঁর শিক্ষায়, ভ্রমণে, তাঁর আশ্রমে, গৃহধর্মে সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছে একটি সর্বাঙ্গীণ জীবন-যোগের ধারা। এই দেশে তো ধারা-বৈশিষ্ট্যের অন্ত নেই, শব-সাধক অঘোর-পন্থী, কাপালিক, আউল-বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, আবার ব্রহ্মজ্ঞানী, সনাতনী কত কি! বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধারা-প্রবর্তকদের প্রত্যেকেই যে পূর্ব শিক্ষা-দীক্ষা বা গুরুগৌরব পেয়েছেন তারই হুবহু ধারা টেনে তাঁরা গুরু হননি। নিজেরা প্রত্যেকেই এমন কিছু দিয়েছেন যে সাধন-প্রক্রিয়া বা বাণী বৈশিষ্ট্যে তাঁরা পূর্বাচার্যদের মহিমা ছাড়িয়েও উত্তুঙ্গ হিমালয়ের বিভিন্ন শিখরের মতো উত্তর কালে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশিষ্ট সত্তায়, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন গুরুর পরেও নূতন গুরু বলে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের সেই ধারার গুরুত্ব বরণে নিতান্ত সঙ্কোচে বার-বারই বলেছেন,—"আমি গুরু নই, আমি কবি। আমি বিচিত্রের দূত।" কিন্তু তাঁর কর্মে ও বাণীতে মিলিয়ে যে ব্যবহারিক জীবন তিনি রচনা করে রেখে গেছেন, এই দেশে তা যে একদিন গুরুর বিশিষ্টতায় তাঁকে দাঁড় করাতে পারে, সেই সম্ভাবনা তিনিও যে একবারে না দেখেছিলেন এমন নয়। এই বিষয়ে তাঁর 'গুরু'র স্বীকারের নিষেধ বাণীর পৌনঃপুনিক বহুল ব্যবহার এবং তীব্রতাই সেকথা আরো মনে করিয়ে দেয়। কাব্যের এলাকা ছেড়ে দিয়ে জীবনের এলাকায়ও রবীন্দ্রনাথের 'গুরু'ত্ব অস্বীকার করবার নয়। সে গুরুত্ব তাঁর সমন্বয় ধর্মে। জীবনের সর্বক্ষেত্রের সমন্বয় করে জীবন পরিচালনা এবং মানুষেরও সর্বশ্রেণীর সংযোগ-স্থাপন কায়মনোবাক্যের যোগ,—এই আদর্শ রেখে গেছেন তিনি বিরোধের জগতে। চারদিকেই তখন তাঁর মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের চরম। তাঁর কাছেও বাস্তবের অধিকারভেদ জনিত হাজার স্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব রয়েছে স্পষ্ট, কিন্তু তাহ'লেও জীবনের গোড়া থেকেই জেনে এসেছেন তিনি একত্বকেই।

স্বীয় ধর্মমত সম্বন্ধে প্রথম কবি মত প্রকাশ করেছেন "আমার ধর্ম" নামক প্রবন্ধটিতে। তার উপসংহারে গুছিয়ে নিয়ে যা বলেছেন, তাতে বিচিত্রের মধ্যে এক মহান্ সত্তাকে পূজার কথাই পাওয়া যায়। কবির ধর্ম-ধারণার ক্রম-বিকাশের আদি সূত্র হিসাবে রচনাটি মূল্যবান। তিনি তাতে বলেছিলেন, "আমার

রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর একদিকে অদ্বৈত ; একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন ; এক-দিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে ; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে ; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।" আজ ধর্মে জাতিতে রাষ্ট্রে মারামারি-কাটাকাটির পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই কেবল প্রশ্রয় প্রাপ্ত, সেটাই একমাত্র সত্য হয়ে উঠে কার্যকরী আর প্রলয়ঙ্করী হয়ে দাঁড়াল। মানবের একের মধ্যে বিচিত্রের সমন্বয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবনিষ্ঠ রবীন্দ্র-সাধনাদর্শ তাই আরও বিশেষ করে এ সময় অনুধ্যান ও আচরণের বিষয়। তাতে যোগের নূতন ইতিহাস রচিত হওয়ার বীজ আছে।

২

কি করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার সনাতন সূত্রটি পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মননে, ব্যাখ্যানে ও আচরণে চলেছিল তারি সন্ধান। সে সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ধর্মের তাত্ত্বিক কিংবা ব্যবহারিক দিকে নয়, পেয়েছিলেন অভিনব একটি দৃষ্টির সাহায্যে। "কালান্তর" গ্রন্থের ছোটো ও বড়ো প্রবন্ধে তিনি সেই দৃষ্টির প্রসঙ্গে বলেছেন,—"বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যাত্ম দৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালকদের পক্ষে দুর্বল বা কলুষিত না হয়, আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন উপহার দাবি করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই।"

জীবনের অপরাহ্ণে এসে "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও আর একবার রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলেছেন,—"বৃহৎ কালে মেলে দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই শিল্প সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকদের মন মেলবার দিকেই যায়।"—ইহাও সেই "ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যাত্ম দৃষ্টি"র কথা। এর মধ্যেই

বিশ্বমানবের মিলন-সাধন-সূত্রটির ইঙ্গিত মেলে। সেটি পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া দরকার।

গোটা মানব-সমাজের পথের বিবিধ পরীক্ষার কথা রয়েছে তার ইতিহাসে। এই ইতিহাসই তার সভ্যতার বাহন। মহাকালের বুকে সভ্যতারই জয়যাত্রা চলেছে। কালে কালে তাব সঙ্কটটা যত বড়ো, যত সাংঘাতিক, যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক, তবু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, সেটা সাময়িক। সেটা সূর্যগ্রহণ মাত্র, সূর্যশূন্যতা নয়।

স্বার্থের বাধায় বর্তমানের ক্ষুদ্র দেশকালে লোকে মিলতে পারে না। কিন্তু ইতিহাসের বিরাট পটভূমির দিকে তাকালে দেখতে পাই যে মানুষ মানুষের চিত্তে আত্মীয়তার আবেদন আনে দেশকাল অতিক্রম করে। এমন কি, মহাঅত্যাচারীও সেখানে ক্ষমার্হ হয়ে ওঠে।

মানুষের মিলনধর্মী মহান্ আত্মার দেখা পাই সকল ধর্মেই, তাঁদের উদার মিলন-বাণীরও অভাব নেই। কিন্তু কার্যতঃ বাণীর প্রভাব সফল করা নিয়েই যত সমস্যা। আচার বা নীতির চেয়ে মূল সত্যটিকে গ্রহণ করাই আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, এ চেষ্টা এ পর্যন্ত প্রায় সকল ধর্মব্যবস্থাতেই এসে দাঁড়িয়েছে বহু ছক্‌কাটা নীতির নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অভ্যাসে। রবীন্দ্রনাথের প্রক্রিয়া কিন্তু নীতিগত নয়, বলা যায় তা দৃষ্টিভঙ্গিগত। তা হচ্ছে অখণ্ড ইতিহাসকে বা চিরন্তন বাস্তবকে দেখা। কালোত্তীর্ণ মানবকীর্তির নিদর্শন—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্পদগুলি দেশকাল নির্বিশেষে মানুষের কি আকুল অনুভূতির বিষয়, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারে তা বিলক্ষণ দেখা গেছে। মানুষ ঘরোয়া নিত্য-ব্যবহার্য তুচ্ছ ঘটিবাটির গায়ে করেছে চিত্রালঙ্করণ। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্য ঐ সব শিল্পে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ তাতে দেখেছে একালের সঙ্গে স্মরণাতীত সুদূর সেকালের যোগ। তার মনের মধ্যে পেয়েছে কোন্ সেই অচেনা মানুষের অন্তর্বেদনার মিল, সুকুমার সমধর্মিতা। রাজ্য-সাম্রাজ্য তলিয়ে যায়, 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' হয়ে থাকে এই বেদনাই। বেদনাতেই মানুষ এক, এইটেই তার চিরন্তন আকুতি। যে সব কাজে এর প্রকাশ হয়ে চিরকাল মানুষকে আনন্দ দান করতে পারে, সেই সকল কাজের সাধনাই মানুষের যথার্থ ধর্মসাধনা।

রবীন্দ্রনাথ কথাগুলি বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে। রোগশয্যা থেকে উঠেছেন। উত্তরায়ণে পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীর শিল্পগৃহ "চিত্রভানু"তে

তখন তিনি বাস করছিলেন। সেই সময় তাঁর "বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছিল। প্রেস কপিতে তথ্য সংশোধনের সঙ্গে কোনও কোনও ফর্মার প্রুফও দেখে দিচ্ছিলেন তিনি নিজেই।

বইটির "সৌরজগৎ" অধ্যায়ের এক স্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে, সৌরমাণ্ডলিক গবেষণার একটি সংবাদের অপেক্ষায় ঠেকে গিয়েছিল বিজ্ঞানী ডাঃ ডগলাসের একটি সিদ্ধান্ত। "গ্রীনিচ মানযন্ত্র বিভাগ থেকে সংবাদ নিয়ে" সেই তথ্যটি জানা যায়। এই গবেষণার তথ্যটি সেবারে বইয়ে নূতন যোগ করা হয়। প্রুফের এই স্থলে এসে কবির সঙ্গে বর্তমান লেখকের একটু আলোচনা চলল। ডাঃ ডগলাসের সেই হারানো তথ্যের আবিষ্কর্তা কোথায় গেছে তলিয়ে, কিন্তু তাঁর সাধনার ফল চিরকালের জন্যে মানব-সমাজের উত্তরাধিকারের সম্পদ হয়ে রইল। আজ যিনি পরিচিত, সেই ডাঃ ডগলাসও হয়তো একদিন যাবেন তলিয়ে। কালে কালে এইভাবে নাম-হারানো কত ব্যক্তির সাধনা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছে নব-নব আবিষ্কারে, এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে পূর্ণতার পথে বিস্তৃততর করে। মানুষের সাধনা বিজ্ঞানে যত নৈর্ব্যক্তিক হয়ে থাকে; এমন যেন আর কিছুতে নয়!—এমনি ধরনের কথাই বলেছিলাম।

শুনে কবি বললেন, সাধনা মাত্রেরই বিশ্বরূপ আছে; মানুষের বিশ্বরূপও তার মধ্যে দিয়েই প্রকাশমান। দেশে, জাতিতে, বর্ণে, ধর্মে, আমরা আজ যে পৃথিবীব্যাপী স্বার্থসংঘর্ষের মধ্যে লোকের ক্ষুদ্র রূপ দেখছি এ তার ব্যক্তিগত সাময়িক রূপ। তার যা চিরন্তন রূপ, তার মহৎ প্রকাশ এরূপ নৈর্ব্যক্তিক বিকাশেই হয়েছে। বিজ্ঞানের মতো সব কাজেরই সেইরূপ বিকাশ দেখা যায় ইতিহাসের পটে। উক্ত বিজ্ঞানাচার্য সাহেবটির নিকটে তাঁর হারানো সূত্রটি প্রকাশ পেয়ে অকূলে তাঁকে সাহায্য দিয়ে আনন্দিত করেছিল। বিস্মৃত অতীত থেকে মহেঞ্জোদারোর অখ্যাত লোকেদের যে শিল্পনিদর্শনগুলি মিলল, সেগুলো মানুষকে তার মানব-ধারার উদ্বর্তন-ইতিহাসের তথ্যের সন্ধান দিয়ে তাকে করছে তেমনি অভিভূত। দান আছে, দাতা নেই, বোঝা যায়, সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র পেরিয়ে এক বিরাট অনন্ত অখণ্ড মানব-সাধনা চলেছে। এই ইতিহাসই তো মানুষের আসল স্বরূপ, যথার্থ সত্তার আধার,—তার সত্য পরিচয় এখানেই নিহিত।

কবি উজ্জ্বল মুখে বলে চলেছিলেন; হঠাৎ তাঁর কণ্ঠে বেদনার সুর বাজল,

তিনি বললেন, "কোথায় মানুষ তাকে দেখবার দৃষ্টি নিয়ে বড় হবে, তা নয়, ক্ষুদ্র দলাদলি চুলোচুলি নিয়েই সকলে ব্যস্ত। সব জাতির দান, সব দেশের দান, সব ব্যক্তির দানই একটি সংহত সমগ্ররূপে দেখা দিয়েছে এই মানব-সভ্যতার অভিযানের মধ্যে। নূতন নূতন কীর্তির যোগান দ্বারা এই সভ্যতার সেবায় লেগে থাকা, এবং এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষের হাতে সেই সভ্যতাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্রতই হচ্ছে মানুষের আসল কর্তব্য। স্বার্থের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে হলে এই অখণ্ড অপৌরুষের মানব-সভ্যতারই ধ্যান কবতে হবে, এই ধ্যানই নিয়ে যাবে তাকে পরার্থতায়।

আমরা দেহরক্তধারা-যোগে ঘরবাড়ী সম্পত্তিতে বা চিন্তাধারায় নিজের ছাপ এঁটে দিয়ে সব কিছুকে অক্ষয় করে রাখতে চাই। বেঁচে থেকে জীবিত-কালে এখনও যেমন ভোগ করব, আমি বেঁচে না থাকলেও আমার ছাপমারা কীর্তির মধ্যে আমি চিরকাল সেই গৌরবাধিকার নিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকব, এইটি দেখে যাবার, বুঝে নিয়ে যাবার জন্যই স্বার্থের ব্যাকুলতা। কিন্তু মহাকালের ধর্মে কি দেখছি? সে লোককে কেবলই সকল কিছু থেকে ছাড়িয়েই নেয়—কেড়ে নেয় তার কীতিকেও। মানুষের কাজগুলি যদি বা এই দেখা পৃথিবীতে দু'দিন স্থানও পায়, মহাকালের খেলার স্রোতের মুখে এই পৃথিবী, এই তার ইতিহাস— সব যায় ভেসে।"

আগে থেকেই কবির ভাবনায় ও লেখায় এই চিন্তারই প্রবাহ চলেছিল। "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন,—"পুরানো সভ্যতার মাটি-চাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্য মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অনুভব করেছে তারই দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরে ব্যবহারের সামগ্রীতে সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায়নি, বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন।"

চিত্রবহুল মহেঞ্জোদারোর বইগুলি কবির দপ্তরে আসার পর থেকে সেগুলির প্রভাব তাঁর অনেক রচনার উৎস হয়েছে। প্রায় একটা কাব্য—"শেষ-সপ্তক" সৃষ্টি হ'ল মহেঞ্জোদারোর প্রেরণা থেকে। তার পর থেকে অনেক কবিতায় এবং ভাষণেই এসে গেছে মহেঞ্জোদারোর সেই প্রভাবই। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মৃত্যুর ছ'মাস আগেকার ১৩৪৭ সনে প্রদত্ত ৭ই পৌষের সর্বশেষ ভাষণ—"আরোগ্য"। তাতে না-ধর্মী মানব-সাধনার পাশে নিজের বর্ণিত হাঁ-ধর্মী সাধনার আদর্শরূপে কবি ধরে দেখিয়েছেন চীনকে, আর প্রাগৈতিহাসিক আদর্শরূপে মহেঞ্জোদারো-শ্রেণীয় নামহীন অচেনা মানব-সাধনাকে। কবিকে জীবন-সায়াহ্নে ইতিহাস ও বিজ্ঞান—বাস্তব বিদ্যার এই দুই শাখাই—অধ্যাত্ম-উদ্দীপনায় বিশেষ সহায়তা করেছে। ইতিহাসের প্রেরণার কথা এখানে বলা হ'ল—এমনি খাঁটি বিজ্ঞানের প্রেরণা নিয়েও বলার কথা কবির জীবনে আছে। কবি বলেন, "যে সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ম-বুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।" 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,—"আজ বয়সের শেষ পর্বে মন অভিভূত নব্য প্রাকৃততত্ত্বে—বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে।"

বিশ্বভারতী পরিষদের ভাষণেও পূর্বে কবি বলেছেন,—"বৃহৎ কালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মম্ভরী পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ—কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে।" (১৩৩২)।

ইতিহাসও আজ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। বিশেষত মাটি খুঁড়ে ধাতু, জাতিতত্ত্ব বা ভাষার সূত্র ধরে পুরাতত্ত্বের সাহায্যে ইতিহাসের যে অংশ সক্রিয়, তাকে বিজ্ঞানের অঙ্গ বলেই ধরা যেতে পারে। মহেঞ্জোদারোর পুরাবিদ্যা ও শিল্পকলার ভিতর দিয়ে ভাবের ও ভাষার বিনিময় হচ্ছে একালে-সেকালে। দুই কালের আচার-বিচার ছাপিয়ে উঠেছে এই ভাষা। বিশ্ব-ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাভবনে' ও 'কলাভবনে' এই চিরকালের ভাষাকেই

করেছেন তাঁর সাংস্কৃতিক ধর্মের সাধনমন্ত্র। বিশ্বভারতীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ফুটেছে এই দুটি বিভাগে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে নিজেই একথা বলেছেন।

হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের থেকেই শীর্ষস্থানীয় রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরা শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেছেন কম। কিন্তু তারই মধ্যে কবির সমকালে 'বিদ্যাভবনে'র পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এবং মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মধ্যে যে প্রীতিভাব ও হৃদ্য আচরণ লক্ষ্য করা যেত, তা ছিল আদর্শ-স্থানীয়। দুই ধর্মের দু'জনের মধ্যে ছিল মানবিক প্রীতি। কবির আশ্রমের পরিবেশে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাতি-ধর্মের হাজার নীতি-বৈচিত্র্যের উপরেও তারি প্রভাব দুটি মানুষকে মিলিয়েছিল আপন ক'রে। স্বপাক ছাড়া যিনি আহার করেননি, এমন মহাপণ্ডিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টান পাদ্রী দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পদধূলি নিতেন। মেথরের মাল্য-জলও সেই ব্রাহ্মণের কাছে সমান প্রীতিতেই গ্রহণীয় হয়েছিল। এ ঘটনা শান্তিনিকেতনে সহজেই ঘটেছে। এখানে ধর্মের বাহন পূজা-অর্চনা নয়—মানবিক ব্যবহার। মত ছেড়ে ব্যক্তিগত জীবনেও যে বাস্তবতা কিরূপ কার্যকর হতে পারে, বিদ্যাভবনের কর্মক্ষেত্রে তার প্রমাণ এঁদের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক-পরিষৎ-সভার ১৩৩২ সনের অধিবেশনে "আচার্যের অভিভাষণে" বিশ্বভারতীর সাধনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন,—"মহা-জাতিক ঐক্য সম্বন্ধে দেশে বাক্যগত সঙ্কল্প প্রকাশ করা হয় কিন্তু ওদিকে জাতি-সঙ্ঘাত লেগেই আছে।" আকালী শিখ আন্দোলন ও মালাবারের মুসলমান মোপলা দৌরাত্মের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন—"যাদের আমরা নিবিড়ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনি তারা মহাজাতি হতে পারবে। সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি।" এ সাধনায় শাস্ত্রীমহাশয় কবির আদি সহায়ক ছিলেন। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন,—"একদা যে-দিন সুহৃদ্বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্বসম্প্রদায়ের বিদ্যা-গুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে সকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে

পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম এই ঔদার্য্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য এইটাই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়—সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক রোমকদের কাছে থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছ-গুরুদের ঋষিকল্প ব'লে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নাই। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জানতে হবে আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।"

জিয়াউদ্দিন সাহেবের মধ্যেও ধর্মের কোনো আড়ম্বর ছিল না। তিনি ছিলেন সহজ সাদাসিধে ভাবের, অথচ সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, নিরহঙ্কার লোক। তাঁর কাছে গেলে ধর্মের কোনো অনুষ্ঠানের কথা মনে হ'ত না, কিন্তু ধর্মের সার-রস যে প্রীতি ও আনন্দ –তাঁর সান্নিধ্যে তা পাওয়া যেত, অনুভব করা যেত সংস্কৃতির উজ্জ্বলতা। কবি যাদের সম্পর্কে বলেছেন, "ধর্ম-গণ্ডির বহির্বর্তী পরকে সে খুব তীব্রভাবেই পর ব'লে জানে কিন্তু সেই কাফেরকে বরাবরকার মত ঘরে টেনে আটক করতে পারলেই সে খুসী।" সেই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিমূলক প্রাণবান ধর্মপ্রেরণা পৌঁছেছিল এবং মানুষের মত মানুষ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আপন স্বভাবের মধুর স্পর্শ বিলিয়ে মৌলানা নিজ ধর্মের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

এই মৌলবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বন্ধুত্বের 'সম্বন্ধ' এ সম্বন্ধই মানব-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের প্রেরণাই—মানবধর্ম। এই ধর্মেরই বাণী "যিনি বেদনীয় সে পূর্ণ মানুষকে জানো ;—অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।"

কবির জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখি জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সারা জীবন ধরে চলেছে তাঁর বিচিত্র কর্মানুষ্ঠান। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডের চেয়ে জ্ঞানকেই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন; এখানে দেখা যাচ্ছে সব ছাড়িয়ে উঠেছে বেদনার কথা। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রেও কর্ম হচ্ছে জ্ঞান-অনুশীলনের স্তর মাত্র।

কবির আহ্বানে আশ্রমে আরও যাঁরা এসে মিলেছিলেন, ইংরেজ পিয়ার্সন এবং এণ্ডরুজ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু এঁরা সকলেই নিজ নিজ ধর্মে নিষ্ঠা-বান থেকেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মানুষের এক বেদনাবোধযুক্ত অখণ্ড মানবধর্মে।

চীনাভবন হিন্দীভবন প্রভৃতি গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রসাধনার বিস্তারের সঙ্গে। নানা সাধক ও শিল্পী বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে আসা-যাওয়া করেছেন;

রবীন্দ্রনাথের সাধনার মন্ত্র ও তার আয়োজন দেশ-দেশান্তর থেকে এঁদের যেমন আকর্ষণ করেছে, তেমনি এঁরাও আশ্রমের আদর্শকে নানাভাবে রূপায়িত করেছেন।

অবশেষে একটি অভিনব ব্যাপার দেখা গেল। প্রবন্ধের অন্যত্র ধর্মসাধনার উপায়স্বরূপ কবির যে ঐতিহাসিক যোগ-দৃষ্টির ইঙ্গিতের উল্লেখ করা হ'ল শান্তিনিকেতনে আজ ঠিক সেরূপ সাধনারই ধারা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠের সাধক স্বামী শঙ্করানন্দ শান্তিনিকেতনে চীনাভবনে সম্প্রতি গবেষক হয়ে এসে একটি কঠোর সাধনায় রত হয়েছেন। তাঁর সাধনার বিষয় হচ্ছে—মহেঞ্জোদারোর লিপি ও শিল্পকলার কাঠামোয় বিভিন্ন মানব-সভ্যতার মূলসূত্রের আবিষ্কার।

আরও একজন সংস্কৃতি সাধকের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি মহা-পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন—তিনি হিন্দীভবনে মাসেককাল মাত্র যাপন করেন। চীনাভবনেরই পক্ষে এক সন্ধ্যায় তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়ে-ছিলেন। দেশে দেশে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জাতি-বর্ণ-ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিল্প, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকৃতি-প্রকৃতি সবকিছুর মধ্য দিয়ে শাশ্বত এক মানব-ধর্ম পথ করে চলেছে; তার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাতে ইনিও নিরত। বলেছিলেন—রাশিয়াতে তিনি ভ্রমণ করছেন। ট্রেনের কামরায় দুঃসহ শীতের এক রাত্রি। ওদেশের এক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা পরস্পর কুলগত যোগের সন্ধান পেলেন। সুদূর দুই দেশের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দের মূল ধাতু সম্বন্ধে বিচারের দ্বারা ট্রেনে অবস্থিতির স্বল্পকালটুকুর মধ্যেই সে ঘনিষ্ঠতা আরও দানা বাঁধে। রাশিয়ার একটি মন্দির এবং মূর্তির কথাও রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছিলেন। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের আধুনিক গবেষণা-গ্রন্থ 'গোর্খবিজয়ে'র* মধ্যেও সেই মন্দিরের উল্লেখ সম্প্রতি চোখে পড়ল। গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখিত আছে: "অনুমান হয়, মহাজ্ঞান সাধকগণের তপঃপ্রভাব··· হিমালয়কেও অতিক্রম করিয়াছিল। প্রতিবেশী জাতিদেরও পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক।···ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া নাথ-যোগ আরব পারস্য এমন কি রাশিয়া পর্যন্ত এককালে বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা অনুসন্ধানের বিষয়।" পাদটীকায় আছে: "রাশিয়ার বাকুতে জ্বালামুখী দেবীর মন্দির শৈব

* শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল কৃত।

নাথযোগীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরগাত্রে খোদিত লিপি আছে।" নানা ক্ষেত্রে ঐক্যের এরূপ অনুসন্ধান যেমন বিদ্যাভবন চীনাভবন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলছে, কলাভবনেও শিল্পের বেদীতে মানবধর্মের সেই সন্ধান ও সৃষ্টির একই অর্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছে। আশ্রমের অন্যান্য বিভাগে পুরাকালীন সন্ধানের চেয়ে বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও সৃষ্টির তাগিদই বড়।

কবি তাঁর "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টিতে একটি বৌদ্ধ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তার তাৎপর্য হচ্ছে সংসারের সর্বজীব-কল্যাণ। সেই সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিজের বিশেষ কামনাটি যুক্ত করে বলেছেন,—"দুঃখ আসে ত আসুক, মৃত্যু হয়ত হউক, ক্ষতি ঘটে ত ঘটুক, মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হউক, সমুদ্র দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক—"সোঽহম্।"

বুদ্ধদেব যে সর্বজীব-কল্যাণ চেয়েছিলেন, কিভাবে তা সাধন করতে হবে, তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এই মর্মে বলেছিলেন,—'একপুত্রবতী মাতা যেমন করে নিজের পুত্রটিকে রক্ষা করে, সেই মমতা ও প্রযত্নে সকল জীবকে সেবা করতে হবে।' রবীন্দ্রনাথের অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হতে সমগ্র জগতের প্রতি আমরা সেই বেদনাটিরই প্রবাহ উৎসারিত দেখতে পাই।

মেয়েদের কাছে লেখা দু'একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বেদনা-অনুভূতি-প্রবণ মনটির পরিচয় মেলে। স্নেহ, সেবা, ধৈর্য দিয়ে মেয়েরা নিজের মনে বিশ্বমনকে অধিকার করবে, বহুকে এক ক'রে বাঁধবে এবং বহুর মধ্যে এক বিস্তৃত হয়ে অদ্বৈতের বিশিষ্ট রসটিকে নানা ভাবে আস্বাদন করবে—এই ভাবটিই তাঁর সেই পত্রগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে, সেটিই নামান্তরে তাঁর পরিণত জীবনের উপলব্ধ 'সোঽহম্' ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রায় মধ্য জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি এক-একখানি পত্রে এ সব অনুভূতির কথা লিখেছেন তাঁর পরিজনমণ্ডলীকে। কুঁড়ির মধ্য দিয়ে যেন বিকশিত হয়ে উঠেছে রসনির্ঝর মহীরুহের প্রাণসুধা। মহাবাক্য প্রাত্যহিক মানব-সম্বন্ধে অবলিপ্ত হয়ে তাত্ত্বিকতার শুষ্কতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কবি তখন বিলাতে। খুব সম্ভব ১৩১৮ সনই হবে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষক অজিত চক্রবর্তীর প্রথমা কন্যার সুমধুর লীলাময় শৈশব-বিষয়ে কবি পত্র পেয়েছেন এবং অজিতবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য দেবীকে তিনি তার যে উত্তর দিয়েছেন তাতে কবি মাতৃত্বের শিখাটিকে কোথায় তুলে ধরতে বলেছেন তা আছে পত্রের কয়টি পঙ্‌ক্তিতে।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

লাবণ্য, এবার আশ্রম থেকে কেবল তোমাদের দু'জনের চিঠি পেয়েছি। তোমার চিঠিতে অমিতার জীবনবৃত্তান্তের কতকটা আভাস পেয়ে খুব খুসি হলুম। তাকে দেখবার জন্যে আমার মনের মধ্যে খুব ঔৎসুক্য আছে। তার সঙ্গে পূর্বরাগের পালা আমি পূর্বেই শেষ করে এসেছি—এবার ফিরে গিয়ে রাগবৈচিত্র্য শুরু করতে হবে।

তোমার হৃদয় প্রদীপে যে মাতৃত্বের শিখাটি জ্বলে উঠেছে সেটি কেবল তোমার কন্যার মুখের উপর পড়লে চল্‌বে না—তাতে বিশ্বজননীর আরতি করতে হবে—যখন সকল ছেলের উপর এই আলো বিকীর্ণ করতে থাকবে তখনি সেই জননীর আরতি হবে।···আমরা নরনারী যে কেউ আশ্রমে এসে জুটেছি প্রত্যেকেই পূজার অর্ঘ্য নিজের জীবনে দিয়ে পূর্ণ করব এই সেবার ভারই আমাদের উপর আছে—কারো বা শতদল পদ্ম কারো বা পাঁচটি পাতার করবী। সেই অর্ঘ্যের থালা তোমাদের দ্বারের কাছে অপেক্ষা করছে—বেলা বয়ে যেন না যায়।

আশীর্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একখানি পত্র লিখেছিলেন এই লাবণ্য দেবীকেই। তখন কবি শিলাইদহে। পুত্র রথীন্দ্রনাথের পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সংসারে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিতা দেখতে চান, সেই পরম আকাঙ্ক্ষাটি জানিয়ে কবি পত্র লিখেছেন। কবির চিত্ত সকল সময়েই সকল বিষয়ে অসীমের দিকে অগ্রসর হয়ে আছে; এই কয়েকটি ছত্রে আমরা পাই তাঁর সংসারের কল্যাণময় এই অনুষ্ঠানটিকে কোন্ অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে। কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলের জন্যেই তাঁর মঙ্গল-কামনা চিরদিন এমনি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে:

ওঁ

শিলাইদা

নদীয়া

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। আমার সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হবে, আমি অনুভব করব তিনিই একে চালনা করছেন, তাঁরি

প্রসন্নতায় আমার গৃহ আলোকিত হয়ে থাকবে—সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে তাঁরি প্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বিনম্র সেবাপরতার কাছে ভোগসুখের ঔদ্ধত্য নত হয়ে রইবে এই আমি আশা ধরে আছি। তাঁকে মনে প্রাণে অত্যন্ত নিকটে উপলব্ধি না করলে শুচিতা থাকে না, শৈথিল্য এসে পড়ে, কথায় কথায় আত্মবিস্মৃতি ঘটে—সংসারের পবিত্রতা এবং শান্তি নষ্ট হয়। এইজন্য প্রতিদিনই তাঁকে পাবার সাধনা এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা চাই। মেয়েদের মনে ঈশ্বর যখন ভক্তিরসকে উৎসারিত করে দেন তখন যে মাধুর্য, যে শ্রী, যে সাধ্বীতার বিকাশ হয় প্রতিমার মধ্যে আমি সেইটি দেখব এই আমার মনের আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরের মধ্যে যে কল্যাণময় মাতৃভাব আছে, যা সংসারের সমস্ত কালিমা ধুয়ে দেয়, সমস্ত উপদ্রব সহ্য করে, সমস্ত ক্ষুধা মেটায়, দাহ জুড়ায়, অভাব দূর করে, যার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, যা সকলের উপরে থেকেও সকলের কাছে নত, যা সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েও সকলের শেষে আপনাকে স্থান দেয়, যার অভিমান নেই, ঔদ্ধত্য নেই, নিজের অধিকার নিয়ে অন্যের উপরে দাবি করতে চায় না, নিজের অধিকারকে খর্ব করেও অন্যের দাবি যে প্রসন্ন মুখে মিটিয়ে দেয়—বিশ্বমাতার সেই সুধাময় মাতৃত্বকে আমি বৌমার মধ্যে আমার ঘরে আবির্ভূত দেখব। এই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর যদি দয়া করেন তবে ধনে রত্নে নয় এই অমৃতেই আমার ঘব পূর্ণ হবে।···বৌমাকে ও মীরাকে আমার আশীর্বাদ দিয়ো।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই অমৃতত্বের সাধনা চলেছিল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ব্যেপে। কোনো বিষয়ই তা থেকে বাদ পড়েনি। তাই না তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন এমন একটি তত্ত্ব যা শুষ্কতা ত্যাগ করে এক পরম অধ্যাত্মলোকের সিংহদ্বার আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

৩

শান্তিনিকেতন আশ্রম। সান্ধ্যোপাসনার ঘণ্টা তখনো বাজেনি। চারদিক নিরালা, নিস্তব্ধ। আলো-ছায়ায় ঘোরালো মাধবীবিতানে ঢাকা তোরণতল। তারি আশে-পাশে ঘুরছেন ফিরছেন চারজন লোক। তোরণে মার্বেল-পাথরে উৎকীর্ণ আশ্রমের মন্ত্র ও নিয়মাবলী তাড়াতাড়ি পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। সহসা সামনে অন্য লোক দেখে তাঁরা মুখ ফেরালেন। আর কিছু তাঁদের দেখা হ'ল না। তাঁরা ফিরে চলেছেন, আমি পাশ কাটিয়ে আগে আগে চললাম। ক্ষুদ্র দলটির অগ্রণী একজন যুবক, সঙ্গে একটি নবীনা বধূ, একটি বালক ও একটি বালিকা। মনে হয় সাধারণ শ্রেণীর। কাছের শহরের বা গ্রামের লোক। যুবকটি বোঝাচ্ছিলেন আশ্রমের ধর্ম। বলে চলেছিলেন—রবীন্দ্রঠাকুর বড় কবি, আর খুব জ্ঞানী। এখানকার গুরু ছিলেন। বড়লোক, মানে—খুব হাইক্লাস লোক ছিলেন তিনি। ওঁরা ব্রাহ্ম, এখানে হ'ল নির্গুণের উপাসনা, তাঁদের মন্ত্র হ'ল ওম্, ওঁকার; মূর্তি-টূর্তি নেই, পূজো আর্চা হয় না। বধূটি বাধা দিয়ে বললেন, সে কি রকম? যুবক বললেন, শব্দ ব্রহ্ম; আমাদেব দেশেরই যেটা হাইক্লাস শাস্ত্রকথা,—মানে, সব চেয়ে উচ্চ জ্ঞান, সেটাই হ'ল গিয়ে ওঁদের সাধনা কিনা! কবিই এ সব করে গেছেন, ভেদবুদ্ধির বালাই ছিল না, লোককে খুব ভালবাসতেন। কথার মধ্যে মধ্যে বেগ লাগছিল, মাঝে মাঝে চেপে যাওয়ার ভাবটাও ছিল। বোধ হয় অন্য লোকের সান্নিধ্য ছিল তাঁর ইতস্তত করার কারণ। চৌমাথায় এসে পড়া গেল। যুবকটি বললেন, ঘোর হয়ে গেছে যে, কখন ঘর পৌঁছব, চল চল পা চালিয়ে। বোলপুরের পথে তাঁরা চলে গেলেন। ভাবতে ভাবতে ফিরলাম, তাই তো, মোটামুটি এঁরা তা হ'লে তো মন্দ বোঝেন না। মূর্তি কেউ মানে না, পূজা করে না,—এ অশ্রদ্ধার কথা নয়, আপত্তির কথা হতে পারে। ঐ কারণেই এঁরা কবিকে ও তাঁর আশ্রমকে একটু পর করেই দেখেন। তাতেও হয়তো তত বাধত না,—তার উপর নানা সমাজে নানা দেশীয় লোকের আনাগোনা, খানাপিনা! এত অবাধ মেলামেশা কেন? আচার-বিচার নেই, ধর্মের এ কোন্ কারখানা!—কোথাও তো এমন দেখা যায় না! এটা দেশেরও নয়, বিদেশেরও নয়,—কেমন যেন খাপছাড়া!

দেখা গেল, সাধারণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা এখনো সহজ হয়ে ওঠেনি। একটা স্থলে বিশেষ করেই আটকাচ্ছে, সে তাঁর আচারের ক্ষেত্রে। আচারের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন একটি গণ্ডিতে বাঁধা পড়েননি, একথা ঠিক. কিন্তু কেন বাঁধা পড়েননি, সে মর্মানুধাবন ক'রে দেখলে সাধারণের মনোগত দূরত্ব অনেকটা দূর হতে পারে।

আশ্রমদর্শনার্থী এই সব আগন্তুকের মত অনেক লোকেই জানেন কবি ব্রাহ্ম। শান্তিনিকেতন হ'ল ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠান, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাস্থল। সেখানে প্রতিমা-পূজা তাই প্রতিষ্ঠা না পাওয়ারই কথা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধের দিক থেকেই যে এরূপ ঘটছে, একথা ভাববার আগে আরো কতগুলি বিষয় এ সম্বন্ধে ভাববার আছে।

প্রতিমা-পূজকেরা ব্রহ্মকে মানেন। প্রতিমা-পূজার রীতি শান্তিনিকেতনে না থাকতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনা তো সেখানে বিহিত আছে। সেটি প্রতিমার পূজক বা অপূজক কারোরই বিরুদ্ধ নয়; সকলেরই তাতে যোগ দেবার আহ্বান আছে, আর তার আয়োজন এমনিই যে, সকলেই তাতে যোগ দিতেও পারেন। বর্ধমানের বৈষ্ণব-চূড়ামণি নীলকণ্ঠ শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের উৎসবে যাত্রাগান করতে এসে রবীন্দ্রনাথের উপাসনায় যোগদান করে গলদশ্রু হতেন। বহু দেশ হতে আগত খ্রীষ্টীয় সাধকেরা এখানকার সাধনায় মুগ্ধ হয়ে আত্মনিবেদন করেছেন, আশ্রমের সেবা করে গেছেন, কোন প্রতিদান চাননি।

শান্তিনিকেতন আদিতে ছিল একেশ্বরবাদীদের নিভৃত সাধনস্থল। কবি এখানে তাঁর আসন পাতলেন, মানব-কল্যাণকর সকল প্রকার সাধনার সমাবেশ হ'ল: কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, আশ্রম হ'ল সর্বজনের একটি তীর্থস্থল। যেমন হ'ল সে সমাজ-চেতনায় বৃহত্তর, তেমনি এল তার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দায়িত্ব। অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে লাগল।

দেখা গেল, জীবনের প্রান্তে এসে তাঁর "নরদেবতা" প্রবন্ধে (১৩৩৮ আশ্বিন, প্রবাসী) দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ক'রে কবি এই লিখলেন যে, "সমাজে আর একটি বাহ্যিকতা আছে তারও আতিশয্যে বিপদ। সে হচ্ছে আচার। প্রেমে সত্যের উপলব্ধি পূর্ণ হয় তাই মিলন সেখানেই, শান্তি সেখানে। আচার সত্যের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠে, সর্বব্যাপী যে ভগবান সর্বগত শিব তাঁকে অতিক্রম ক'রে নিজেকে দাম্ভিকতার সঙ্গে প্রচার করে, সমাজেরই দোহাই দিয়ে

সমাজের নিত্যধর্মকে খর্ব করতে থাকে। তখন আচারীতে আচারীতে সর্বনাশ বাধে।

"বিষয়ের অভিমান যেমন, আচারের অভিমানও তেমনি। বৈষয়িকতা সর্বজনীনতার বিরুদ্ধ, আচারিকতাও তাই। আচার সাম্প্রদায়িক অহংবুদ্ধিকে প্রবল করে, এই অহং-এর তাপ ব্যক্তিগত অহং-এর চেয়ে বেশি বই কম নয়। এ কথা মনে রাখা চাই যে, সেই সকল প্রবৃত্তিতে আমরা পরস্পরকে নিষ্ঠুর করে মারি, যারা বিশ্বমানবের বোধকে বাধা দেয়। সাধারণত ধর্মে সমাজে, রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বাধা পদে পদে।"

নানা কোণ থেকে এইরূপ বাধা তাঁর বৃহৎ সামাজিক 'বিশ্বনীড়'কে পাছে পদে পদে ব্যাহত করে, সেইজন্যে ছিল তাঁর সতর্কতা। প্রয়োজনস্থলে এই সতর্কতার চেষ্টায় তিনি কঠোরও হতে পারতেন। সর্বমানবের যেখানে যোগ ঘটেছে, সেখানে সর্বজনস্বীকৃতিযোগ্য ব্যবহারই আচরণীয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা, বা উপলব্ধির পৃথক বিষয় যদি বা কিছু থাকে, তা নিয়ে এমন কিছু দৈব তাৎপর্যের দুর্লঙ্ঘ্য ও দুর্জ্ঞেয় ঘের দেওয়া চলে না, যা মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়, মানুষের মহিমা মানুষের কাছে ক্ষুণ্ন করে। তা করলেই দেখা দেয় জড়বাদ। একদা আদি ব্রাহ্মসমাজেও কেবল ব্রাহ্মণেরই উপাসনা-পরিচালনার অধিকার ছিল। কবি তাঁর কালে সে বিধি তুলে দেন। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে যোগ্য-ব্যক্তি মাত্রকেই তিনি আচার্যত্বে বরণ করে নেন। (দ্রঃ প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ, মাসিক বসুমতী ১৩৫৮ জ্যৈষ্ঠ) সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের আচারকেই যে তিনি যথাপূর্ব অনুসরণ করেছেন, তা নয় তাকে আর সকলের উপরে চাপানোর মত কোন সাম্প্রদায়িক প্রবর্তন বিধানের তো দূরের কথা।

আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া মানুষ নেই। কম আর বেশী। মুখ্যতঃ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-সংস্কৃতি আপন প্রকাশ খোঁজে। পৃথক পৃথক প্রশস্ত কোঠায় আচার-অনুষ্ঠান যত বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেতে পারে, সর্বজনের মিলনের স্থলে তা হয় না। আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষার গোঁড়ামিই মিলনের বাধা হয়ে পড়ে। কিন্তু এই কারণগুলি যাতে উদ্ভূত না হয়, কবি সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন।

আচার-অনুষ্ঠান বাইরের দিক। কিন্তু তাই তো সব নয়,—ভিতরের কোন্ মহৎ উপলব্ধি বাইরে তাঁকে আচারে এমন সরল ও সমন্বয়ী করে তুললে,

সেটি জানাই বড় কথা। কেবল 'হাই-ক্লাস' জ্ঞান, ওঙ্কার, নির্গুণের উপাসনা, শব্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি গুটিকয় কথা জানলে বা বললে ভিতরের বা বাইরের বাধা দূর হবার নয়। তা অমনি থেকে যাবে,—লোকে সম্ভ্রম বা ভ্রমের বাহুল্যে ঐরূপ দেখে শুনে ভাসাভাসা দু-চার কথা বলাবলি করবে মাত্র। তার চেয়ে ভিতরে বাইরে মিলিয়ে ভাবে ও কর্মে কবির উপলব্ধির সত্যবস্তুটিকে সুসঙ্গতরূপে দেখতে পেলে তবেই যথার্থ শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী হওয়া যেতে পারে। তিনি যে ভাবধারা অবলম্বন করেছিলেন তার মূল উপনিষদের মধ্যে নিবদ্ধ। সুতরাং দেশের সাধারণের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর যোগ নাড়ীর যোগ বললে অত্যুক্তি হবে না।

কবিকে তাঁর ভিতর থেকে সম্যক্‌ভাবে জানতে হলে, তাঁর আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিচারধারার সঙ্গেও স্বল্প-বিস্তর পরিচয় থাকা দরকার।

"সঞ্চয়" নামক দার্শনিক বিচারপূর্ণ গ্রন্থের "রূপ ও অরূপ" প্রবন্ধে কবি বলছেন,—"আধ্যাত্মিক সাধনা কখনই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে।....সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছে আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনও মতে উজান পথে চলিতে পারে না।"

উদাহরণ দিয়েও তিনি এ সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে আরও বলছেন, "সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটি মাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না···এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনও একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশু-শালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা সিংহ মায়ের বাহন। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য

বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনও এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।”

রূপ-সাধনার সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে পরবর্তীকালের ‘নরদেবতা’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “জাগতিক ক্রিয়া যে ইচ্ছার চালনায় ঘটে বলে মানুষ স্থির করেছে তাকে নিজের আনুকূল্যে আনবার বিবিধ প্রক্রিয়ায় মানুষের পূজা আরম্ভ। জগতের শক্তিকে নিজের শক্তির সহায় করবার এই সাধনাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রথম সোপান বলে ধরা যেতে পারে।”

কিন্তু কবি এর পরেই বিচারধারায় এসে পৌঁছেছেন অরূপের সাধনতত্ত্বে। বলছেন,—“মানুষের এই প্রত্যয় জন্মেছে বাস্তব বলে যা-কিছু সে দেখছে জানছে সেই দেখা-জানার মধ্যেই তা চরম নয়, এমন কিছুকে সে আশ্রয় করে আছে যা দেখা-জানার মূলে। মানুষ নিজেকে যদি একান্ত বাইরে থেকেই দেখে তবে দেখতে পাবে পরে-পরে কতকগুলি কর্ম ও ছবি। মানুষ পদার্থের বাস্তব প্রমাণ এর বেশী আর কিছু নেই। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম ও ছবির চেয়েও নিঃসংশয় ও অব্যবহিতভাবে এমন একটি সত্যকে সে জানে, যে সত্য তার সমস্ত কর্মকে ও প্রত্যক্ষ প্রকাশকে সম্বন্ধযুক্ত করে এক করে তুলেছে। এই হচ্ছে তার আত্মোপলব্ধি।”

“এই যে নিজের মধ্যে ঐক্যোপলব্ধি, এই উপলব্ধিকে মানুষ আপন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। এমন কথা বলেছে, যে মানুষ নিজের মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। যে ঐক্যতত্ত্ব তার নিজেকে অখণ্ড করেছে সেই তত্ত্বই অন্যের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেছে।”

কবির এই কথাগুলি যে কত সত্য, তা বুঝতে পারা যায়, যখন একটু ভেবে দেখি—আকারে ও আচরে অর্থাৎ বাহ্যিক রূপে সীমা আমাদের গোচরে স্পষ্টতই বিদ্যমান, সেই সীমায়-সীমায় বস্তু থেকে বস্তু পৃথক। কিন্তু সেই পার্থক্য নিয়েই আবার সমস্ত বস্তু রয়েছে একটি নিখিল সৃষ্টিসূত্রে বিধৃত।—মালায় গাঁথা মণিগণের মত। এই পরম ঐক্যের সত্যে সকলের সঙ্গে সকলের যোগ অন্তহীন,—আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধতা বা অনুকূলতা—ভিতরে ভিতরে যাই যত থাক না কেন। এই ঐক্যসূত্রের প্রবাহ শুধু জানা জগতের বস্তুরাশির মধ্যেই শেষ হয়ে নেই, আগে জানি না পরে জানতে পাই, আপাত ধারণার অগম্য এমন সংখ্যাতীত বিষয়ও একই সেই সূত্রের অন্তর্গত।

জগতে যত বস্তুই এরূপ থাক না কেন, বাহ্য বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য রক্ষা করে আভ্যন্তরীণ এই ঐক্যধারার শাশ্বত ধর্ম লক্ষণ দ্বারা সকলেই যে সমধর্মা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মেলে না। আমার এই বাহ্যিক, আভ্যন্তরীণ ধর্মলক্ষণে আমাকে আমি সুস্পষ্ট করে সহজে জানতে পাই, জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের ভিতরে সেই একই ধর্মের শাশ্বত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করে নিখিল ধর্মে সকলের মধ্যেই সমধর্মা এক 'আমি'-বোধক শক্তিকে একই কালে বাইরে স্বতন্ত্র থাকলেও ভিতরে এক করে অনুভব করতে পারি। আত্মবিষয়ী ও বহির্বিষয়ী জানা এভাবে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেকের ভিতরকার এই 'আমি'টির মতই বিচিত্র অবস্থা ও গুণের সমাবেশ দ্বারা তার বিরুদ্ধ পক্ষও তৈরি; সেই বিপক্ষের মত করেই বিপক্ষের দিকটা ভেবে দেখা ও তার মূল্য ও অধিকার নিজের মত সহজ, আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করা—যখনই এটি সম্ভব হয় তখন একটি ভাব মনে উদ্রেক হতে থাকে, সেটি "সোঽহং"-এর ভাব। যা-কিছু জানার মধ্যে আসে, সেই সবকিছুই যে আমি এবং একই পার্থক্য ও ঐক্যের গুণ সমাবেশের স্বাধর্ম নিয়ে আমিও যে সে-সবই,—এইভাবে জগতের বিষয়সমূহকে জানতে শুরু করলে তখন বাইরে ভিতরে কোনখানেই কোন কিছুকে ছোট করে সীমায় খণ্ডিত করে জানার উপায় থাকে না। কবি-বিশ্বজগৎকে এইভাবেই জানতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি শেষপর্যন্ত "সোঽহং" সাধনায় সমাহিত হয়ে জগতের সর্বত্র এক অনন্ত অখণ্ডশক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে গেছেন।

জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর গান ছিল—"শক্তিরূপে হেরো তাঁরে আনন্দিত অতন্দ্রিত।" তিনি জগতের "রূপসাগরে ডুব" দিয়েছিলেন সেই এক "অরূপ রতনের"ই আশায়। এক অখণ্ডরূপে আপনার মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে আপনাকে জানা যাঁর আজীবনের সাধনা, বাইরের জীবনযাত্রাতে তাঁর সেই সাধনার উপযোগী প্রসার স্বভাবতই সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বিশেষের আচার-বাহুল্যের যে অবিদ্যমানতা, সে এই বহুর সমাবেশের প্রসারেরই নামান্তর মাত্র। কবির কাছে বা তাঁর সাধনাক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই প্রতি সমাদর, তাঁর এই "সোঽহং" সাধনার প্রধান প্রক্রিয়া বলে গণ্য। সকলের মধ্যে বিশেষের স্থান-গ্রহণ কি ভাবে করতে হবে, এই প্রক্রিয়াটি সেজন্য জানা থাকা দরকার। তা হলেই কেউ কাউকে সেখানে পর করে মনে করতে পারবে না, কোন কিছুকেই বিদেশী ঠেকবে না। প্রাণের

এই প্রসার-সাধনাই সেখানকার জীবনধর্ম "সোঽহং"। এখানকার বিগ্রহহীন সেই "সোঽহং"-তত্ত্ব পূজার উপচার হচ্ছে সংস্কৃতি।

কিন্তু যখন দেখি কবির গল্পগুচ্ছের "অনধিকার প্রবেশ" গল্পে রাধানাথ জীউর বিগ্রহের রাসকুঞ্জে পরম শুচিপরায়ণা সেবিকা প্রৌঢ়া বিধবা জয়কালী দেবী একটি প্রাণভয়-ভীত শূকরশাবককে সস্নেহে আশ্রয় দিচ্ছেন, তখনই বোঝা যায় তাঁর প্রাণ জড় হয়ে যায়নি; মৃত্তিকায় গড়া ঠাকুরকে অবলম্বন করেও শেষটা তাঁকে ছাড়িয়ে সে-প্রাণ কেমন জড়ে জীবে সর্বত্র প্রসার লাভ করেছে। সার্থক সেই পূজা। পাশাপাশি মনে পড়ে কবিরই 'বিসর্জন' নাটকের জীববলি-উৎসাহী পুরোহিত রঘুপতিকে, মনে পড়ে 'অচলায়তন' নাটকে নীতি-যূপকাষ্ঠের বলিরূপী বালক সুভদ্রের নির্বাসনদাতা অনড়চিত্ত আচার্য মহাপঞ্চককে। কলিকাতার কালীঘাটে বলি বন্ধ করার জন্য রামপ্রাণ শর্মা নামক জনৈক রাজপুত পণ্ডিত যখন প্রায়োপবেশন করেছিলেন, কবি তখন তাঁর আচরণকে সমর্থন করেন এবং প্রশস্তিবাচক একটি কবিতা লিখে তাঁকে উৎসাহ দান করেন। কবিতাটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তাঁর শেষ বয়সের ঘটনা। যজমান বা পূজকের প্রাণের মূল্য আছে, আর সামান্য জীব বলেই কি ছাগ-বলি বিহিত হবে জগজ্জননী মহাকালীর প্রীত্যর্থে?—এ হচ্ছে প্রাণের প্রসার-নীতির স্বভাব বিরুদ্ধ। এ থেকে বেদনার কোনও পরম সুর বাজে না। কেবল সীমাবদ্ধ স্বার্থ-সিদ্ধির স্থূল উপলক্ষগুলিই উঁকি মারে। ধর্মের নাম করে এই যে হিংসা, এইটিই ধর্মের বিকৃতির রূপ। এর দ্বারাই প্রাণের অনন্ত বিকাশকে হিংসিত প্রাণীর মধ্যে কার্যত অস্বীকার করা হয়ে থাকে। পরম শক্তিকে দলের সীমায় বদ্ধ করে দেখার ফলেই এই হিংসাত্মক অনুষ্ঠান ঘটে থাকে।

কবি গেয়েছেন—"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" যেখানেই সীমাকে কবি দেখেছেন অসীমের ব্যঞ্জনামুখর বংশীরূপে, সেখানেই তাঁর কাছে রূপ-চিন্তার একটা পরোক্ষ স্বীকৃতি এসে পড়েছে। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ হচ্ছে যখন অসীমকে সীমাতেই এরূপ নিবদ্ধ করে দেখা হয়। এজন্যই বিগ্রহের সঙ্গে অনন্তের কোনও সাম্য কবি স্বীকার করেন নাই, এবং পশুশালার সিংহের মধ্যে শক্তিকে দেখবার আগ্রহে তাঁর মন বিরূপ হয়েছে। কবির 'সোঽহং' সাধনার এটি একটি বিশেষ দিক। "ধর্ম" গ্রন্থে 'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,—"সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য

করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখ সৃষ্টি করিবে, দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কি করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত-জড়িত করিলে চলিবে না।...এই বিচিত্র জগৎ সংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ কোনও বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনও বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনও বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার জটিলতা সকল প্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে।"

কবির পূজাক্ষেত্রে এই ভূমাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার আয়োজন সার্থক হয়েছে যে-কয়টি ক্ষেত্রে—তার মধ্যে পরিণত বয়স্ক কর্মীদের কথা আজ বলব না, বলব একটি ছাত্রের উদার বনস্পতির কথার চেয়ে ক্ষুদ্র ফলের কথা, মননশীলতার কথা, সকলেরই যা এতদিনে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছাত্রটি মুসলমান। কর্মজীবনে "সত্যপীর" নাম ধরে জ্ঞান-ভারতীর পূজা যুগিয়েছেন প্রথম সাহিত্যের "আনন্দবাজারে"। আজ সে পরিচয় রটতে বাকি নেই "দেশে-বিদেশে"। দেশ-বিদেশের সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য ভারতরাষ্ট্র দপ্তর খুলেছেন। সেখান থেকে এমন ধরনের কাজ হওয়ার কথা, যাতে বিশ্বমৈত্রীকামী রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা কিছু সার্থক হলেও হতে পারে। সেখানে সেই "নরদেবতা"র পুজাপীঠে রবীন্দ্রনাথেরই এই মুসলমান ছাত্রটি আজ সাংস্কৃতিক যোগের ভারপ্রাপ্ত অন্যতম ঋত্বিক। বিচক্ষণতার সঙ্গে সরলতার সংযোগ ঘটেছে তাঁর লেখনীতে। সংস্কারের চেয়ে সংস্কৃতির আবেদনই তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। এর ফলে মানুষের মিলনের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের পূজা আচারের পথে প্রত্যক্ষ হয়ে চলেনি, তার কাজ চলেছে মানুষের মন গড়াকে উদ্দেশ্য করে নিরিবিলিতে। সুতরাং শুধু শিল্পসৃষ্টিতে নয়, মতামতেও নয়, মানুষের জীবনগত পূজার ক্ষেত্রেও তাঁর সাধনার সার্থকতার রূপ খুঁজতে হবে।

জপতপ পূজা-অর্চনা ধ্যানধারণার দিক দিয়ে তাঁর পরিচয় দেশের অনেকে খোঁজেন এবং সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেলে তাঁদের অধিকাংশই, পরিতৃপ্ত হতেন বটে, কিন্তু সে-সুযোগ মেলে কম। জড়ত্বের গ্লানি ঘুচিয়ে

প্রাণ-সমুদ্রে অসীম বিস্তারকেই কবি উপলব্ধির পরম বিষয় করে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মধ্যে জড়বাদের প্রতিবাদগুলি একদিকের কাজ মাত্র। কিন্তু তাঁর সর্বভূত নিয়ে সৃষ্টি ও সংযোগের অজস্র কাজের পরিচয় রয়েছে বহু পথে। মানুষের মিলন-সাধনার ক্ষেত্র এই তাঁর বিশ্বভারতীর মধ্যে যাতে জড়ত্বের ছোঁয়াচ না লাগে, সেজন্যও তাঁর উদ্বেগের সীমা ছিল্ না। একখানি পত্রে তিনি বলছেন, "যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেকখানিই ছিল অভাবনীয়, কর্তব্যের সীমা তখন সুনির্দিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠেনি, আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত করে রেখেছিল—সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি—কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেজো লোকের কারখানাঘরের ছক কেটে দিলে, কর্তব্যের রূপ সুনির্দিষ্ট করে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে ঢালাই পেটাই করা হ'ল প্রোগ্রাম—হাপরের হাঁপানি শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুড়ি-পেটা। যথা-নির্দিষ্টের শাসন আইনেকানুনে পাকা হ'ল, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাস করে ঠেকিয়ে রাখা হয়। যে পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার প্রান্তরে শাল-বীথি-ছায়ায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কত দূরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না—সেই মানুষটার সমস্ত জায়গা জুড়ে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাঁথুনির কাজ।…মন বলছে, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে।' এর মধ্যে যেটুকু ফাঁকা আছে সে ঐ সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে; সেদিকে তাকাই আর ভুলে যাই যে, পাঁচজনে মিলে আমাকে কারখানাঘরের মালিকগিরিতে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেছে। ইতি ৮ এপ্রেল, ১৯৩৫।" "পথে ও পথের প্রান্তে" গ্রন্থের ৫৪ সংখ্যক পত্রের উল্লিখিত ঐ "রক্তকরবী"র মধ্যে কবি যে মুক্তির প্রেরণা খুঁজছেন, সে প্রেরণার আরও ব্যাপক প্রত্যক্ষ বিকাশের চেষ্টা থেকেই দেখা দিয়েছে শান্তিনিকেতনের শুষ্ক ভূমিতে মানুষের যোগাযোগ-ক্রিয়ার পাশে-পাশে প্রকৃতি ও তৃণলতা-উদ্ভিদেরও যোগ কামনা করে—বৃক্ষরোপণ উৎসব, সীতাযজ্ঞ, বর্ষামঙ্গল উৎসবাদি।

কবির সত্তর বৎসরের জন্মোৎসব হবে। কি কি অনুষ্ঠানের সমাবেশ করলে তাতে কবির যোগ্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয়, এই নিয়ে নানা প্রস্তাব হতে থাকে। শেষপর্যন্ত নানা আয়োজনই হয়েছিল এবং সুষ্ঠুভাবে সমগ্র অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন

হয়ে সকলের আনন্দবিধানও করেছিল। তার অনুষ্ঠান-সূচীতে সেদিন আশ্রমবাসী ও সমাগত বন্ধুবান্ধবাদি অতিথি সজ্জনের আদর-আপ্যায়ন ও ভোজনের ব্যবস্থা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পশুপক্ষীদের জলদানের জন্যও সেদিন "প্রপা" উৎসর্গের অনুষ্ঠানটি সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল।

এর দ্বারা সর্বভূতের বেদনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের প্রসার আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সূচনাগুলি ক্ষুদ্র হলেও বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক। এই কবিরই বাণী—

"পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।"

দেবালয় তাঁর কোনও একটি বিশেষ দেবতাকে নিয়ে বিশেষ মাহাত্ম্যে মণ্ডিত হয়ে উঠে স্বতন্ত্রভাবে কোনও এক জায়গায় সাধনার সীমা টানেনি। তাঁর দেবতা বিরাজ করেন সর্বলোকে এবং সর্বত্র। এই দেবতার সহজ উপলব্ধি নিয়েই তাঁর দিন কেটেছে।

তাঁর উদার 'সোঽহং-সাধনার প্রত্যক্ষ ফল এইটুকু দেখা গেছে যে, যখন দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার অনলে মানুষ মানুষকে পুড়িয়ে মারছিল, মারামারি কাটাকাটিতে কলকাতার বুকে রক্তগঙ্গা বইছিল, তখন অনতিদূরবর্তী শান্তিনিকেতনে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রীষ্টান পাশাপাশি এক পরিবারের মত বাস করেছে। চীন-জাপান যুদ্ধের চলতি পর্বেও চীনা ও জাপানীরা পরস্পরের মধ্যে মানুষকে এখানে হারায়নি। "যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্"— সমস্ত বিশ্বের এক নীড়ে অবস্থানের চিত্র ভেসে ওঠে কবির 'বিশ্বভারতী' এই নামটিতে।

দেশ-বিদেশকে কবি নিজের মধ্যে কোন গভীরে পেয়েছিলেন, কেমন করে সর্বত্র নিজেকে বিস্তৃত দেখেছিলেন, "সোঽহং" ধর্মের সর্বানুভূতি জিনিসটি কতখানি তাঁর জীবনে স্বদেশে বিদেশে বাস্তব হয়েছিল, সাধারণের অবগতির জন্য সে কথার ব্যঞ্জনাযুক্ত একখানি অপ্রকাশিত পত্র এখানে প্রকাশ করা গেল। এর আনুষঙ্গিক ইতিহাসটি এই: আশ্রমবিদ্যালয় থেকে অসহযোগ আন্দোলনের যুগে সরকারী ম্যাট্রিক পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে আশ্রমে প্রাক্তন ছাত্র (পরে অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে জেনিভা থেকে কবি এই পত্রখানি লিখে পাঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কবির অবাঞ্ছিত ছিল। পত্রের মধ্যে এক স্থলে তিনি বলছেন, সেটা আশ্রমের

উপর "ভূতের মতো চেপে ছিল।" একদিকে সেই ভূতের উপদ্রব অন্যদিকে আবার উৎকট অসহযোগনিষ্ঠা! আশ্রমের ঘটেছিল উভয়সংকট। প্রাণহীন নিয়মতান্ত্রিকতা ও নির্মম-নৈষ্ঠিকতার বাড়াবাড়িতে মাঝখান থেকে কতকগুলি নিরপরাধ বালকের শিক্ষার সুযোগ নষ্ট হচ্ছিল। আর, এর থেকে পাছে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণের প্রসার চাপা পড়ে জড় যান্ত্রিকতা পূজার প্রাদুর্ভাব ঘটে, সেই আশঙ্কা কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পত্রে কবির সহানুভূতি ও বিবেচনার সাড়া জেগেছে প্রতিষ্ঠানকে জড়তার গ্রাস থেকে বাঁচাতে। সে বছর পরীক্ষার সুযোগ না থাকায় অনেক ছাত্রকে অভিভাবকগণ বিদ্যালয় থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। ছাত্রগণ আশ্রম ছেড়ে যেতে স্বভাবতই কাতর হয়ে পড়ে। ব্যথিত চিত্তে তাদের বিদায় নিতে হয়। কবি একথা জানলেন। সন্তানবাৎসল্য দিয়ে যাদের তিনি হাতে গড়ে ছিলেন তাদের ছেড়ে দিতে দূরে থেকে কবির নিজেরও কেমন লেগেছিল এ পত্রে সে সবই জানা যাবে :

Geneve

কল্যাণীয়েষু

অনেক কষ্টে এগুরুজকে নিয়মমত চিঠি লিখি—তার কাছে আমি এত কৃতজ্ঞ যে এইটুকু দাবি না মিটিয়ে থাকতে পারি নে। কিন্তু তার উপরে আর বোঝা বাড়ানো চলে না। একটুও সময় নেই। আশ্রমের কথা, তোদের কথা কেবল রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভাবি—দিনের বেলা ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে হয়। আমার মতো কুঁড়ে লোকের পক্ষে এত বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? আমি কর্মবিধাতার হাত এড়াবার জন্যে অনেক ভেবে-চিন্তে বাংলা-দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলুম—তার ফল হ'ল এই যে সেখান থেকে হিঁচড়ে এনে তিনি আমাকে সাত সমুদ্রের জল খাওয়াচ্চেন। ছেলেবেলা ইস্কুলের হাত এড়াবার জন্যে যা না করবার তা করেছি, বৃদ্ধবয়সে একখানা গোটা ইস্কুল ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি— তাতেও প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না, অবশেষে একটা ইউনিভার্সিটির বোঝা তৈরি হচ্ছে, সেটা যখন ঘাড়ে চাপবে একেবারে চেপটা হয়ে যাব। গোড়ায় কাজ ফাঁকি দিলে অন্তে কাজ বেড়ে যায় আমি তার নিদারুণ দৃষ্টান্ত—অতএব সাবধান হবি—এবং শিশুদের জন্যে নীতিশিক্ষার বই যদি কখনো লিখিস তা হলে আমার দুঃখের দশা উল্লেখ করে তাদের সতর্ক করে দিস।

ম্যাট্রিক তুলে দেওয়া নিয়ে তোদের যখন ঝুটোপুটি চলছিল আমি চুপ করে ছিলুম। তার কারণ, দূরের থেকে সমস্ত অবস্থা সুস্পষ্ট বোঝা যায় না—তার পরে তোদের মধ্যে উত্তেজনার তাপ উগ্র হয়ে উঠেছিল—আমি সমুদ্রপার থেকে যদি কোনো পক্ষ অবলম্বন করতুম তা হলে নিঃসন্দেহই তার ফল ভাল হ'ত না—আমি জানতুম তোরা আপনাদের মধ্যে থেকেই একটা মীমাংসা করে নিতে পারবি, আর সেইটেই সঙ্গত। আমি পারতপক্ষে আমার মত জোর করে চালাতে চাইনে—আশ্রমের অনেক ব্যবস্থা ও নিয়ম আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে প্রচলিত হয়েছে, আমি তাতে হস্তক্ষেপ করিনি। আমি নিজে জবরদস্তির পক্ষপাতী নই, অন্যের কাছ থেকেও আমি সেই নীতি প্রত্যাশা করি। ম্যাট্রিক আমার মনের মত জিনিস নয়—কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক যখন এটা চায় তখন ছেলেদের জোর করে ম্যাট্রিক থেকে ছিন্ন করতে পারিনি। আমার ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতীকে সম্পূর্ণ পাকা করে তুলে মাত্রিক এবং অমাত্রিক এই দুই ধারা রক্ষা করব—শেষকালে দুই ধারা যথাসময়ে একে এসে মিলবে। আমি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই কোন ছাত্রকে কাঁদিয়ে বিদায় করতে পারতুম না। এ সমস্ত সত্ত্বেও ম্যাট্রিক উঠে যাওয়াটা আমি তত ক্ষতিকর মনে করিনে—কারণ ওটা ভূতের মতই আমাদের বিদ্যালয়ের ঘাড়ের উপর চেপে ছিল—গেছে আপদ গেছে।

কিন্তু আমার আপত্তি এই যে, বিদ্যালয়ের নিজের ভিতরের দিক থেকে এই সংস্কার হ'ল না, এটা হ'ল নন্-কো-অপরেশন পর্বের একটা অধ্যায়রূপে। বাহির থেকে পলিটিক্সের ঝাঁটা আমাদের শান্তিনিকেতনের পিঠের উপর পড়ল। তাতে করে তার পিঠের যদি কোনো ময়লা উঠে গিয়ে থাকে সেই সঙ্গে তার অনেকখানি চামড়াও উঠে গিয়েছে—তার ব্যথা এবং তার দাগ সহজে মিটবে না।

আমি এখানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোরা যদি আমার সঙ্গে থাকতিস তা হলে দেখতে পেতিস্ এখানকার লোকে আমাকে কত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। এরা আমার কাছ থেকে কি পেয়েচে তা আমি নিজেই বুঝতে পারি নে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নেই যে আমার দেশের লোক আমার কাছ থেকে এমন করে কিছুই গ্রহণ করেনি। ভাবের বীজ যেখানেই ফসল দেয় সেইখানেই তার যথার্থ আপনক্ষেত্র—সে হিসাবে এই পশ্চিম দেশের জমিতেই আমার সম্পূর্ণ সফলতা। এরাও মানুষ—এরা যখন আমার কাছে

এসে বলে "তুমি আমাদের" তখন বিদেশীয়তার বাহ্য ব্যবধানই অন্তরের আত্মীয়তাকে আরো সুপরিস্ফুট করে তোলে। এরা যখন আমাকে এমন করে ডাকে তখন আমি এদের আপন বলেই গ্রহণ করি—কেন না এদের এই চাওয়া বড় গভীর, এদের এই ডাক বড় সত্য কেবল ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে আমার দেশের সীমানা আমি নির্ণয় করতে পারি নে। তার চেয়ে আরো গভীরতর সত্যতর স্বদেশ আছে—সেখানে ভাবের সঙ্গে ভাবের সহজ সাড়া চলে। সেখানে নাড়ীর যোগের টেলিগ্রাফি নেই, সেখানে আকাশে আকাশে বিনা-তারের টেলিগ্রাফি।

আশ্চর্য এই যে তবু সেই দেশের টান এড়াতে পারি নে। সেই মাঠ, সেই আলো, সেই আমবাগান, সেই দীঘীর কালোজল, সেই নবীন অঙ্কুরে শিউরে-ওঠা ধানের ক্ষেত, সেই মর্মরিত তালবনের উপরে নববর্ষার ঘনস্নিগ্ধ ছায়া, বাঁশির নব নব তানের মত আমার বুকের মধ্যে কেবলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে। যা হোক, দেশে-ফেরবার দিন কাছে এসেচে। কিন্তু দীর্ঘপথের শেষ অংশটাই সব চেয়ে দীর্ঘ বলে মনে হয়, আমারো তেমনি এক বৎসর এক রকম করে যখন কেটে গেল দুমাস যেন আর কাটতে চায় না।

যা হোক তোদের সম্বন্ধে অনেক কথা ভেবে রেখেছি—দেশে ফিরে গিয়ে তার আলোচনা হবে। আজ নানা জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে তৈরি হয়ে নিই গে। ইতি ৫ মে ১৯২১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

এ যুগটা বিচিত্র। এলোমেলো। 'উল্টো-পাল্টা ঘুর্ণি তালটা'র মধ্যে মাথা ঠিক রেখে চলা শক্ত। একমতে যা বেদবাক্য, অন্যমতে তা বাজে কথা।

কিন্তু পথ একটা বেছে নিতে হয়। "মহাজ্ঞানী মহাজন যে-পথে ক'রে গমন, হয়েছেন চির-স্মরণীয়"—সেটাই পথ। এরূপ মহাজন আমাদের ক'জনই বা আছেন, কাল থেকে কালান্তরে যাঁদের কথা চলে ও লোকসাধারণের মাঝে থেকেও মহত্তর যাঁদের দৃষ্টি এবং গতি, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন।

প্রচলিত ধর্মে লোকের বিশ্বাস কমে আস্‌ছে। সংশয় বাড়ছে। লোকের জড়বাদী হওয়ার মূলে আছে সুবিধাবাদীদের মেকি ধার্মিকতার প্রতিক্রিয়া। শিক্ষিত শ্রেণীর কথাটা এই।

যে-কারণেই হোক্, মন যখন ঘুরছেই, তখন একালের মন বুঝে মনের কথাগুলিকেও একটু ফলিয়ে বলাই ভালো ; নয়তো কিছু বললে লোকের মনে তা না-ও ধরতে পারে। সেস্থলে কাজের আশা বৃথা।

এখন তাই বুদ্ধিজীবীদের আসরে কাজের কথা দিয়েই কথা শুরু করা দরকার হয়ে পড়েছে। শেষকালে ভাবের মানুষ কবি—রবীন্দ্রনাথও সে-পথটাই যেন বেশি করে বেছে নিয়েছেন। তাঁর ধর্ম-বিষয়ের রচনা বা ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, ইতিহাস বিজ্ঞানাদি বাস্তবধারার যোগাযোগ নির্দেশ। লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে কথামাত্র তিনি শেখাতে চাননি, কাজের ভিতর দিয়ে, বাস্তব অনুভূতির পথেই আনন্দে এগিয়ে চলেছেন। তা হতে তিনি যে সত্যদ্রষ্টা তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। যখনই তিনি কিছু শুনিয়েছেন, কেবল তাঁর মুখের কথা শুনেই লোকে সত্যকে দেখতে পাবে, শিখে নেবে, এ-বিষয়ে অহমিকাপূর্ণ কর্তৃত্বের দাবি তিনি আদৌ করেননি। বস্তুত এটা তাঁর কাছে বিশেষভাবে অনভিপ্রেত ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, লোকে তাঁর কথা বাস্তব উদাহরণ বা সূত্রাদির সাহায্যে দেখে দেখে বিচার ক'রে শেখে। তাই প্রথম প্রথম তাঁকে যারা না মেনেছে শেষে গিয়ে দেখেছে যে, মানতেই হয়। এই ক'রে লোকে রবীন্দ্রনাথের কথা গোড়াতেই না নিলেও, নেয় ধীরে-ধীরে। বলবার গুণে তাই রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন কথা ব'লেও নিজে থাকেন নূতন, নূতন কথার মধ্যেও আবার পুরানো বন্ধুর মতো তিনি হয়ে ওঠেন আপনার। এ হল বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সাধারণের মহলে।

লোকে কিসে সহজে বুঝবে, এ চেষ্টা ছিল পূর্ব-পূর্ব মহাজনদেরও লোকেরই মুখ চেয়ে ভাষার দিক দিয়ে সাধু ও বনেদী পথ ছেড়ে সোজাসুজি বল্‌তি ভাষায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন বুদ্ধ এবং চৈতন্যদেব। "বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্ব-সাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫০৩)

আমাদের কবি ঋষি, তিনি দ্রষ্টা তিনি দেখেছিলেন, এ যুগের লোক-মতের ও ব্যবহারের ক্রম-পরিণতির একটা অবস্থা,—'বস্তুতন্ত্র'। এর বাহন পাশ্চাত্য-প্রভাবময় বিজ্ঞান। তাই যুগপরিচায়ক বিজ্ঞানকে কবি বাদ তো দেনই নাই, প্রাধান্য দিয়েছেন; কারণ তা' উড়ে এসে জুড়ে বসে নাই— জীবনের পথে তার মূল্য অপরিসীম। তিনি বলে এসেছেন: "বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তন ক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খঃ পৃঃ ৫০৮) অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পূর্বে কবি আরো বলেছিলেন, মাতৃভাষায় এই বিজ্ঞানের প্রসার, দু'একজনের মধ্যে নয়, দেশের সকলের মধ্যেই আনতে হবে। কেননা "ঘরে বাহিরে চারিদিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে স্থায়ীরূপে বর্ধিত হইতে পারিবে। নতুবা···চারিদিকের দিগন্তপ্রসারিত মূঢ়তা দিনে নিশীথে অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ণ-মূল উচ্চতাকে আপনার সহিত সমভূম করিয়া আনিবে।—১৩০০।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী খঃ ১২, পৃঃ ৫০৮)

মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন কবি তৎকালে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রসঙ্গক্রমে। বিজ্ঞানে কবির শ্রদ্ধা ছিল শেষাবধিই। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানের অপব্যবহারে তিনি অত্যন্ত মর্মাহতও হয়েছিলেন। রঁমা রঁলার জন্মোৎসবের উপলক্ষ্যে প্রেরিত অভিনন্দন-বাণীর একস্থলে তিনি বলেন (১৩১৩): "আধুনিক জড় পৌত্তলিকতার (Fetish Worship) প্রভাবে অন্য সব মানবীয় ধর্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, মানুষ ও মনুষ্যত্ব বলির অসংখ্য উপায় এই পৌত্তলিকতাই দিন-দিন জোগাইয়া দিতেছে।" (শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ) কবি বিশেষ

ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিজ্ঞান-জানা শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যেও কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেখে।

এককালে ভূমিকম্প সম্বন্ধে লোকবিশ্বাস ছিল—'বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু।' (রবীন্দ্র-রচনাবলী খঃ ১২,পৃঃ ৫০৩) কবি অনেক আগেই এইরূপ কুসংস্কার দূরীকরণার্থ সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার কামনা করেন। তার অন্যথাস্থলে সতর্ক ক'রে বলেছিলেন, "নতুবা শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও 'বাসুকির গাত্রকণ্ডু ভূমিকম্পের কারণ'রূপে ফিরিয়া দেখা দেয় এমন উদাহরণের অভাব নাই।" (১৩০৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী খঃ ১২, পৃঃ ৫০৩) একদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবর্তক পশ্চিমী সভ্যতায় বস্তুতান্ত্রিক মানসিক বিকারের বহুফল আমাদের গোচরে আস্‌ছে, অন্যদিকে আমাদের দেশেই উচ্চমুখেও মানুষের অপরাধের শাস্তি-বিধানের জন্যেই ভগবান বহুবিধ্বংসী ভূমিকম্প পাঠিয়েছেন এরূপ কথাও আমাদিকে শুনতে হয়েছে। কবির কাছে দুইই ছিল বুদ্ধিবিপর্যয়ের দুই চরম পরিণতির পরিচয়। এইরূপ মনোবৃত্তি দেখা দিলে শেষে রাষ্ট্রে 'ডিক্‌টেটরশিপ্' এসে পড়ে, আর ধর্মে 'কর্তাভজা' মাথা তোলে। এর আর-এক পরিণতি,—হাত-পা এলিয়ে দেওয়া 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। এর কোনোটাতেই কবি কিছুমাত্র শুভ-দেখেননি। সুতরাং এ-গুলিকে প্রশ্রয়ও দেননি। দুর্গতি থেকে বাঁচাবার জন্যই তিনি বিজ্ঞান হ'তে বস্তুনীতির উদাহরণের সাহায্যে বুদ্ধি-বিচার প্রয়োগপূর্বক লোককে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই ক'রে তাকে একইকালে নিয়ে চলেছেন, বস্তুর বাইরের জগতেও। প্রতিপাদ্য তাঁর,—সেই বস্তু,—যা বস্তু-অবস্তু সব নিয়েই একটি অখণ্ড সত্তা হয়ে আছে,—প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে সর্বব্যাপী। মানুষ নানাভাবে তাকে এ পর্যন্ত বুঝে এসেছে এবং বুঝবে।

অপ্রত্যক্ষকে নিয়ে আসবেন আমাদের গোচরে বা প্রত্যক্ষকে নিয়ে উত্তীর্ণ করে দেবেন অপ্রত্যক্ষের স্তরে,—জলেস্থলে অন্তরীক্ষে এই গাঁটছড়া বাঁধাই যেন হয়ে উঠেছে কবির আসল কাজ। তাঁকে প্রধানত ভাবুক বলা হলেও এ যুগের মনোধর্মকেও তিনি পূর্ণ মূল্য দিয়ে, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সাধনায় যোগ রেখেছেন; এর ফলে দেখতে পাওয়া যায়, বহু ইতিহাস-ও-বিজ্ঞানপন্থী মনীষী তাঁর সঙ্গী হয়ে, অনুরাগী হয়ে তাঁর সাধনার নানাক্ষেত্রেই মিলেছেন। অনেকেই তাঁরা আবার সাহিত্যরসিক।

পূর্বকালের ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কবিকে খুবই স্নেহ করিতেন।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যদুনাথ সরকার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ ভাণ্ডারকর (বিদ্যাভবনের কাজের সূত্রে)—এঁদের সঙ্গে কবির হৃদ্যতা এবং কবিরও এঁদের মধ্যে নানাকাজে পারস্পরিক সহায়তার কথা অনেকেরই জানা আছে। একালের বহু নামকরা বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাথ সাহা, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিও কবির শান্তি-নিকেতনে এসেছেন ও নানানভাবে সাহায্য করেছেন। বিশ্বভারতীর প্রথম দিকে এর কর্মসচিব ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ; এই সেদিন পর্যন্ত অর্থসচিব ছিলেন ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু, আর সাহিত্য-প্রকাশনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন প্রবীণ বিজ্ঞান-অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য; বার্ধক্যের অবসর-জীবনটুকুও তিনি শান্তিনিকেতনের সেবাতেই সেখানে থেকে ব্যয় করেছেন। বঙ্গ সাহিত্যে খ্যাতিমান 'পরশুরাম' কবির বিশ্ব-ভারতীতে শুধু যে যাতায়াত করেছেন, তাই নয়, তিনি সেখানকার 'রাজশেখর বিজ্ঞান সদন'-এর প্রতিষ্ঠাতা। 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থ রচনাকালে রাজশেখরবাবু ও আলমোড়ার শ্রীযুক্ত বশী সেন কবিকে বিশেষভাবেই সহায়তা করেছেন। ডাঃ অমূল্যচন্দ্র উকিল ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এককালে শান্তিনিকেতনের আহার্য-সদনে খাদ্যব্যবস্থা বিষয়ে পরামর্শাদির দ্বারা সাহায্য করেন। ডঃ নীলরতন ধর ও তাঁর স্ত্রী শীলা ধর উভয়ে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন ক'রে বিজ্ঞান বিষয়ে সিংহসদনে বক্তৃতা দান করেছিলেন। ডাঃ নীলরতন সরকারের সঙ্গে কবির বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। কবি তাঁকে তাঁর প্রান্তিক কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন।

এ সঙ্গে মনে পড়ে, কবি কেমন ক'রে মানুষের জন্মান্তর না হোক, মনের দিকে জাত্যান্তর ঘটিয়েছেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। যিনি ছিলেন রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি হয়ে গেলেন শেষাবধি রবীন্দ্র-সংগীতে বিশেষজ্ঞ,—ক্রমে হলেন বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের অধ্যক্ষ। অর্থনীতির চর্চার মুখে আর-এক অধ্যাপককে সাহিত্যের টানে 'অর্থমনর্থম্' জপা শুরু করতে দেখে, কবিকেই স্বয়ং অতঃপর স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল "তোমার তো সংসার আছে।" ইতিহাসের অধ্যাপক 'ভারতের জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থের লেখক শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় আজ পরিচিত হলেন 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার রূপে। কলকাতার হরি ঘোষ স্ট্রীটের কবিরাজকে অগত্যা শান্তিনিকেতনে এসে বিরাজ করতে হচ্ছে ভারত-বিখ্যাত সাহিত্যশাস্ত্রীরূপে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে

ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কাছে শোনা যেতো, "কী আর করা, কবিই রাজি হলেন না, কবিরাজী আর হয় কী করে!" এমনি ছিল কবির 'পরশমণি'। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে আনেন কবি আমেরিকা থেকে। বিদেশে বিজ্ঞানাচার্য আইনস্টাইনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তাঁদের বিখ্যাত সেই আলাপ-আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এই যা লিখলাম তা কেবল নামের একটা ফিরিস্তা নয়। এঁদের সকলের সাহায্য থেকে কবিচিত্ত বিজ্ঞানের প্রেরণায় নানাসময়ে সমৃদ্ধ হয়ে ভাব ও বস্তু-লোকের মধ্যে একটি অপূর্ব সেতু রচনা করেছে।

আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ-ধারাকে পাশে রেখে-রেখেই কবি আধুনিক জগৎকে যেমন বুঝেছেন, পেয়েছেন,—তেমনি তাঁর ভাবানুভূতিকেও আধুনিকরা সমানই বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং পাচ্ছেন পরম আনন্দের উৎসরূপে। বিজ্ঞানের যোগে কবির ধর্ম হয়ে উঠেছে বিচারসহ, গোঁড়ামিবর্জিত, সর্ববিষয়মুখী এবং সর্বসাধারণমুখী। ভারতে বিজ্ঞান কবির সাধনাযোগে যতটুকু প্রভাবিত হয়েছে, তাতে তা বিশ্বকল্যাণমুখী, সৃষ্টিধর্মী, অনুভূতিপ্রবণ হয়ে চলেছে ব'লেই ধরা যেতে পারে। পাশ্চাত্যেও আইনস্টাইনের বিশ্বকল্যাণবাণী নিয়তই আজো কবির প্রেরণার সমধর্মী হয়ে প্রকাশ পেয়ে চলেছে।

বাংলার শিশুদের প্রিয়-কবি সুকুমার রায়ের নাম সুবিখ্যাত। বৃত্তিতে কিন্তু তিনিও ছিলেন বিজ্ঞানী। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন, শান্তিনিকেতনের বাইরে যুবকমহলে কবির অমন ভক্ত ছিল বিরল। অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুশয্যায় কবি তাঁকে দেখতে যান। অনুরোধ ক'রে মৃত্যুপথযাত্রী সেই কবি প্রয়াণ-মুহূর্তে তাঁর প্রিয় ক'খানি রবীন্দ্রসংগীত শুনেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠ থেকে। এরূপ আরো-একটি ঘটনা আছে; পরে বলা যাবে। সেটি একজন ভাবুকের কথা। তার আগে ভাবতন্ত্রের ধারাও কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

কবির সঙ্গে এই ধারার মনীষী অনেকেই যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তত্ত্ববিদ্যার বিশেষ আলোচনায় যাঁরা আচার্যপদ লাভ করেছেন, এমন বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র শীল, রাধাকৃষ্ণণ ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে এসেছেন। রবীন্দ্রচিন্তাধারা নিয়ে বইও লিখেছেন এঁদের কেউ কেউ। এ ছাড়াও ঋষিপ্রতিম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কবি শুধু পারিবারিক ভাবে নয়, শান্তিনিকেতনেও সাক্ষাতে লাভ করেছিলেন এবং

কলকাতায় দার্শনিকপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন নানাদিক দিয়ে।' উচ্চশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রীদের দ্বারা আলোচিত হয়ে বা, এঁদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে কবি যে প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজেছেন, তা নয়, কারণ, দেখা যায়, পাশাপাশি সমভাবেই তিনি তত্ত্বান্বেষী ছিলেন লোকধর্ম-শাখাতেও। এঁদের দ্বারা তিনি ভারতীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের (৪ পৌষ ১৩৩২) মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। কলকাতা সিনেট-হলের সে-সভায় তিনি সেদিন যে ভাষণ দান করেন, তার মধ্যে বলেছিলেন, ভারতীয় সাধারণ লোকদের সহজ ভাবধারার অন্তর্নিহিত গূঢ় কথা। কবির দপ্তরে বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, বাইবেল, জাতক ইত্যাদি শাস্ত্রীয় সংগ্রহ যেমন ছিল, তেমনি ছিল লালন শা' ফকিরের সাধন-সংগীত সংগ্রহের কয়খানি পাণ্ডুলিপি। তাঁর আমেরিকার হিবার্ট-লেকচার ছাড়াও অন্যান্য ধর্মবিষয়ক ভাষণগুলির আশেপাশে অখ্যাত লোকগুরুদের গানের উদ্ধৃতিও নিতান্ত কম নেই। তাঁদের সেই ধারাও কবির এতদূর রপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, সহজেই তিনি শেষবয়সেও শেষবারকার মতো 'পত্রপুট' কাব্যের 'সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে' কবিতাটির মধ্যে একটি বাউলের মুখে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় বসিয়ে দিয়েছেন :

হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে
সবাই ধ'রে টানে আমায় এই যে গো এইখানে।

সেই বাউলও যেমন সংগতি রেখে বিরাজ করছিল হাটের জনতার মধ্যে, কবিও সংসারের হাটে তেমনি তাঁর সুর দিয়ে সকলের চিত্ত ভরিয়ে বাঁধতে চেয়েছেন বস্তু ও ভাবকে, নানা লোককে, জাতিকে, তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা ও ধর্মকে, একটি মধুর সংগতিতে।

সংসারের ধর্মসম্প্রদায়গুলি সংগতভাবে বাঁধা নেই। কোথায় কী ক'রে তারা সংগতি ভেঙেছে, সে সব কারণ কবি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। সকলের সব ভালো-মন্দ জেনে নিয়ে তিনি গেঁথে তুলেছেন এক সোঽহং তত্ত্ব, বা সর্বাস্তিবাদ। উচ্চ বিজ্ঞান-ধর্ম এবং সেসঙ্গে সাধারণ ভাবধারা, আর, ইতিহাসেরও বাস্তব পরিণতি-ক্রম সব মিলে নিছক তত্ত্বকথা থেকে সেই ধর্মচিন্তাভিব্যক্তিটিকে নিয়ে গেছে একটি বিশ্ব-মহাগাথার পর্যায়ে।

ভাবের পথই হচ্ছে ধর্মের বনেদী পথ। ধর্মগুলি কী ক'রে লোকের বিশ্বাস হারাচ্ছে, কী ক'রে সেই বিশ্বাস আবার তারা ফিরে পেতে পারে,—নিজেদের

ভিতর থেকে তা জানবার সুযোগ তাদের যদি না-ই হয়, রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ ও সংশোধন প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখা আবশ্যক : কারণ, এ-গুলি বিশেষ-ভাবেই সাহায্যকরী হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত জানবার পক্ষে তাঁর শেষজীবনে রচিত "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী। তাঁর 'সোঽহং তত্ত্বের' ব্যাখ্যা আছে তারি মধ্যে। এই তত্ত্বে পৌঁছবার পথে আছে প্রচলিত প্রধান চারিটি ধর্মের ব্যবহারিক বিকৃতির কথা। কিন্তু ধর্মগুলির অন্তর্নিহিত মহৎ প্রেরণার স্বীকৃতি সে-গ্রন্থে কবির মতবাদটিকে মূল ভিত্তি দান করেছে।

"মানুষের ধর্মে" রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রা-নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

"কিন্তু মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমানকালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়। স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায়; তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।"

"সকলের চেয়ে আমি বা আমরা একদল বড়ো হব," "আমি বা আমাদের দলই আমাদের ইচ্ছামতো ক'রে সকলকে বড়ো করবো,"—বড়ো-জীবনে পৌঁছবার উদ্দেশে এটা বড়ই ভুল পথ। এতে অভিমান বাড়ায়। পরের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট ক'রে চলবার ঝোঁক আনে। নির্মল প্রীতির সৃষ্টি করতে কদাচিৎ পারে। ধর্মের লক্ষ্যই হলো নির্মল প্রীতি।

এজন্য সাম্রাজ্যবাদী ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি রাষ্ট্রহিসাবেই বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে; —ধর্ম হিসাবে তারা সার্থকতার পরিচয় দিতে পারেনি। তারা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, করুণা, প্রেম, অহিংসা প্রভৃতি আদর্শ প্রচার করে, অপর সম্প্রদায়ের বেলায় নেয় তার বিপরীত পথ।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পৃথিবীতে দুটি সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র :—সে হচ্ছে খ্রীষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন ক'রেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিহত করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। অপরপক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের Non-Violent Co-operation."

বিষয়ী ধর্মধ্বজীদের হাতে প'ড়ে খ্রীষ্টান মুসলমান দুই ধর্মেরই সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটেছে দেশে-বিদেশে, কোনো-কোনো স্থলে মানুষকে সদ্‌জ্ঞানের আলোয় এনে মুক্তি দেবার চেষ্টা চলেছে জোর ক'রে। সে জোর শারীরিক প্রভুত্বের, সে জোর মান-ঐশ্বর্য-চাকরির,—নানা প্রলোভনের।

ভারতবর্ষের হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মও বিদেশে ধর্মপ্রচারে গিয়েছে, কিন্তু হিংসার উপদ্রব বাধায়নি। সে উপদ্রব কিছু-কিছু চলেছে তাদের ঘরে-ঘরে। ভারতের সঙ্গে দেশান্তরের ধর্মের এই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্রষ্টব্য।

আজ দেখা যাচ্ছে,—দলবদ্ধ হয়ে বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার্থেই লোকে মিলছে, উৎসাহ দেখাচ্ছে। পরের সঙ্গে তো বৈষয়িক ধার্মিকদের বিবাদ লেগেই আছে, নিজেদের উপদলের মধ্যেও পরস্পর আত্মঘাতী বিবাদের অন্ত নেই। ধর্মের নাম ক'রে দলকে বাড়াতে গিয়েই ধর্মের নামের গায়ে সকলে লেপে দিয়েছে কলঙ্ক, যদিও সেটা তাদের মূল-ধর্মের কলঙ্ক নয়। এরূপে ধর্মে লোক-সংখ্যা নিয়ে টানাটানি ব্যবসায়-বুদ্ধির কাজ।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মে-ধর্মে ভিন্নতা নেই। নামে ভিন্ন হলেও সব ধর্মই মূলে এক ধর্ম। কিন্তু ঠিক এ-কথাগুলি কে না ব'লে থাকে। এসব এখন প্রায় কথার-কথা হয়ে গেছে। তাই সকলে আওড়ায়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করার তাগিদ অনুভব করে না। কথাগুলি সেইজন্যে বুঝে দেখা দরকার। ধর্মের যা মূল বস্তু তাকে বাড়াবার কমাবার নেই। যে-কোনো ধর্মে প্রকৃত কোনো ধার্মিকের সাধনায় দেখা যাবে তিনি এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন যেখানে ধর্মের ভেদাভেদ ঘুচে গেছে, কোনো বিশেষ গৌরব অনুভব করার মতো চিত্তবৃত্তি আর অবশিষ্ট নেই। মূল্যের শাশ্বত উদার প্রেরণা-মাহাত্ম্যে প্রত্যেকটি ধর্ম গৌরবান্বিত। পত্রগুচ্ছের মধ্য দিয়ে গাছেরা সূর্যকিরণ গ্রহণ করে, তাই

নিয়ে প্রাণশক্তিতে আপনাদের করে সার্থক। দৈনন্দিন স্বার্থে প্রভাবিত মানুষের সাংসারিক জীবন। তারই নানা ব্যবস্থানীতির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও জাতি ধর্মকে চায় সহজ ও প্রচুর রূপে গ্রহণ করতে; যত বেশি সহজে তা নিতে পারে, ততই প্রমাণিত হয় বিশেষ মানব-সংঘ ও তার নীতি-অনুষ্ঠানের সার্থকতা। না-বুঝিয়ে দিয়ে, জোর ক'রে চাপানোর, কিংবা ভয় পেয়ে বা লোভে প'ড়ে গ্রহণের জিনিস ধর্ম নয়।

মত ও ব্যবহারের উদারতা ও স্বাধীনতার উপর জোর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীষ্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে, তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।"—(পরিচয়)

আচার-ব্যবহারে অসহিষ্ণুতা তো রয়েছেই। এখন বিভিন্ন ধর্মমতের লোকদের নিয়ে এমন কি তাদের ভিন্ন-ভিন্ন নাম নিয়েও অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছে। এইটেই কবির কাছে মানবধর্মের বিরুদ্ধ ব'লে মনে হয়েছে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ছেড়ে পরিবারে-পরিবারে তো দূরের কথা, এখন জাতিতে-জাতিতে দেশে-দেশে,—এই অসহিষ্ণুতার বাতাসে স্বার্থসংঘর্ষের সর্বনাশী দাবানল আরো ছড়িয়ে পড়েছে।

স্বার্থই যেমন সব বিষয়ীর ধর্ম, তেমনি খাঁটি ধার্মিকদেরও আবার একটি ধর্ম আছে। বিষয়ীদের ধর্মকে ধার্মিকের ধর্ম বলে ভ্রম না হয় সেইটি লক্ষ্য রাখা দরকার। দুঃখের বিষয়, বিষয়ীদের ধর্ম অসহিষ্ণু সাধারণের মধ্যে চলেছে ধর্ম নামে।

সব ধর্মের এই স্বার্থ-সর্বস্ব বিষয়ীরা ধর্মের অপব্যবহার ক'রে সংসারে কী দুর্গতি ঘটিয়েছে তার ছবি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাতেই পাওয়া যায়। কথায় বলে,—আগে তিতা পরে মিঠা ভালো। তিতা দিকটার দেখাই সুতরাং সেরে নেওয়া যাক।

পবিত্র ইসলাম শান্তির ধর্ম। তবু তার ধর্মতত্ত্ব বা যাবতীয় ব্যবহার-নীতি স্বার্থ-বুদ্ধির প্রভাব থেকে মুসলমানদের বাঁচাতে পারেনি। তবে তার

সেই বুদ্ধিটা একটু বৃহত্তর গণ্ডির,—সেটা বেশি দলগত। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—"মুসলমানে মুসলমানে এক মুহূর্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়।" এই ভালোটুকুর আওতায় মন্দ কিছু ঢুকেছে কি না তা বিবেচ্য। দলে মিলে যখন পাপ করে, তখন সেটা দলীয় স্বার্থের কাজ ব'লেই ব্যক্তির কাছে অনেক সময় পুণ্যের পর্যায়ে পড়ে, ইতিহাসে তার নজির দুর্লভ নয়। জগতে যে অমানুষিক অত্যাচার ঘটে আসছে এক-একটি সাম্প্রদায়িক অভিযানে, তাকে ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে দল ভারি করতে বা করাতে কোনোদিন লোকের সংকোচ বা লোকাভাব ঘটল না। সাধারণভাবে একথা সকল সাম্প্রদায়িক অভিযানকারী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তবে মুসলমান-প্রসঙ্গে বিশেষ ক'রে উত্থাপিত হল এজন্য যে, ভ্রাতৃত্ববোধে দলবদ্ধতায় জগতে মুসলমানেরা সমধিক অগ্রসর, এই ব'লে তাদের একটা গৌরব আছে। 'জোড় লাগা'র কথায় সেই গৌরবের দিকটাই কবি দেখিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই বলেছেন,—"মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে-যে কেবল আপন বল দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততিবিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিকভাবে আপন ধর্মের বিস্তার করে।·· কেবলমাত্র রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে নয়, রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূর দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে।" এই অবাধ রক্তমিশ্রণের পথটাকে ধর্মবিস্তারের উপায়ে লাগাতে গিয়ে যেন নারীহরণ, নারী-ধর্ষণ কারো মধ্যেই সংক্রামক হয়ে না ওঠে, সেটা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। পবিত্র ইসলাম ধর্মের মূল প্রেরণা অন্যরূপ। তা না হলে ইসলামের মহত্ত্ব ধর্মহিসাবে আজ পর্যন্ত টিকতো না। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিক আছেন, তাঁদের মধ্যেই ইসলামের ধর্ম জীবিত রয়েছে,—ইসলামের স্বার্থপরায়ণ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে নয়।

খ্রীষ্টানরাও তাঁদের ধর্ম পার্থিব স্বার্থের কবল থেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। "পুনশ্চ" কাব্যের "মানবপুত্র" গদ্য কবিতাটিতে এবং "বড়দিন" উপলক্ষ্যে শেষদিকে রচিত গানখানিতে কবি সে কথাই বলেছেন অতি দুঃখের সঙ্গে।

মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে,
তারপরে কেটে গেছে বহুশত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্ত্যধামে

চেয়ে দেখলেন,
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যাঁরা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে,
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে,
বলছে, "মারো মারো"।

গানটিতেও এই কথাই আছে।

বলাবাহুল্য এই সব তথাকথিত ধার্মিকেরাই আজকের খ্রীষ্টান-জগতের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে বিরাজ করছে। তারা অনায়াসে গীর্জায় ব'সে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে অন্যের নিপাতের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। লজ্জাবোধ করে না। তারা ধার্মিক নয়, ধর্ম শব্দের প্রকৃত অর্থে।

বৌদ্ধধর্ম মহামৈত্রী ও তাব জ্ঞান বহন করে। কবির বহু শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়েছে এ-ধর্ম। কিন্তু তারও অদ্ভুত পরিণতির চিত্র পাওয়া যায় কবির "নবজাতক" কাব্যের 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এটি রচিত। ভূমিকাতে কবি বলেছেন,—"জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি, জাপানী সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা ক'রে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর যাচে করুণানিধির।
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দির তলে।
গর্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন;
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত;
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ।

বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তুরী ভেরী বেজে ওঠে
রোষে গরো গরো,
ধরাতলে কেঁপে ওঠে
ত্রাসে থরো থরো।

হিন্দুদের সম্বন্ধে কবি 'যাত্রী' গ্রন্থে বলেছেন,—"মানুষের মনঃ-প্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার ক'রে নিয়ে হিন্দুধর্ম রফা নিষ্পত্তিসূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট ক'রে ফেলে হিন্দুধর্ম ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেনি, ভেদ রক্ষা করেও সে একটা ঐক্য আনতে চেয়েছে।

"কিন্তু এমন ঐক্য সহজ নয় ব'লেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকে না। বিভিন্ন বহুকে এক বলে স্বীকার করেও তার মাঝে মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিতে হয়। একে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না, একে বলতে হয় বিভক্ত এক। ঐক্য এতে ভারগ্রস্ত হয়, ঐক্য এতে শক্তিমান হয় না।"

অন্যত্র, 'কালান্তর' গ্রন্থের 'হিন্দুমুসলমান' রচনাটিতে বলেছেন,—"আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু। সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। অন্য আচার-অবলম্বীদের অশুচি ব'লে গণ্য করার মতো মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই।...বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধ-যুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী একান্ত একটা বেড়ার মতো ক'রেই গড়ে তুলেছিল, এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক বাধাগ্রস্ত।" (কালান্তর) কিন্তু অন্তর্নিহিত এই সব ত্রুটি জেনেও রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের দেশ ভারতবর্ষকেই বিশেষভাবে ভালোবেসেছেন। বলেছেন "যাত্রী"তেই:—"শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েছি ব'লেই যে এমন হয় তা নয়; ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে, আলোতে, নদীতে প্রান্তরে প্রাকৃতির একটা

উদারতা দেখেছি, চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেছে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্তি চারিদিকে,—তবু সমস্তকে অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদিকালের যে-কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা যত বেশী এমন আর কোথাও দেখিনি, তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ।" রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ যে-হিন্দুর দেশ, সে ঐ তথাকথিত সনাতনী হিন্দু নয়; কবির কাছে ভারতবর্ষজাত সংস্কৃতিবান লোক মাত্রেই সেই হিন্দু। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা তাঁর 'পরিচয়' গ্রন্থের 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে আছে। ধর্মের নামে সর্বত্র ধর্মতন্ত্রের অতিমাত্র প্রয়োগই হিন্দুর সামাজিক ক্ষতির কারণ। সে পরকে তেমন মারতে যায়নি বটে, মেরেছে যত তার নিজেকেই। তার স্বার্থবুদ্ধি তার জাত্যাভিমানের পথ ধ'রে সেই মরণকে এগিয়ে এনেছে।

বড়ো চারটি ধর্মের ক্ষেত্রেই দেখা গেল, সংসারের সঙ্গে ধর্মের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা আজকের দিনে নৈরাশ্যজনক। এই নিরাশার ছায়া মাঝে-মাঝে অনুভূতিপ্রবণ কবি-মনকেও আভভূত করেছে। কবির শেষদিনগুলিতে তিনি যখন বুঝেছেন, নিজের সময় নেই, তখন সাধনার জন্য প্রস্তুত হ'তে আহ্বান করেছেন আগামীকালের অনুবর্তীদের। রেখে গেছেন নানা বাণী। এরূপ একটি বাণী আছে "প্রান্তিক" কাব্যের শেষ কবিতায়।

প্রথম রোগশয্যার সংকটাবসানের পর। ১৩৪৪ সালের পৌষ মাস। মৃত্যুর দ্বার থেকে কবি ফিরে এসেছেন। ক'দিনের মধ্যেই একের পর এক তৈরী হয়ে উঠল কয়টি কবিতা; ব্যক্তিগত গভীর স্তরের কথা, মৃত্যু-পারের ইঙ্গিতময়। ছোট ছোট কবিতায় কাব্যের কোষগুলি জমাটবাঁধা। কিন্তু একখানা পুস্তকের পক্ষে কবিতার সংখ্যা নেহাত অল্প। পূর্বেকারও দু'একটি ঐ ধরনের কবিতা বইটিতে যোগ করা হল। সেগুলিতে বহির্মুখী ভাব ছিল। সমালোচকের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ল। কোনো-কোনো সাহিত্য-পত্রিকায় তার অসংগতি প্রদর্শিত হয়,—বিশেষত শেষ কবিতাটির উল্লেখ করে। কিন্তু সেই অসংগতির জন্য মূলে কবি দায়ী নন। সেদিনকার সেই চেতন-অচেতনের ছায়াটুকু ধ'রে আছে, "প্রান্তিক"। এইদিককার ইহলোক-প্রান্তের কথা বেশী বলা কবির ইচ্ছা ছিল না। বিশেষত শেষের ঐ কবিতা-কয়টিকে পুস্তকে স্থান-

লাভের মর্যাদা দিতে তাঁর সংকোচই ছিল। কিন্তু চাই আকার বাড়ানো। সামনে 'বড়দিন'-পর্ব। কবির বাণী-সমৃদ্ধ বইখানি বের করবার আগ্রহ লেখক ও প্রকাশক দুয়েরই প্রবল। কবির দপ্তরে তখন কাজ করতেন জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিক। বড়দিনের ছুটিতে তিনি বাড়ী যাবেন। কবিকে প্রণাম করতে গেলেন। তাঁর ছোটবোনের অটোগ্রাফ খাতায় কবির স্বাক্ষর সংগ্রহের চেষ্টাও তাঁর ছিল। কবি কথাবার্তার অবকাশের মধ্যে যে কবিতাটি তাঁকে সেদিন লিখে দিলেন, সেইটিই 'প্রান্তিকে'র উল্লিখিত শেষ-কবিতা। শেষ-কবিতাটিতে একটি বিশেষ প্রেরণা আছে, এবং অতি অল্পের মধ্যে সংসারের আধুনিক পরিস্থিতিটি মহৎ বেদনায় ও তেজে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে;—এইটি অটোগ্রাফের ভিড়ে তলিয়ে যাবার জিনিস নয়, কবিকে এ সবই বলা হল, এবং বসানো হল সেটি "প্রান্তিকে"। বই বেরবার পর থেকে ঐ কবিতাটি বাইরে বহুস্থলে উদ্ধৃত হয়। জনপ্রিয়তা দেখে 'চয়নিকা'তেও অতঃপর 'প্রান্তিকের' কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে নির্বাচন ক'রে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।

তখন যুদ্ধ চলছে। কবির মনে মানুষের দুর্গতির কথায় তখন তোলপাড় চলছিল। বড়দিন, শান্তির বাণীর দিন। বিশেষ এই দিনেই যখন বাণীটি বেরোয়, তখন তার পিছনের তাৎপর্যটি উপলব্ধির বিষয়। আজকের দিনে কোনো ধর্মই কি বাঁচাতে পারল মানুষকে তার দুর্গতি থেকে? দুর্দম রাষ্ট্র-বুদ্ধির উপর কোন প্রভাব তার খাটল?—এই বেদনাই ছিল সেদিন জিজ্ঞাসার মধ্যে একান্ত নিহিত। কবি এই অশান্তির মধ্যে থেকে ব'লে উঠলেন:

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে॥

দানবের ধর্মকে স্বীকার ক'রে শান্তি কাম্য নয়, তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে প্রকৃত ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠাই কবির কাম্য: ঘরে-ঘরে সে-যুদ্ধের নবীন সৈনিকদের স্থিতি কবি জেনে গিয়েছেন। আর, ঘরে-ঘরে তাঁর বাণী যে প্রাণে-প্রাণে বেজে

উঠেছে, এই বিশেষ কবিতাটির বহুস্থলে বহুল-উদ্ধৃতিই তার পরিচায়ক। বইখানিতে কবির বিশেষধারার কাব্য-গৌরবে সাহিত্যিক ত্রুটি ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু জনজীবনে এই মহৎ বাণীর যে সার্থকতা একদিন আশা করা গিয়েছিল, তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। নিরাশার মধ্যে আশাবাদী যোদ্ধার দলও আজ কম নয়। তারা নানা ধর্মেরই লোক। সত্যকে বাস্তবকে তারা দেখেছেন নূতন রূপে—চক্ষে তাঁদের নূতন আলো।

কোনো ধর্মের সঙ্গে অন্য কোনো ধর্মের তারতম্য করা কবির উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না। প্রত্যেকটি ধর্মে মহৎবাণী আছে, আবার ব্যবহারিক ত্রুটিও আছে। যে ব্যবহারিক ত্রুটিগুলি দিয়ে লোকে নিজের-নিজের সম্প্রদায়কে নিন্দিত ও ব্যর্থ করেছে, চোখে আঙুল দিয়ে কবি সকলকে সে-সব সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন ; অন্যদিকে আবার প্রত্যেক ধর্মেরই মহৎ প্রেরণার যে-আলোরেখাগুলি তিনি দেখিয়েছেন, সে আলোক নিয়ে সেই-সেই ধর্মের লোকেরা নিজেরা তো সার্থক হতেই পারে, পরধর্মের লোকেরাও সে-আলোকে সৎ-পথ চিনে নিয়ে চলতে সমর্থ হয়। এর পর দেখা যাক সেই সুমহৎ আলোর দিকটি।

জনসাধারণের জ্ঞান ও কাজের পরিধি বড়ো নয়। জীবন ও সমাজ তাঁদের খণ্ড-খণ্ড, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র। জীবনের বড়ো কথা তাদের কাছে পৌঁছয় মহাপুরুষদের জীবনী, পুরাণোপাখ্যান বা পূজা-পার্বণ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে এই তো আমাদের দেশীয় সমাজের ধারা। আজ দেশবিদেশের লোক আমাদের ঘরে এসে ভিড় করেছে। তাই কোনো একটা সমাজ নয়, মানব সমাজের উপযোগী বড়ো জীবনের এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড়ো-বড়ো তত্ত্বের কথা সাধারণের জানবার দরকার হয়ে পড়েছে। ১৩১২ সনে রবীন্দ্রনাথই প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন,—"আজকাল শিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে—একমাত্র পুরাণ কথার ভিতর দিয়া সকল প্রকার উপদেশ চালানো যায় না। অথচ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দলের মধ্যে ভেদ যদি যথাসম্ভব লোপ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় হয়, তবে যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যাহা লাভ করিবার উপায় তাহাদের নাই।" (ইতিহাস-কথা, ১৩১২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫২০)

রবীন্দ্রনাথের সাধনা, সংস্কৃতির সাধনা। সংস্কার পীড়িত মনের দ্বিধা দূর করবার জন্য এই সংস্কৃতির একান্ত প্রয়োজন। তাঁর বিশ্বভারতী সেই সংস্কৃতিরই

প্রচার-ক্ষেত্র। "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে সকলকে সংস্কৃতির সার কথা জানবার উদ্দেশ্যেই কবি তাঁর সাধনতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

মানুষের সাধনা ভুল-ত্রুটির স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে চলেছে। নীহারিকার যুগ থেকে মানবযুগে আসতে সৃষ্টির কত কল্পকল্পান্ত লেগেছে, কত কি ঘটে গেছে তার মধ্যে। আজ শুনি মানুষের যুগ থেকে দেবতার যুগে পৌঁছবার ডাক পড়েছে। সে যুগ কি দু'দিনেই দেখা দেবে?—আসবে, এই মানুষের সংসারেই সে-যুগও আসবে,—কিন্তু কেউ জানে না, কবে। সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে বিচার করলে নিরাশ হওয়ার কথা নয়। কবির গ্রন্থ "মানুষের ধর্ম" আশা-বাদীদের আলো যোগায়।

সমগ্র সৃষ্টিচক্রের মধ্যে কবি একটি পরম যোগতত্ত্ব দেখেছেন পরিব্যক্ত। "মানুষের ধর্মে" তিনি বল্‌ছেন,—"জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায়, তারপর জন্তুতে, তারপর মানুষে। বাহিরের থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল, যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়, দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে।" এই 'পরম ঐক্য'রূপী সমগ্র বিশ্বমানবিক সত্তাকেই রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেছেন 'নরদেবতা' বা 'মহামানব' ব'লে।

জীবনব্যবস্থা-তন্ত্রকে ত্রুটিবিহীন ক'রে নিয়ে মানুষকেই ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠতে হবে সেই দেবতা। এই দেব-আদর্শের ইঙ্গিত বহন ক'রে চলেছে মানুষেরই ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মে সেই দিব্য গৌরব আরোপ করেছেন। মানুষের এই ধর্ম পৃথিবীর বড়ো চারটি ধর্মের মূল প্রেরণাতে নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্মকে সমন্বিত ক'রে দেখবার একটি দৃষ্টি দিয়েছেন মাত্র। তিনি 'প্রফেট্' হতে চাননি।

> "শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
> আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।" (পরিশেষ)

মানুষের সঙ্গে যোগের সাধনাই হল এই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার উপায়। সেজন্য একটি মন্ত্রের সাধনা করতে হবে সকল ভাবে ও কর্মে। সেই মন্ত্র হচ্ছে—"সোঽহং"।

"আমার মন আর বিশ্ব-মন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোঽহং।"

পূর্বে তাঁকে সোঽহং-তাত্ত্বিক বলা হয়েছে। কিন্তু জানা চাই; প্রচলিত মতে তিনি তা নন। আজীবন তিনি পৈতৃক ধর্মসূত্রে উপনিষদ্‌পন্থী। যদিও তাঁর "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে আধ্যাত্মিক আলোচনাই আগাগোড়া মুখ্য হয়ে চলেছে—কিন্তু তাতে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সাধারণ-প্রথা প্রাধান্য পায়নি,—চিন্তা ও যুক্তির সঙ্গে সহজ ভঙ্গিতেই তিনি তাঁর উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। তবু যদি সে-মতকে দার্শনিকের মতের কোঠায় ফেলতেই হয়, তবে টেনে বুনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কাছাকাছি যাবে হয়তো। কেননা, "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"-এর উপাসকের কাছে পরম সত্তা নির্গুণ নন, নিরুপাধিকও নন, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কবি নিজেই 'নরদেবতা' প্রবন্ধে বলেছেন,—"নির্গুণ সত্তা বলে যদি কোনো পদার্থ থাকা সম্ভব হয় তবে তার প্রতি প্রেমের কোনো অর্থ নেই। মানবিক গুণের পরমতা যাঁর গুণে, মানুষ তাকেই এমন প্রেম দিতে পারে যা সকল প্রেমের উপরে।"

তবেই দাঁড়াচ্ছে, কবির 'সোঽহং' বিচ্ছিন্ন গুণও নয়, নির্গুণও নয়, যে অনাদিগুণময় অশেষ হয়ে আছেন, গুণ দিয়ে যাঁর সত্তা জানি, কিন্তু গুণের পরিচয়ে যাঁর শেষ পাইনে, এমন এক পরম সত্তা হচ্ছে—'সোঽহং'। আমি মানুষ, আমার মানবিক আত্মা দিয়েই তাঁকে জানতে পাই—আত্মায়-আত্মায়। শুধু আমার যুক্তিতে নয়, তাঁকে জানি আমার বেদানাতেও। যতক্ষণ তাঁকে আমার জানতে হবে, অর্থাৎ আমারি আমাকে পূর্ণ ক'রে আমি না পাচ্ছি, ততক্ষণ এই জানা বা পাওয়ার একটি দ্বৈত চেতনার খেলা আমার সঙ্গে চলবে চিরদিনই। তাতেই এক আমিকে অনেকরূপে দেখাও আমার ফুরাবে না। নিখিল বিশ্বসত্তার অদ্বৈত ততক্ষণ দ্বৈতরূপে নিজেই নিজের বেদ্য হয়ে আছে। মানুষ দেখতে পাচ্ছে,—"চারিদিকের বস্তু তার প্রত্যক্ষ, কিন্তু যে মনের কাছে সেই বস্তু গোচর হচ্ছে সে নিজে অগোচর" ('নরদেবতা')। নিজের মনরূপী এই দ্বিতীয় সত্তাকে একই কালে নিজের মধ্যে অপ্রত্যক্ষ দেখেও যখন নিজের মধ্যেই আবার তাকে মানুষ অনুভব করছে, তখন অনন্তকে অবিশ্বাস করার তো কোনো হেতু মেলে না। তাই রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন আধ্যাত্মিক সাধনায় অরূপের পূজারী।

কবির 'সোঽহং তত্ত্বে'র মধ্যে জগতের প্রায় সকল বড়ো ধর্মেরই মূল সাধনার মহৎ দিকের যে সমন্বয় ঘটেছে, কবির উক্তি থেকে সে-কথা বোঝা যায়। বলেছেন,—"একদিন যিশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন 'সোঽহং'।

অহং সীমাকে ছাড়িয়ে পরম মানবের সঙ্গে তিনি আপন অভেদ দেখেছিলেন।

"সেই মানব-দেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন ব'লেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন,—মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় ক'রেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।"

মুসলমানধর্মে ঈশ্বর ও সৃষ্টিতত্ত্বের কথা যাই-ই থাক্ কবির এই 'সোঽহং' তত্ত্বের মূল কথা,—অর্থাৎ মানুষের মিলন-তত্ত্বটি,—তার বিরোধী নয়। বরঞ্চ ঈশ্বর হ'তে সঞ্জাত জীবদের সেবার কথায় ইসলামের সঙ্গে এ-তত্ত্বে মিলনই রয়েছে। মুসলমানধর্ম সম্বন্ধে কবির বেশি উক্তি নেই, সে কথা সত্য; কিন্তু যেটুকু আছে তার মধ্য দিয়ে দেখা যায়, ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে কবির জানা মুসলমানধর্মেও সেই মিলের পরিচয় কবি পেয়েছেন। "কালান্তর" গ্রন্থে 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধটিতে তিনি লিখেছেন, মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেই সময়ে ধারাবাহিকভাবে সাধু-সাধকদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিলেন—যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্ম-বিরোধের মধ্যে সেতু বন্ধন করতে বসেছিলেন। তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিক্যাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য ব'লে কল্পনাও করেননি।···কিন্তু আজো ভারতের প্রাণস্রোতের মধ্যে সেই সকল সাধকদের অমরবাণীধারা প্রবাহিত আছে। সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তাহলে তারি জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।"

"মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অনেকস্থলেই হিন্দুশাস্ত্র থেকে সোঽহংবাদের বাণী ব্যবহার করেছেন,—আবার সেই শাস্ত্রমানা সমাজকে,—তাঁরই আপন লোকদের প্রতি স্থানে-স্থানে অমানুষিক ব্যবহারের উল্লেখ ক'রে,—ধিক্কারের সহিত বলেছেন,—"আমাদের দেশে এমন আত্মাবমাননার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, সোঽহং তত্ত্ব সকলের নয়, কেবল তাঁদেরই যাঁরা ক্ষণজন্মা। এই ব'লে মানুষের অধিকারকে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টভেদে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিশ্চেষ্ট নিকৃষ্টতাকে আরাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে যাদের অন্ত্যজ বলা হয় তারা যেমন নিজের হেয়তাকে নিশ্চল ক'রে রাখতে কুণ্ঠিত হয় না; তেমনি এদেশে অগণ্য মানুষ আপন কনিষ্ঠ অধিকার নিঃসংকোচে মেনে নিয়ে মূঢ়তাকে, চিত্তের ব্যবহারের দীনতাকে, বিচিত্র আকারে প্রকাশ করতে বাধা পায় না। কিন্তু

মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহম্, এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যই আমরা মানুষ। আমাদের একজনেরও অগৌরব সকল মানুষের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে।"

ত্যাগের পথ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সে-ত্যাগ আনুষ্ঠানিক সংসার-ত্যাগ নয়, সংসারে থেকেই সংসারের জন্য আত্মত্যাগ। আর, সেই সঙ্গেই ভোগের পথটাকেও মিলিয়ে নিয়েছেন তাঁর সর্বজনমুখী বড়ো পথে। বলেছেন,—"জনসংঘের শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র।...রাষ্ট্রের প্রশস্তভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে। আপনার মাধ্য সে ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের, সমস্তজাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হলে ইতিহাসে ধিক্কৃত হয়। সকলের মাঝখানে সকল কালের সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে না আমি আছি আমাব মহিমায়, আমি কেবল আজকের দিনের জন্যে নয়, যার আত্মঘোষণা ভাবীকালের তোরণে তোরণে ধ্বনিত হতে থাকবে।"

পৃথিবীতে যত ভোগের দিকে আছে, তার সবক'টি দিকেই সংযত সুশৃঙ্খল নিয়মে সকলে যাতে এগিয়ে যেতে পারে, রাষ্ট্রকে অবলম্বন ক'বে তারই সাধনা চলবে প্রত্যেক ব্যক্তির। এখানে বাস্তবকে পুরোপুরি স্বীকার করা হচ্ছে। বস্তুবাদী আধুনিক যুগের ঝোঁকও হচ্ছে সেইদিকে। কবি যুগের সঙ্গে প্রগতিপন্থী।

অর্থ, খ্যাতি প্রভৃতি চাওয়াটাকেও কবি অন্যায় বলেননি। বরং এক হিসাবে এ-সকলেরও একটি মহৎ সার্থকতার রূপ দেখিয়ে তিনি তাঁর "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" রচনাতে বলেছেন,—"আমরা ধন চাই, কারণ এক ধনের মধ্যে ছোটবড়ো বহুতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেইজন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথকরূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়, খ্যাতি যাহার নাই সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে, কারণ, মানুষের সীমা সেখানেই।....পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে।"

জীবনকে দেখবার কথায়, বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রে আরো জোরের সঙ্গে কবি "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে বলেছেন,—"যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও। এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত, আমার মন সে-সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না ক'রে আপনার মধ্যেই সে মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে-কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানব-বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার কল্পনা মানব-কল্পনা। তাঁকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানব-চিত্ত কখনোই ছাড়তে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত ক'রে যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ হলুম কেন?"—এস্থলেই কবি উঠে গেছেন দেশ, জাতি, ধর্ম-বিশ্বাস, এবং যা-কিছু মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে, সে-সমস্তের উপরে।

আরো কয়েকটি কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—তাও খুব জোরের কথা এবং তা সকল মানুষেরই কথা হতে পারে: "মুক্তি কোনোক্রমেই একার জন্য নহে। আমি যেমন সকলকে নিয়ে, মুক্তি তেমনি সকলের জন্য চাই, সকলের মুক্তিতেই মাত্র আমার মুক্তি।" বলেছেন,—"মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটি মাত্র বিন্দুতে সংহৃত ক'রে নিশ্চল করলে হয়তো তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু ততঃ কিম্, কী হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানব-সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে ততক্ষণ কোনো-একটি মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না।" এমন কি, ব্যক্তিগত মুক্তি-চেষ্টাকে এখানে-সেখানে বারংবার স্পষ্ট ভাষায় ধিক্কৃত করেই কবি বলেছেন,—"সোঽহং মাত্র মুখে আউড়িয়ে তুমি দুরাশা করো কর্ম থেকে ছুটি নিতে! সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে! যে ভীরু চোখ বুজে মনে করে

পালিয়েছি সে কি সত্যই পালিয়েছে। সোঽহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক, যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি মুক্ত হতেন তা হলে একজন মানুষের জন্য-ও তিনি কিছুই করতেন না। দীর্ঘজীবন ধরে তাঁর তো কর্মের অন্ত ছিল না। দৈহিক প্রাণ নিয়ে তিনি যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তা হলে আজ পর্যন্তই তাঁকে কাজ করতে হত সকলের চেয়ে বেশি, কেন না যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশ্বকর্মা।”

রবীন্দ্রনাথ নিজের হিন্দুত্ব ছাড়েন নি, কাউকে আপন ধর্ম ছাড়তে বলেনও নি। ‘পরিচয়’ গ্রন্থের ‘আত্মপরিচয়’ প্রবন্ধে বলেছেন,—“হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে।....যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করতে আসে না, নিজের পদ রক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় এ কথা কখনই শ্রদ্ধেয় হ’তে পারে না।” স্বতন্ত্রও থাকা হবে অথচ এক-ও হতে হবে ;—মনে হতে পারে, তবে এ সমস্যার সমাধান কোথায়? ভাষা, পোশাক, অনুষ্ঠান,—এ সব বাইরের জিনিস। যতই তা নিয়ে লোক ভিন্ন থাক্, প্রাণের টান প্রাণের দিকে অব্যাহত থাকাটাই বড়ো কথা। তাহলেই সব ভিন্নতার মধ্যে একজায়গায় একটি সজীব ঐক্য সূত্র গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রাণের সেই বিপুল প্রেরণাতেই সকলের মধ্যে স্থানলাভ করতে পেরেছিলেন। সেইভাবেই লোকের স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ রেখে মিলনের আয়োজন করেছেন তাঁর শান্তিনিকেতনে।

শান্তিনিকেতনে সর্বধর্মের মহাতিথিগুলি উদ্‌যাপিত হয়। মন্দিরের সমবেত অনুষ্ঠানে প্রতি ধর্মের উদার বাণীর আলোচনা একরূপ নিয়মিত ঘটনা। আশ্রমের মধ্যে প্রতি ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের সঙ্গে কবির যেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেখানে এক-একটি ধর্মের লোকদের পরস্পরের মধ্যেও তেমনি যোগ ঘটেছিল।

এই পথেই কবি সর্বধর্মের লোকদের অনুষ্ঠানের চেয়ে “জ্ঞানে”র দিকেই বেশি মন দিতে বলেছেন। অনুষ্ঠান যেই যা করুক আর না করুক, জ্ঞানটাকে

রাখা চাই নির্মল। তিনি বলছেন,—"ভূমা আহারে-বিহারে আচারে-বিচারে ভোগে-নৈবেদ্যে মন্ত্রে-তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে, অনুষ্ঠানে, পূজোপচারে, শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ, কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা।"

কঠিন হলেও এই সাধনাই সকলকে করতে হবে। এইটি সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মেরই বাহ্যিক আচার-আচরণের অন্তস্তলের সত্য কথা। সকল ধর্মের সমন্বয়ের দ্বার খোলা এই পথে।

এই উদার পথেরই সূচনা রয়েছে কবির বহু পূর্বের রচনা "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা"-তে (১৩১৮)। তাতে তিনি উর্ধ্বতনশীল অখণ্ড ভারতের পরিচয় দান করেছিলেন। কোনো গতি-বিমুখ খণ্ড ভারতের "বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার" কথাকে বড়ো ক'রে দেখেননি। সেদিন তিনি বলেছিলেন,—"আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না, তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে।...আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার-ভাঁটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে।... স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্য-রূপে পাওয়া যায়;—এই কথা নিশ্চিত রূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে-যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া, আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।" দেশ-কাল-পাত্রকে "বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে" পাওয়ার সুযোগ তাঁর আরও যখন হয়, সেদিনকার কথা তাঁর দেশকালকে ছাড়িয়ে উঠেছে এক অখণ্ড বিশ্ববোধের মহোচ্চ অবস্থায়। কবির শেষজীবনের সেই অবস্থাটাই 'সোঽহং' অনুভূতির।

তত্ত্বের আলোচনা মাত্র যথেষ্ট নয়। জীবনের মধ্যে তার উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠাও আবশ্যক;—কবির জীবনে তাঁর সাধনায় তা আমরা দেখতে পাই।

ইহলোকের সীমাতেই যারা সংসারের বা জীবনের শেষ দেখে, দেখা যায় যেন-তেন-প্রকারেন বেপরোয়া বাস্তব অধিকার তাদের কারো-কারো জীবনের

লক্ষ্য হয়ে উঠতে বড়ো একটা বাধা পায় না। কারণ, বস্তু ছাড়া আর কিছুই তারা অধিকারের বিষয় ব'লে দেখে না। আপন কর্মফলের দূর প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া, কিংবা অপরের সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা তাদের সীমাবদ্ধ চিন্তার কাছে অবান্তর হয়ে থাকে। অদৃশ্য প্রাণ বেদনা, বা ইচ্ছাঅনিচ্ছাশক্তির মূল্য দিতে তারা পরাঙ্মুখ হয়, কারণ, সে-সবের মর্ম তাদের গোচরে থাকে না। প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে বাঁধা পড়ে এইখানেই মন তাদের জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সংসারে বিপত্তি ঘটায়। নিজের রুচি ও কামনা-ভাবনার গণ্ডি ছাড়া মন আর পরের দিকে এগোয় না। এই ক'রে লোকে ধর্মেও যখন বিশেষ মূর্তি, দেবতা, গুরু, দল বা সম্প্রদায়ের বাঁধা ভক্ত হয়ে ওঠে তখন তারা নিজের সেই প্রিয়ের সন্তোষ বিধান ছাড়া অন্য কোনো মূর্তি, দেবতা, গুরু, দল ব' সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রায় সহ্য করতে পারে না।

এই পরিণতি থেকেই ধর্ম-কর্ম ও সমাজের শিক্ষাদীক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর প্রগতিশীল 'সোঽহং' বাদে দেখতে পাই সীমা-মেনেও সীমা-পেরোনোতেই সাধনার পরম সার্থকতা।

মানুষ তাব মনন ও কর্ম দ্বারা জ্ঞানে ও বাস্তবে পেয়েছে সৃষ্টির অনেক-কিছুকে। এমন কি, ঈশ্বর এবং শয়তান এসবই মানুষের ধারণায় এসেছে তার জীবনায়নের প্রচেষ্টাসূত্রে জড়িয়ে। কিন্তু এ-সবের আসার পর, মানুষ নিজেদের থেকে তাদের পৃথক ক'রে দেখতে লাগল তাদের প্রতি নিজেদেরই কল্পিত একটা কৃত্রিম উঁচু কি নীচু মান আরোপ ক'রে নিয়ে। নিজের সঙ্গে নিজের সৃষ্টির তফাত করা, নিজেকে এবং নিজেদের জাতের পরস্পরের মধ্যে তাই নিয়ে পবিত্র-অপবিত্রের ভাগ করা এসব ভেদসৃষ্টির কৃত্রিমতা এসেছে এমনি ক'রেই নানা পৌরাণিক ও পৌত্তলিক ধর্মে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের সঙ্গে মানুষের সৃষ্টিকে, অর্থাৎ মানবীয় অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বিষয় সকলকে এক পরমার্থে এক মানে (Standard-এ) সুসম্বদ্ধ দেখেছেন। তাঁর উপলব্ধির কার্যকরী বাস্তব প্রমাণ আছে তাঁর প্রবর্তিত উৎসবাদিতে। সেগুলি দৈবী মানের অপেক্ষা ইহলৌকিক সাধারণ মানের বিষয়। এবং নানা বিষয়কে মানবীকরণের সেগুলি এক-একটি সুন্দর নিদর্শন। পূজা-অর্চনার কথা নয়। শিল্পসৃষ্টি ও মানবের সঙ্গে মানবের যে যোগ সেই যোগের উপলক্ষে শিক্ষা ও আনন্দ সম্ভোগই তার উদ্দেশ্য। পুণ্যের চেয়ে তার মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে নূতন-নূতন লাভের মধ্য দিয়ে বহুর মধ্যে হৃদ্যতা।

মা-ঠাকুরমার মুখে পৌরাণিক কাহিনীতে শোনা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মালেন, তখন তাঁর চার হাত দেখা গেল। কিন্তু তাঁর মা তা দেখে খুশী হলেন না। তিনি ভগবানকে দু' হাতের মানুষরূপেই দেখতে চাইলেন। সংসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ঘটল সেই থেকে দু' হাত নিয়ে।

কাহিনীটিতে রবীন্দ্রনাথের 'মানব-ধর্মে'র মূল তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি চমৎকার ইঙ্গিত মেলে। যা-কিছুকে দৈবী কিংবা দানবীয় শক্তি ব'লে লোকে বলে থাকে, তাও সব মানুষের মধ্যে দিয়েই মানুষের সংসারে প্রকাশমান হয়ে বিচার লাভ করে। সংসারের সহজ দৃষ্টি ও সহজ মূল্য ছাড়া বিষয়কে অন্যরূপে অন্য মূল্য আরোপ ক'রে দেখা কৃত্রিমতা মাত্র। তাতে সংসারে জটিলতা ও বাদবিসম্বাদ বাড়ায়, অশান্তির সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই দেখার কোনো সার্থকতা নেই। তিনি সহজ মানুষের দৃষ্টি দিয়েই সংসারকে দেখেছেন। এইটুকুই সেই দৃষ্টির বা দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

দল বেঁধে কবি নূতন আরেকটা ধর্ম গড়তে বসেননি, নূতন-ধর্মগড়ার কথা কাউকে বলেনওনি। যে-ভাবে সংসার চলছে, তার সমাজ, রাষ্ট্র, নানা সংঘ সমিতি,—যে-দলের হয়েই লোকে চলুক না কেন,—কবির উদার প্রেরণাগুলি নিয়ে চলতে কেউ আপন ধর্মে বাধা পাবে না, বরং তাতেই ধর্ম তার কাছে আরো উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। মূল ভাবটি দৃঢ় নিষ্ঠায় মনে ধ'রে রাখতে পারলে, ব্যবহারও আপনি সহজ হয়ে আসবে এরূপ সম্ভাবনা আছে।

রবীন্দ্রনাথের সকল গভীর ভাবের বিকাশ ঘটেছে তাঁর গানে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম, সেকাল একাল, বনেদী সাধারণ,—কোনো কিছুকেই কবি যথাস্থানে যথামূল্যে স্বীকার করতে ভোলেননি। কিন্তু আকাশ, মেঘ, বায়ু, মাটি, পাথর, বালি, সব থেকে রস-সার গ্রহণ ক'রে কবির ভাব-সমৃদ্ধি সব চেয়ে বেশি স্থান জুড়েছে তাঁর গানগুলিতে। তাই হয়ে থাকে। এ-দেশে সাধকদের সাধনতত্ত্ব কাব্য এবং গানের ভিতর দিয়েই মন থেকে মনে সঞ্চারিত হয়ে আসছে। সেখানে কোনো যুক্তি তর্কের অপেক্ষা নেই, অন্তরের মধ্যে গভীর তত্ত্বকথার সাড়া আপনি অনুভূত হচ্ছে। কবির অজস্র গান আছে,—লোকধর্মের বাহন হয়ে। কত গভীরে প্রবেশ ক'রে কেমন ক'রে যে দূরদূরান্তে সমাজের ভিতর অলক্ষ্যে সেগুলি কাজ ক'রে চলেছে, সবসময় তার সব খবর কি মেলে।

একটি ঘটনা বলি। শান্তিনিকেতন আশ্রমেরই একটি ছাত্রী। ছোট বেলাও কাটিয়েছে কবির আশ্রমেই। শারীরিক অসুস্থতায় মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছেদ পড়ত পড়াশুনায়। দেশে চলে যেত স্থান বদলের জন্য। একবার এরূপ সে দেশে নিজের বাড়িতে আছে, রোগ সারছে না,—কলেজের পরীক্ষাও আসন্ন। ওদিকে দুর্ভোগের বিভীষিকায় মন উঠেছে অশান্ত হয়ে। তবু ডাক্তারির বাঁধা পথের বাইরে তার বিশ্বাস নেই। সেই সময় বাড়ীতে ছিলেন এক প্রবীণ আত্মীয়া,—সম্পর্কে ঠান্‌দি। সান্ত্বনার ছলে তিনি শোনাতেন নানা গল্প। নিজে তিনি বহুদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছিলেন, কিন্তু শেষে সেরে উঠেছিলেন। তাই মেয়েটিকে মনে আশা রাখতে বলতেন। সেই সান্ত্বনা দিতে দিতেই এক দিন বললেন, দিদি, তোমাকে আমরা আর কী বলতে পারি। যাঁর আশ্রয়ে তুমি আছ, তাঁর কথার পরে কি আর কথা আছে? তাঁর গানে যা পেয়েছি একদিন, অমন আর কিছুতে পাইনি।

এই ব'লেই তিনি বলতে লাগলেন সেই-একদিনকার কথা। তখন তাঁরা ধুবড়িতে থাকেন। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের মৃত্যুকাল উপস্থিত। গভীর রাত্রি। গীতা ভাগবৎ পাঠ হচ্ছে। ক্রমে মুমূর্ষুর নাভিশ্বাস দেখা দিল। সারা গায়ে তার চলছে তখন তোলপাড়,—ঘাম আর কাঁপুনি। মৃত্যুর বিভীষিকা ঘিরে এসেছে। সবাই স্তব্ধ হয়ে ব'সে। দলের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় এক সাধু-স্বভাব জ্ঞানী ব্যক্তি—সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। এতক্ষণ ভাগবৎ পাঠ করছিলেন,—সময় যখন ঘনিয়ে এল, ধীরে ধীরে ভাগবৎ বন্ধ করলেন, মৃদুস্বরে গাইতে লাগলেন—

> যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি,
> ঝড় এসেছে ওরে এবার ঝড়কে পেলাম সাথী।

বার-বার গানটি গাইলেন। কারো মৃত্যু শুনলেই আমার সেদিনের সে গান মনে পড়ে।

রক্ষণশীলদের মধ্যেও কবির গানই সেদিন পাথেয় হলো শেষ যাত্রায়।

কিন্তু কবির গান, সে তো কেবল মরণের গান নয়। মনে পড়ে আর-একদিনকার দৃশ্য। ১৩৫৫ সন। উত্তরায়ণের পিছনের বারান্দায়, সময়,— সান্ধ্যবিনোদন পর্ব। মহড়া চলছে—"গীতোৎসবে"র। কলকাতায় সাধারণের জন্য অনুষ্ঠান হবে। রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন আসরের সম্মুখে। একটার পর একটা ক'রে গান ও আবৃত্তির অভ্যাস হয়ে চলেছে। কোনো-কোনো গানের

সঙ্গে নাচও আছে। এটি নাচের প্রথম দিকের কথা। মাদ্রাজ থেকে এসেছেন আশ্রমের নৃত্যকুশল প্রাক্তন ছাত্র বাসুদেব। নৃত্য যেন মূর্ত তার সবল সুঠাম অঙ্গে। তারি নাচের সঙ্গে সেদিন উৎসবের গান ছিল এই—"যেতে যেতে একলা পথে।" সমবেত কণ্ঠে সেটি গীত হচ্ছিল। নাচে কোনো বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় ভঙ্গি ছিলো না। বাসুদেব নৃত্যচ্ছন্দে অভিব্যক্তি দিয়ে যাচ্ছিলেন সর্বঅঙ্গে। বাজ-বিজুলির চিক্‌মিকিতে রেখাগুলি নিকষে কনক-রেখার মতো ফুটে উঠছিল তার অঙ্গুলিগুলির লীলাচঞ্চল সঞ্চালনে। গানে জোর দেওয়ার জন্য থেকে-থেকে কবি উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠছিলেন সবার সঙ্গে। আর উৎসাহ দিচ্ছিলেন নর্তককে। ঘোর অন্ধকার; ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রি ; দুর্গমপথে পথিকের একা যাত্রা ; কেশেবেশে তার প্রলয়ের মাতামাতি,—বজ্ররবে তারি মধ্যেই ডাক আসছে প্রভাতের কোন্ আলোকোজ্জ্বল কূল থেকে। জীবন-রসিক কবির কাছে সেই উপলব্ধিটিই সেদিন নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে উৎসবের বিষয় হয়েছিল। বাসুদেবের সঙ্গে-সঙ্গে কবিরও সর্বাঙ্গ নৃত্যে পুলকিত হয়ে উঠছিল। জীবনমরণের সব তত্ত্ব সত্য হয়ে উঠেছিল সেই সন্ধ্যার মুহূর্তে আমাদের সামনেকার সেই রবীন্দ্রনাথে।

যুগ-উদ্দীপনায়

১

জন্মের মুহূর্তে অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন আমরা প্রথম আলোর স্পর্শ পাই—তখন আমাদের মাতৃদেহের যোগ ছাড়তে হয়। এমন কি, নাড়ির বন্ধনও কাটা পড়ে। তখন থেকে আমরা জীব। ক্রমে আমাদের চলাফেরা স্বাধীন হয়। (পরিণত হয়ে উঠি, পৃথক সংসারও-বা পাতি।) স্পষ্টই চলতে থাকে এই বিয়োগের ধারা। পাড়া-প্রতিবেশী জোটে। দেখা দেয়, সমাজ, দেশ, জাতি। বিশ্বসভার যোগাযাগেও আমাদের পেয়ে বসে। এর মধ্যে একদিকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলি, অন্যদিকে যোগের কাজও চলে। এ থেকে দেখতে পাওয়া যায় একটা সত্য,—জীবন কেবল যোগেরও নয়, বিয়োগেরও নয়,—সে হচ্ছে দুয়েরই যোগাযোগের জাল বোনা। সমাজ সংসার সবই এই দুই ধারার সমন্বয়।

জীবন-প্রসারের মূলসূত্র হচ্ছে এই সমন্বয়। কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও যথাস্থানে সুষ্ঠুভাবে বিচিত্র বিষয়ের সংস্থানের উপরেই গড়ে ওঠে যত সমৃদ্ধি। এরূপ সংস্থান বা সমন্বয়ের সূচনা যাঁরা ক'রে থাকেন, তাঁরা মানুষের চিরসুহৃদ্, তাঁরা এক-একজন যুগ-নায়ক।

এ যুগের ধর্ম-কর্ম সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সমন্বয়ের সূত্র স্থাপন ক'রে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর আগের ইতিহাসের ভূমিকা অন্ততঃ একটু জানা দরকার। সেখানে শতাব্দীর শুরুতে পাই আমরা রাজা রামমোহন রায়কে; যুগান্তরের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

একটি ছবি মনে পড়ে। ঊর্ধ্ব-হিমগিরি ভেদ ক'রে গঙ্গোত্রী ভীমবেগে ঝরে পড়ছে মর্ত্যে। নিম্নে শিলাতলে দাঁড়িয়ে আছেন জটাজুটবিলম্বিত এক মহাকায় পুরুষ; দৃঢ়পদ দুটি প্রসারিত, স্ফীত বক্ষস্থলে সম্বদ্ধ দুই বাহু। প্রচণ্ড ধারাপাতকে শীর্ষে ধ'রে সে পুরুষ ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন পৃথ্বীতল; সেই সঙ্গেই ছিটকে-পড়া জলস্রোত চারিদিকে বয়ে যাচ্ছে সহজবেগে। পূত গঙ্গোদক ধরণীকে দিকে দিকে ক'রে তুলছে শ্যামা শস্যময়ী স্নিগ্ধা তৃষ্ণাহরা। অন্নপূর্ণা ক'রে তুলছে প্রাণ বিতরণে। যা মৃত্যুঘাত বয়ে এসেছিল, সমন্বয়ের গুণে তাই হয়ে উঠল সঞ্জীবনী সুধা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনও একদিন ভারতে এই গঙ্গাবতরণের কাজটিই করেছিলেন। পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সংস্কৃতি ধারার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া-বেগের মুখে ভারতকে বাঁচিয়েছিলেন তিনিই। খ্রীষ্টান সভ্যতাকে সহনীয় রূপ দিয়ে গ্রহণীয় করেছিলেন এই মনীষী। দেশের সংস্কৃতির মান রক্ষা করেছিলেন আপৎকালে "অর্দ্ধং ত্যজতি" দ্বারা। বৈদেশিক ধারাটির বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাকে স্বীকার করেছিলেন দেশীয় ঐতিহ্যধারার ভিত্তিতে। তাঁর এই দানের কথাই বেশী পরিচিত। কিন্তু রাজার মহত্ত্ব নিহিত আছে আরেকটি ব্যাপারে। সে-কথা বড়ো বেশি শুনা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাজ সেই বিষয়টির উপর একালে আলো ফেলেছে।

সুদূর গহন হিমাচল প্রদেশেরই মতো নিভৃতে কালের গোমুখীতে দাঁড়িয়ে রাজা তুলেছিলেন একটি প্রশ্ন—ধর্ম ঈশ্বরের, রাজনীতি কি শয়তানের? (দ্রঃ নগেন্দ্রনাথ·চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত" পৃঃ ৪০৮)

রাজার জীবনই এই প্রশ্নের জীবন্ত ভাষা—এই একটি কথার চাবিকাঠি দ্বারা রামমোহন সেকালে-একালে এবং কালে-কালেরও চিরন্তন সমন্বয়ের পথ খুলে দিয়ে গেছেন।

ছবির পুরুষটির দৃষ্টি ছিল আকাশে, রামমোহনের দৃষ্টিতে মাটিও মিলেছিল। আকাশে এবং মাটিতে দৃষ্টির সেতুবন্ধ হলে তবে জীবনের হদিস মেলে। জীবনে প্রতি পদে, প্রত্যেক চিন্তায়, বাক্যে, আচারণের মধ্যে রয়েছে ধর্ম। শুধু ঠাকুরঘরের নয়, হাটে বাজারের, ঘরে বাইরের সকল কাজই ধর্ম। রামমোহনের প্রশ্নের দ্বারা, আমাদের জীবনের মূল্য বেড়েছে। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ছাড়িয়েও ধর্মের এলাকা ছড়িয়ে পড়েছে পথে ঘাটে। রাজনীতিও ধর্ম। কূট চালও ধর্ম। যা-কিছু ঘটছে ধর্মের সূত্রে সমন্বিত তার প্রত্যেকটি অঙ্গ। চুরি, ডাকাতি, বদমাইশি, লুঠতরাজ, খুনখারাবি—যে সব কাজকে জঘন্য ও ঘৃণ্য ব'লে আসছি, নাম দিয়েছি অধর্ম,—তারও সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিচার ক'রে দেখার প্রশ্ন উঠল। এমন কিছু কারণ ভিতরে ভিতরে কাজ করছে, যাতে ঘটনাগুলি ঐরূপ এক-একটা দুর্ঘটনার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফল তার অনিষ্টকর সন্দেহ নেই। সে ফল কেউ চায় না; কারোই তা কাম্য হতে পারে না। কিন্তু ধিক্কার দেওয়ার আগে প্রশ্নেরও উত্তর চাই—কেন এমন ঘটল?

ধর্মের গতি সূক্ষ্ম। আমরা যা বুঝতে না পারি, তাকে না বোঝার জন্যই

সময়ে-সময়ে যেমন তাকে পূজাও করি, তেমনি সময়ে-সময়ে অনাদরে আঘাত করতেও কাতর হইনে। কিন্তু সূক্ষ্ম গতিকে বোঝাই চাই,—ধর্মেরই এই বিধান। বোঝার ঝক্কিটুকু পোহাতে যদি পেছপা' না হই, তবে অনেক স্থলে এগিয়ে দেখব, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে;—জটিল থেকে জটিলতর নীতির জট। খসাতে গিয়ে গলদঘর্ম। কিন্তু জট খসাতেই হবে। না খসিয়ে রেহাই নেই। গোঁজামিল দিলে আরো বড়ো অধর্ম এসে চেপে ধরবে।

শয়তানও সৃষ্টির এক মূর্তি। কিন্তু তার থাকাটাকে ধর্মের বালাই ব'লে চোখ বুজে থেকে না-থাকা করা যাবে না। রাতের অন্ধকারের পরেই দিনের আলোর খেলা চিরদিন চলছে। আলো আমরা চাই। অন্ধকারও যে কখনো চাই না, এমন নয়। কবি অন্ধকারের কবিতা লিখে বন্দনায় বলেছেন—

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার, নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।

—পূরবী, অন্ধকার

বলেছেন—

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।

—গীতালি

এ আলোচনার সূত্রপাতেই যে সূত্রটি রয়েছে তাতেই দেখা যায়, যৌন-যোগ থেকে এই সৃষ্টির শুরু। কিন্তু তার বাড়াবাড়ি বা অসময়ের অপব্যবহার থেকেই যত অনিষ্টের সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানকালপাত্রের দিক দিয়ে এবং আর্থিক, স্বাস্থ্যিক ও সামাজিক পরিবেশের সব দিক দিয়ে সমন্বিত করে যদি এই যৌন-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলা যায়,—তবে তার থেকেই আবার সুখ-স্বাস্থ্য, ধন-জন-সম্পদ সব লাভ করা হয় সম্ভব।

হিংসা, বিবাদ, চুরি, ডাকাতি অধর্মের অন্ধকারে দিক ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে ভরসার এইটুকু যে, উষার আলোকরেখাও দেখা দিচ্ছে জন-চেতনার ক্ষেত্রে। প্রবল হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যেই জাগছে প্রশ্ন—কেন এমন হয়?—কারণ দেখো। এবং সমাধান যা তাই করো। দুঃখ সইতেও আমরা রাজি আছি যদি দেখি যে, সমাধানের চেষ্টায় সত্যি ক'রে লাগা হয়েছে।

ধর্মধারিগণ প্রচলিত ধারায় ধমক দিয়ে পিছু ধাওয়া ক'রে আর সুবিধে করতে পাচ্ছেন না। এই হচ্ছে হালের চাল। অবুঝ ছোটদের দৌরাত্ম্য। কিন্তু দায়িত্বহীনতার দায় থেকে বড়োরাও বাদ যাচ্ছেন না।

রাজা রামমোহন যা' বলছেন, তাতে সূচিত করছে—দায়িত্ব। ধর্ম-জ্ঞানে সব ব্যাপারকে দেখলে প্রত্যেক ব্যাপারে দায়িত্ববোধ আরো বেশি জাগবে। চুরি ধর্ম। —সে চোরের। কিন্তু সব দিক দিয়ে দায়িত্ব ভেবে দেখতে গেলে, চোর কি আর দুদিন বাদে চুরি করতে পারবে? চোরও কি চাইবে তার জিনিস কেউ চুরি করুক। সে চুরি ক'রে থাকে তার অভাবে বা স্বভাবে। কিন্তু চুরির অনিষ্টকারিত্ব সম্বন্ধে তাকে সচেতন করা, তার অভাব দূর ক'রে দেওয়া বা সমাজভরা তার সম-অবস্থার আরো সকলের অপরিহার্য অবস্থাকে তার চোখের সামনে এনে দেওয়ার দ্বারা অনেক সময় চুরি ঘটনার মোড় ফেরানো না চলে, এমন নয়। তবু যেখানে চুরি চলতেই থাকে, সেখানে তাকে একটা বিশেষ গণ্ডীতে আবদ্ধ ক'রে রেখে তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ করা যায়—তার থেকে তার অপরিণত বা ব্যাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তির সংস্কার-সাধন হতে পারে। এই মাত্রই করা চলে, এবং এই হচ্ছে আরেক দিকের ধর্ম। কিন্তু কোনোক্রমেই এমন কিছু করা চলবে না, যাতে চোর যে অধর্মী—এই নিন্দা চোরের মনে জোর পেয়ে ওঠে। কারণ, একবার কোনোক্রমে মানুষের চিত্তকে বিকল ক'রে দিলে তার বিকৃত প্রভাব সমাজের উপরেও কাজ করবেই। সেজন্যই ঘৃণা, নিন্দা, মারধোর ইত্যাদি শাস্তি দ্বারা শোধনের প্রণালী সহজ বটে, কিন্তু মূলতঃ দেখা যায়, তা কার্যকরী নয়। বরং প্রতিশোধাত্মক শাস্তি বা হিংসা উল্টো আরো বেশি প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে অন্যায়, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলাকেই আরো ডেকে আনে ব'লে মনস্তত্ত্বের বিচারে তার উপযোগিতা সন্দেহজনক। পরিবারে দু'চারটে দুষ্ট ছেলে বা রোগী সর্বত্রই থাকে; সংসারেও বাঘভালুক না আছে নয়, সব চেষ্টার শেষ ক'রেও তাদের পরিবর্তন আনা যায় না, উপদ্রব থেকেই যায়; তখন আমরা প্রত্যেকেই জানি, ভোগ কিছু ভুগতেই হয়, কিন্তু তাকে ফেলে দেওয়া যায় না। জ্বালাতনটুকু স'য়ে যাওয়া ছাড়া নিরুপায়। কিন্তু এমন একদিন আসে যখন ঐ সয়ে যাওয়ার ফলে পরিণত বয়স লাভ ক'রে ছেলে নিজেই শুধরে যায়,—সেই ছেলেই আবার পরিবারের নির্ভর হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য সকল সমস্যার ক্ষেত্রেই সয়ে-যাওয়াটাও সমাধানের একটা বড়ো সূত্র। সেটা অপমান নয়, দুর্বলতা নয়। সেটাতেই শক্তির পরিচয়।

ধর্ম কেবল একটা নয়। নানা বস্তুর নানা ধর্ম। সেই ধর্ম স্বভাবের, অর্থাৎ সৃষ্টির একটা অবস্থাবিশেষ। বিশুদ্ধ চিত্তে সব জিনিসকে তার স্বধর্মে গ্রহণ

করাই ধর্মের প্রথম কথা, কিন্তু শেষ কথা নয়। আরো কথা আছে। সংস্কারও ধর্ম। মন্দ থেকে ভালো হতে হবে। এটাই ধর্ম। একটা বিশেষ শ্রেণীতে মানুষকে চিহ্নিত ক'রে রাখি। তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ছোঁয়া বাঁচাই। এ এক রকম ধর্ম। কিন্তু বড়ো ধর্ম নয়। মানুষের প্রত্যেকটি অধিকারে তাকে যোগ্য ক'রে তোলাই হচ্ছে সেই বড়ো ধর্ম। মানুষের মধ্যে স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা স্বাভাবিক,—এবং এমন সব বৈষয়িক জটিলতা আছে, যা' থেকে মানুষ কূটনীতি আশ্রয় ক'রে থাকে। সেটাও একটা ধর্ম। আধুনিক ধর্মে রাজনীতি বিজ্ঞানের বিষয়। তাকে ধিক্কার দেওয়া চলবে না। হতে পারে রাত্রির মতো সে অন্ধকারের রাজ্য। জানা চাই, সময় বিশেষে রাত্রি এসেই থাকে। এমন লোক আছে, যাদের এরূপ বিষয়বুদ্ধির কুটিলতা নিয়ে থাকতেই ভালো লাগে,—কিন্তু পরার্থের মধ্যে যদি এর চেয়েও ভালো কিছু থাকে, তবে যাদের তা ভালো লাগে তারা তা' নিয়ে থাকবেন,—বৈষয়িকদের তরাবার মাতব্বরি বা গুরুগিরির সুর তোলা ধর্ম হবে না। কারণ, সে সুর সমন্বয়-ধর্মের বিরোধী। শুধু বন্ধুভাবে, সঙ্গীভাবে বা পড়শির মতো মেলামেশা করতে পারেন। গাল-গল্পে একটা নূতন বিষয়ের বৈচিত্র্য ও রসান্তর আস্বাদন করানো, এই মাত্র। তাতে অন্যপক্ষ কৌতূহলী হ'য়ে উঠলে ক্রমে ক্রমে তাদের নিকট এ পথের রহস্য ও রসের বিশ্লেষণ করা যায়। এই থেকেই অন্যদিকে যেটুকু ধর্মান্তর ঘটবার ঘটবে স্বাভাবিক পথে। জোর ক'রে ধর্মান্তর গ্রহণ করানোও অধর্ম। যোগাযোগের 'কুমু' এখানে সমন্বয় ক'রে নিতে পারেনি, 'অচলায়তনে'র 'পঞ্চক' তা পেরেছিল।

রাজনীতি কি শয়তানের?—এ প্রশ্ন তোলার দ্বারা সেদিন থেকে রামমোহন আমাদের মৌলিক সত্যে সচেতন ক'রে চলেছেন,—বলছেন যে, রাজনীতি শয়তানের নয়; যে মানুষের থেকে তথাকথিত ধর্ম দেখা দিয়েছে, রাজনীতিও সেই মানুষেরই এক স্বাভাবিক ধর্ম। এবং তাও ধর্মই। এই কথা থেকে এসে পড়ছে সংসারের সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার বিস্তার। এই কথা থেকে সংসারের সকল কোণ সেই ভালোবাসার আলোয় সহসা এককালে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—একদিকে মহান এই অদ্বৈতবাদ—অন্যদিকে এঁদো অলিগলির ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জটলা। এই দুয়ের মাঝে রামমোহন ভালো-মন্দ সুন্দর অসুন্দরের সীমা টানেননি—সবই তাঁর কাছে সাদা চোখে দেখবার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তার থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দিয়ে

গেছেন তিনি ঐ প্রশ্নেরি মধ্যে,—সে সংজ্ঞা হচ্ছে সহানুভূতির সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়টিকে বিচার-বিবেচনা করা। তার ফলেই হবে, বর্জন নয়,—বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের সমন্বয়-সাধন। তার মধ্যে যোগও আছে বিয়োগও আছে বটে। কিন্তু প্রশ্নটিতে নিহিত সহানুভূতিটুকু মেলে দিয়ে সবার উপরে বিরাজ করবে সমন্বয়েরই সত্য। এই সত্যই তিনি পেয়েছিলেন। তাই বিয়োগে মুখ ফেরাননি পশ্চিমের প্রতি, এবং ভাবীকালের উন্মুখতা আকর্ষণ করার মতো হৃদয়ের বিস্তার রেখে যেতে পেরেছেন। আধ্যাত্মিক ধর্মেরই মতো বাস্তব রাজনীতিকেও স্বীকৃতি দেওয়া মানে, সংসারকে সমগ্রভাবে সর্বানুভূতি দিয়ে গ্রহণ করা।

চিরদিনই মন্দের চেয়ে ভালো এবং ভালোর চেয়ে আরো-ভালো আছে। মন্দরাও চলছে পাশাপাশি। কিন্তু সব ভালো নেই কোনোকালেই। সেজন্য ক্ষোভ জাগিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু সুখের চেয়ে সোয়াস্তিটাই লোকে চায়। সোয়াস্তি হচ্ছে সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে অবস্থাটাকে স্বাভাবিক ক'রে দেখা। তাতেই কাজ চলে। তা না হলে কেবল ভালোর জন্য দগ্ধে মরা বা অন্যদের দগ্ধে মারায় কাজ হয় না।

সমন্বয়ের দান হচ্ছে সোয়াস্তি। কেবল—ভালোর জন্য আদর্শবাদের যাঁরা উপাসক, তাঁরাই ধর্মকে রেখে চলেন সিকেয় তুলে। তাঁদের চোখে ধর্মের পবিত্রতা একটা স্বতন্ত্র অপার্থিব বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আদর্শ হচ্ছে সমগ্র সত্যের একটা বিশেষ অবস্থা,—উন্নত স্তর। যেমন আমাদের বিবেক। শরীরকে বাদ দিয়ে বিবেক চলে না। দেহস্তর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্তর হলেও সেই স্তরটি সমস্ত স্তরের একটি অংশ। সে অংশের উপরেই অপর উন্নত অংশ বিবেকের ভিত্তি। সুতরাং দুই অংশকেই আমাদের স্বীকার ক'রে চলতে হয়। দুয়েরই প্রয়োজন মেটাতে হয় দুয়ের অনুরূপ বিষয় এবং ক্রিয়া দিয়ে। তবে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে সত্তা পরিবর্তিত হতে পারে, এবং তা হয়েও থাকে, এ ভাবে দেহে-মনে আমাদের দেবভাব বা অসুরভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আরো ভালো বা দেবত্বের জন্য যেখানে একমুখো আদর্শবাদিগণ শারীরিক ধর্মের বাস্তব দিকটাকে স্থূল ব'লে উপেক্ষা বা ঘৃণা ক'রে চলেন, বা বাস্তববাদীরাও যেখানে উল্টোভাবে গাল দেন আদর্শবাদীদের, —সেখানেই তাঁরা প্রত্যেকেই বিরাগ ও বিরোধের জটিলতা সৃষ্টি করেন। দৃষ্টিভঙ্গীর এই বক্রতাটুকু রামমোহনে নেই। সেতু বেঁধেছেন তিনি আদর্শে

ও বাস্তবে। সেই সেতুরই ভূমিকা বেয়ে যেখানে এসে পৌঁছানো যায়, সেখানে পাই আমরা রবীন্দ্রনাথকে।

এক কথায়, বিচার ও সহানুভূতির সমন্বয় রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে দার্শনিকতা। তাঁর গান, কবিতা দেশে অনেকটা ছড়িয়েছে। কিন্তু বিচার-সমৃদ্ধ গদ্য-সাহিত্যের দিকটা এখনো অনেকটা আলমারিতে বদ্ধ। তা খোলা হলে তার আলোচনা দ্বারা দেশে বিচার-বুদ্ধিরও প্রসার হবে সন্দেহ নেই। বিচার-বুদ্ধি এনে বড়ো বড়ো কথা বলা কমবে। অনেক গোঁড়ামি-গোঁয়ারতুমির অনাসৃষ্টির দায় থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সহানুভূতি ও বিচার-বিবেচনায় মেলবার সুযোগ সৃষ্টি করে, আর মেলবার বাধা জন্মায় মনের এই প্রমত্ততা, অসহিষ্ণুতা। আদর্শবাদের প্রতিক্রিয়া সাধারণের মধ্যে কিছু কিছু অন্ধ বিশ্বাসের মনোবৃত্তি সৃষ্টি ক'রে অজ্ঞানতা ও অসহিষ্ণুতার প্রশ্রয় না দিচ্ছে এমন নয়। অধিকারী অনধিকারী নেই, দৃষ্টিটা ঠেকানো থাকে আকাশেই। পদে পদে ঠোক্কর খায়। তবু বড়ো কথার কমতি নেই। অথচ যুঝতে হবে ঝানু-বাস্তববাদী পশ্চিমের লোকদের সঙ্গে। সমস্যা বুঝে নিতে হয়েছিল রামমোহনকে। তাই মাটি দেখিয়ে রামমোহনকে সেদিন ধর্মের দেশে কঠোর ক'রেই বলতে হয়েছিল—রাজনীতি কি শয়তানের ?

এমন কি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও প্রধানতঃ আদর্শবাদই কাজ করেছিল বেশিদিন ধ'রে। কিন্তু তিনি উদাসীন ছিলেন না। "এবার ফিরাও মোরে"-র কবিতার মধুর প্রার্থনাই "সত্যের আহ্বান", "সভ্যতার সংকট"—প্রভৃতি পরবর্তী গদ্য-ভাষণে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মহাত্মাজী রামমোহনকে সমালোচনা করলেও অন্যদিকে আশ্চর্য এই যে, রামমোহনের প্রশ্নের সার্থকতর উত্তর পাই কার্যতঃ মহাত্মাজীরই মধ্যে। রাজনীতি যে মানুষের, এবং, ধর্মের মতোই মানুষের কাছে তা স্থান পেতে পারে, মহাত্মা শতাব্দীর মধ্যে সেইটি বাস্তবতঃ মূর্ত ক'রে দেখালেন। দেশের যুবক-সম্প্রদায় এককালে ধ্যান-ধারণা, ব্রহ্মচর্য, আর্তসেবা ও জনশিক্ষা বিস্তারকে ধর্ম জেনেই নানা মঠে, আশ্রমে ঝুঁকে পড়ত—সন্ন্যাসী হত। সেই ধর্মধারণার সমকক্ষ ক'রে দেশের রাষ্ট্র-স্বাধীনতার কাজের প্রতি ব্যাপকভাবে তাদের মনের গতি ফেরালেন মহাত্মাই প্রথম। জনসাধারণের সঙ্গে মেলালেন এই কর্মীদের। এর আগে বিপ্লববাদিগণ হিংসা আশ্রয় ক'রে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেন ; ধর্ম হিসাবে তার মূল্য থাকলেও গোপনতার জন্যই তা একান্তের

জিনিস হয়েছিল,—সর্বস্তরে পৌঁছে সকলের জিনিস হয়ে উঠতে পারেনি। মহাত্মাজী আপামর সকলের চেষ্টাকে রাষ্ট্র-আন্দোলনে অনেকটা সমন্বিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই সাধনাকে অভিনন্দিত করতে গিয়েই কবি সেদিন তাঁর "সত্যের আহ্বানে" বলেছিলেন: "স্বরাজ গ'ড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ, তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই'। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষা-তত্ত্ববিৎ, রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ—সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিকে থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে, কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু ও নিশ্চেষ্ট ক'রে তোলা না হয়।...দেশের সকল শক্তিকে, দেশের লোককে ডাক দেবার যাঁর সত্য অধিকার আছে, তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিতে নিযুক্ত ক'রে দেবেন।" (১৩২৮)

কবির কথা কতদূর সত্য, আজ বুঝতে পারছি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাবার পর অব্যবহিত কাজ দেখা দিয়েছে আজ প্ল্যানিং। সৃষ্টিকার্যের স্থলে আগে তথ্যানুসন্ধানে পরিকল্পনায় ডাক পড়েছে সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল বিশেষজ্ঞরই। এই যুগেই কবি আরো বলে রেখেছিলেন: "যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেকে জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেন না পরস্পর নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেই দিনই সামাজিক মানুষ যে সকল ধর্মনীতিকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ।"...কবি বলেছেন, বার-বার স্বার্থসংঘাতে রাষ্ট্রসমন্বয়ের এ-চেষ্টা পণ্ড হবে, কিন্তু তবু এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই দিনে দিনে আপন স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে।

২

স্বাধীনতার উদ্বোধন হচ্ছে আজ দেশে দেশে। সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং সংঘর্ষের দ্বারাই তার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ভারতবর্ষে কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল। এর অহিংস জমি তৈরী করতে পূর্বপুরুষদের নৈতিক ও আত্মিক সাধনার দাম কম নয়।

শতাব্দীর শুরু হল রাজা রামমোহনকে দিয়ে। তাঁকে ধর্ম ও সমাজনৈতিক সংস্কারক ব'লেই লোকে জানে। তিনি এনেছিলেন আধুনিকতার আলোক ;— সর্বদিকেই তার ছটায় আঁধার অপসৃত হতে থাকে। তিনি কেবল বিষয় বিশেষের নয়, সর্বাঙ্গীন মুক্তিরই অগ্রদূত। এই তাঁর মহত্ব। তিনি সংগ্রাম করেছিলেন অস্ত্রে নয়, শাস্ত্রে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যও তাঁর যে কী ক্ষুধা ছিল, সে পরিচয় রয়েছে তাঁর জীবনের নানা ঘটনায়। ১৮৩০ সালে তিনি যখন ইংলণ্ডের পথে জাহাজ-যাত্রী, নেটাল বন্দরে দেখতে পেলেন ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা। উৎসাহে তা দেখতে গিয়ে আছাড় খেয়ে তাঁর পা ভাঙে। তারো আগে ১৮২১ সালে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের সময় তিনি দেশে ছিলেন,—কলকাতার টাউন হলে দিলেন ভোজ। রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগত স্বাধীনতা এবং ফরাসী বিদ্রোহেও তাঁর যেমন উল্লাস জেগেছিল, গ্রীসের পরাধীনতা এবং নেপল্‌সের স্বাধীনতা-যুদ্ধে ব্যর্থতায় তাঁর সমবেদনা ছিল তেমনি গভীর।

দেশে এর পরে বাণী জাগালেন রঙ্গলাল। কাব্যে তাঁর মতো এমন সুস্পষ্ট ভাবে কেউ জাতির মনে গেঁথে দিতে পারেনি—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।"

দাসত্ব-শৃঙ্খলের প্রতি ঘৃণ্য নৈতিক ধিক্কার বেজে উঠল এখান থেকেই সবচেয়ে ব্যাপক ও কার্যকরী হয়ে।

নিখিল ভারতের জনশক্তিকে স্বাধীনতাব্রতে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া হল প্রথম কংগ্রেসে, হিউম তার উদ্যোক্তা এবং ডব্লিউ সি ব্যানার্জী তার প্রথম সভাপতিরূপে স্মরণীয়।

হোমরুল লীগ আন্দোলনের নেত্রী মিসেস্ এনি বেশাণ্ট নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বায়ত্তশাসনের আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিলেন ;—সেদিনের এই উদ্যমও জাতিকে উদ্দীপিত রেখেছে কম নয়।

এদিকে জাতিকে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র ধরালেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বন্দে মাতরমে'।

স্বাধীনতার আন্দোলনকে ইংরেজের আমলাতন্ত্রী-শাসনের সংস্রব-শূন্যভাবে চরম স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা দেবার সাধনায় নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে জাতিকে সচেতন করলেন স্বাধীনতার নির্ভীক নায়ক বালগঙ্গাধর তিলক।

দেশ-বিদেশে ভারতের মুক্তি-সাধনার বাণী প্রচার ও নানা বৈদেশিক শক্তির সহিত রাষ্ট্রীয় যোগ স্থাপন অভিযানে অগ্রসর হলেন শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা, লালা লাজপৎ রায়, লালা হরদয়াল, বীর সাভারকর, রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায় ইত্যাদিতে মিলে।

স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাণী ও সেবাকার্যের প্রেরণা দ্বারা জাতির নৈতিক ভিত্তি গঠনে প্রভূত সহায়ক হয়েছেন। বিশেষ ক'রে দেশের দরিদ্র্য জনসাধারণের অবস্থা উন্নয়নে জাতীয় যুব-শক্তি সংগঠনের কাজ শুরু করেন তিনিই প্রথম। ইতিপূর্বে আরেকজন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের কথা শুনিয়েছিলেন তাঁর বঙ্গদেশের কথক নামক গদ্য রচনায়।

অরবিন্দ ঘোষকে কেন্দ্র ক'রে বাংলার বিপ্লবী দল দেশবাসীর চিত্তে এনে দিল মুক্তি-সংগ্রামের এক রোমাঞ্চকর উত্তেজনা; আত্মবলির বাস্তব ধারণা এঁদের থেকেই লোকে লাভ করেছে; সে কাজে সাহসও সঞ্চার করেছেন এঁরাই। অরবিন্দ তাঁর পরবর্তী জীবনে রেখে গেলেন আরেক মুক্তির ডাক, সে-মুক্তি দেশের নয়, জাতির নয়, মানুষের সেই মুক্তি যা "অশিবের অন্তর হতে ফুটিয়ে তুলবে তার শিবময় সার্থকতা।" তাঁর বড়ো জিজ্ঞাসা ছিল এই যে, "কোন পরশমণির ছোঁয়ায় এই মর্ত্যভাবের লোহা দিব্যভাবের সোনায় হবে রূপান্তরিত ?" (দিব্য জীবন)।

এই যুগে নির্ভীকতা ও আত্মবলির এক অপূর্ব অভিব্যক্তি দিলেন বালক ক্ষুদিরাম। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে স্বাধীনতার অভিযানে এগোতে দেশকে প্রেরণা যোগাল এই বালকের ফাঁসি। সংগীতে এই যুগেই রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন—

"ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।" স্বৈরাচারী বিদেশী শাসক-শক্তিকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন তিনি—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, এমনি শক্তিমান ?
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এতই,
এতই অভিমান ?"

দেশবাসীকে তিনি এই বলে সতর্ক করলেন,—"আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।" রবীন্দ্রনাথ কবি,—কিন্তু তিনি আনলেন সংগঠনের বাণী,—শিক্ষায়, শিল্পে, স্বায়ত্ত-শাসনে নিজেদের গঠন করা চাই আগে,—তাহলে স্বাধীনতার প্রেরণা বাস্তবের ভিত্তি লাভ করবে। ক্রমে ক্রমে তিনি দেশকে দেখলেন সকল দেশের অন্তর্গত ক'রে, তাঁকে দেখলেন বিশ্বসমাজের একটি অঙ্গরূপে। জাতিকে সেই সমাজের সক্ষম অংশীদার ও সামাজিক আত্মীয়রূপে দাঁড় করাতে চাইলেন। সেই উন্নত মানের আসনের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রচার করতে লাগলেন "মহামানবের সাগরতীরে"র শাশ্বত ভারত-বাণী। তাঁর এই বিশ্বমানবতার আদর্শ বিশ্বজনকেও উদ্বুদ্ধ করল। জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ বন্ধন থেকে মুক্তির কথা শুনিয়ে মানুষের নিগূঢ় চেতনায় তিনি যে জাগরণ আনলেন, বিচারশীল সংস্কারমুক্ত বিশ্ব-সমাজে তিনি সেইজন্যই হলেন সমাদৃত। একদিন বিদেশের একটি বন্ধনমুক্ত জাতির স্বাধীনতা শত-বার্ষিকী উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ এল আমাদের দেশের এই কবির কাছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাজ্য তিন শত বৎসর ছিল স্পেন সাম্রাজ্যের অধীন। যুদ্ধের দ্বারা সাইমন বলিভার সে দেশকে স্বাধীন করেন। ৯ই ডিসেম্বর দিনটি পেরুবাসীর সেই বিজয় উৎসবের দিন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে অসুস্থ শরীরেও সেদিন সুদূর যাত্রায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সে দেশে গিয়ে পৌঁছেও ছিলেন। কিন্তু উৎসবের দু'মাস তখনো দেরি থাকায়, তিনি দৈহিক কাতরতার দরুন সেখানে বেশিদিন থাকতে অক্ষম হয়ে আর্জেণ্টাইন-রিপাবলিকের

সভাপতির নিকট হতে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে হোক, বিদেশে হোক, স্বাধীনতা-দিবসটিকে অভিনন্দনের এতই ছিল তাঁর আগ্রহ। স্বদেশে তিনি স্বাধীনতা দিনের সাক্ষাৎ পেয়ে যেতে পারেননি। কেবল স্বাধীনতার প্রশস্তি গেঁথে রেখে গেছেন তাঁর জাতীয় সংগীতে। এ-সব কথা এখনকার স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ভারতবাসীকে উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্বের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসাধনের কাজে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির চিন্ময়-দানের তুলনা নেই।

দেশের কাজে পার্থিব দানের পরাকাষ্ঠা দেখালেন চিত্তরঞ্জন দাশ,—দেশের চিত্ত জয় ক'রে তিনি জাতির কাছে নবজন্ম পেলেন নূতন নামে, সেই থেকে দেশবন্ধুকেই সকলে জানে। আইন-পরিষদের নিয়মতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি গড়লেন শেষে স্বরাজ্য পার্টি; ভালো-মন্দে মিলিয়ে আজকের লোকসভা, বিধান-সভা পরিচালনার অভিজ্ঞতা অনেকটা আমাদের সেই পার্টিরই দান বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। আরেক মহাপ্রাণ দাতা উত্তর ভারতে এই দান ও আইন বিচক্ষণতার ধারায় বেগ সঞ্চার করেন একরূপ সর্বস্ব বিলিয়েই;—তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির মতো তাঁরও কীর্তি অক্ষয় থাকবে এলাহাবাদের "স্বরাজ-ভবনে"। নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার কর্মকেন্দ্রাবাস এই সুবিশাল প্রাসাদেই ভিত্তি পেয়েছিল। আরও দুটি কীর্তির জন্য এই দুই নেতার কাছে জাতি ঋণী। দেশবন্ধুর স্নেহের পরিচালনার ফলে পেয়েছি আমরা পরবর্তী কালের নেতাজীকে, আর পণ্ডিত মতিলালের পুত্র জওহরলাল আজ আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

এ-সকলেরই মধ্যে যাঁর অতুলনীয় জীবনের মহৎ প্রভাব প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কার্যকরী হয়ে নবীন ভারতকে এত শীঘ্র স্বাধীনতার গৌরবে বিশ্ববন্দিত ক'রে তুলেছে, এবারে সেই জাতির জনক গান্ধীজীর কথা আমাদের সকলেরই মনে পড়েছে নিশ্চয়ই। অনেক কিছু বাণী এবং কাজের প্রবর্তনাই তাঁর জাতি-গঠনের পশ্চাতে নিহিত রয়েছে; সর্বশেষ যে অমোঘ মন্ত্রে তিনি শেষ দান তাঁর রেখে গেলেন, সে হচ্ছে,—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে,' করব, না হয় মরব। এর মধ্যে আর অন্য কথা নেই। সব কাজেই এই হল কলকাঠি, এই হল বল;—যখন যে-ক্ষেত্রে এ মন্ত্রের উপলব্ধিতে আমরা এসে পড়ব, তখন সে-ক্ষেত্রেই মুক্তি করতলগত হবে। হলও তাই। রাষ্ট্রে আমরা যেটুকু জোরে সে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পেরেছিলাম, সেটুকুতেই অনেকখানি কাজ হয়েছিল,

যাকে বলে ফিনিসিং টাচ। মন্ত্রের কথা হলেই তাকে আমরা 'দৈব' ক'রে দেখি। এ-মন্ত্র যে দৈব নয়, কিন্তু দিব্য মুক্তিকেও এতেই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে,—সাধারণ মানুষের সাদাসিধে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের প্রত্যেকটি কাজ দ্বারাই গান্ধীজী মানুষের কাছ থেকে মহাত্মা পদবী অর্জন ক'রে তা প্রমাণ করে গেলেন।

আধুনিক কালে যুবক-ভারতকে জাগিয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। যুবক ও প্রবীণ ভারত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রাণধারা ও বিচক্ষণতার দ্বারা অভিষিক্ত। নেতাজীর আরেকটি স্মরণীয় দান জাতীয় সেনা-বাহিনী। স্বাধীনতার নামে আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে শুধু জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে তিনি এক করে, মিলিয়েছেন তাই নয়, সর্বপ্রথম স্বাধীন শিক্ষা ও শৃঙ্খলাতে তাদের সংগঠিত করেন। সম্মুখ-সংগ্রামে ব্রতী হয়ে একটি বিশ্ববিদিত ঐতিহ্য স্থাপন করেছিল সেই ফৌজ তাঁরই নেতৃত্বে। পণ্ডিত জওহরলালও এই সেনাবাহিনীকে জাতীয় বাহিনীর সম্মান দান করেন, এবং বৃটিশ শাসনে কারারুদ্ধ সেই ফৌজের বিচার-সঙ্কটের দিনেও পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে ফৌজ ও নেতাজীকে তিনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। জওহরলালের আর একটি বিশিষ্ট দান,—নাগরিক স্বাধীনতার আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। (১৯৩৬) তারপরে দেশ-বিভাগের তিক্ত বিষময় অভিজ্ঞতা হজম ক'রে, নীলকণ্ঠের মতো অশিবের উপর শিবের প্রতিষ্ঠা দিতেই তিনি কায়মনোবাক্যে যেন তেমনি সমাহিত হয়ে আছেন।

স্বাধীনতার সূত্রপাতে "আনন্দ মঠে" বঙ্কিমচন্দ্র একদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন,—সাধককে কী বলি দিতে হবে? সেদিন তাঁর গ্রন্থের সাধক উত্তর দিয়েছিলেন,—"প্রাণ"; তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন, বলি চাই, "ভক্তি"। —দেশের জন্য দিতে হবে একনিষ্ঠ ভক্তি। কিন্তু আজ আমাদের ভারত-বাণীর সাধক ছত্রিশ কোটি জীবনের নায়ক জওহরলাল রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ঐতিহ্যের বাহকরূপে তাঁর জীবনের খাতা সামনে মেলে আমাদের জানাচ্ছেন, দেশকে ভক্তি দেওয়া শুধু নয়, মানুষকে ভালোবাসা চাই; সেই মানুষ শুধু স্বদেশের নয়, স্বজাতির নয়—দেশ-বিদেশে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এক বিশ্বজাতিক মানুষ। এই ভালোবাসাই মানুষকে দৈবের বদলে দিব্য জীবনের সন্ধান দেবে এই মানুষেরই পৃথিবীতে।

ভালোবাসা মনে থাকাই যথেষ্ট নয়, তাকে কাজেও রূপ দেওয়া চাই;

নানা দেশের প্রগতিশীল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যেমন সাধারণ মানুষকেও সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম কাজে উন্নত জীবনের সন্ধান দিতে চলেছে,—তার চেয়ে কিছু কম হবে না আমাদেরও এই জাতি গঠনের কাজ। এর জন্য পরিকল্পনা আবশ্যক। এলোমেলো বিশৃঙ্খলার মধ্যে সময় নষ্ট করলে চলবে না; পরিমিত আমাদের জাতীয় পুঁজি। এর প্রত্যেকটি কণার সদ্ব্যবহার চাই।

স্বাধীনতার প্রথম স্তর পার হয়ে এলাম আমরা গত কয়েক বছরে। জাতীয় পরিকল্পনাকে কাজে সফল করে তোলাই আমাদের পরবর্তী স্তরের সাধনা। এ-কাজে নানা দিক দিয়ে দেশীয় নানা জ্ঞানী, গুণী, কর্মী, শিল্পী, বিজ্ঞান-সাধকের সেবা এবং সেইসঙ্গে বৈদেশিক সংযোগেরও দেশ অপেক্ষা ক'রে আছে। এখানেই আমাদের স্মরণ করতে হবে,—পূর্বগামীদের দান। বিজ্ঞানে আমাদের চেতনা জাগাতে এবং আমাদের অসাড় বৃত্তিকে কর্মঠ ক'রে তুলতে চেষ্টা করে গেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। স্বাধীন গবেষণার সে চেষ্টায় জাতিকে বিশ্বে গৌরবান্বিত করেছেন প্রথমে স্বল্পাধিক জগদীশচন্দ্রই; তেমনি শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্তনা যুগিয়ে, হাতে-কলমে নানা কারখানা স্থাপনের দ্বারা ভাত-কাপড়ের পথ দেখিয়েছেন প্রফুল্লচন্দ্র। দুর্গত সেবার কাজেও তাঁর দান রয়েছে অনেকখানি।

সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রে নবযুগের উদ্বোধন করলেন অবনীন্দ্রনাথ; দেশের ঐতিহ্যকেই যে তিনি চেনালেন তাই নয়, স্বাধীন সৃষ্টির প্রেরণাও প্রকাশের বিশিষ্ট পদ্ধতি পেয়েছি এক্ষেত্রে আমরা তাঁর কাছ থেকে।

শিক্ষার দিকে আশুতোষ আমাদের পথ খুলে দিয়েছেন; নারী-প্রগতির পথে প্রথম রাষ্ট্রনেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই সরোজিনী নাইডুকে।—শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমন একটি বৃহৎ ব্যক্তিত্ব এখনো দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি। ক্ষতি নেই,—বরঞ্চ এতেই প্রমাণ করে যে, স্বাভাবিক পথেই চলেছে গণ-মুক্তির সাধনা। নির্বিশেষ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যটুকুই তার বিশেষ গৌরব। উপরোক্ত এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় অংশ উল্লেখযোগ্য তাঁর আবাল্য থেকেই। তেরো বছর বয়সে ১২৮১ সালে 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতা নিয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় হল প্রকাশ্যে কবির স্বনামে প্রথম আত্মপ্রকাশ। সে-কবিতা ছিল জাতীয় উদ্দীপনাময়। তারপরে বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে অজস্র কবিতা, গান, প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় তিনি কালে কালে দেশের নানা সমস্যা ও তার সমাধানের সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন;

বিশেষ ক'রে গানের মধ্যে যে-মুক্তির আলোক ছড়িয়েছেন তা চিরকালই জাতীয় শুভযাত্রাকে মহান পথের নিশানা দেখাবে।

স্বদেশী যুগে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের দিনে রাখীবন্ধনের আন্দোলনে কবি ছিলেন অন্যতম নেতা; জাতীয় শিক্ষা-ও পল্লীসমাজ-সংগঠনে তখন থেকেই তাঁকে অগ্রণী দেখা যায়; সাময়িক পত্রের সম্পাদনার সূত্রে নানা মন্তব্যে বিদেশী শাসকদের, স্থলবিশেষে স্বদেশীয় সমাজেরও অবিচার-অনাচারের অগ্নিবর্ষী সমালোচনায় হন তিনি একান্ত তৎপর। ঢাকার (১২৯৮) ও পাবনার (১৯০৭) প্রাদেশিক-সম্মিলনে তিনি যোগ দিয়েছেন, উদ্বোধনে গান গেয়েছেন, ভাষণ দিয়েছেন; অন্যান্য সভা-সমিতিতেও প্রবন্ধাদি পড়েছেন রাষ্ট্রীয় কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। এইসঙ্গে মানুষ-গড়ার দিকে গিয়েছে তাঁর আগ্রহ। ১৯০১ সনে তিনি স্থাপন করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়; ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়কে আরো বৃহত্তর আদর্শে ও বাস্তবরূপে প্রসারিত ক'রে ১৯২১ সনে গড়লেন আন্তর্জাতিক কেন্দ্র 'বিশ্বভারতী'। তাকে সাংস্কৃতিক ও লোকসেবক প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করিয়ে তিনি নিবেদন করেছেন বিশ্বমানবমিলনের মহাজাতীয়-যজ্ঞে তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মের অবিরাম আহুতি। ভারতের জাতীয় সংগীত "জনগণমনঅধিনায়ক"-এর রচনাও এর মধ্যেই ১৩১৮ সনে সম্পন্ন হয়েছে। এ সবই তাঁর জনসংশ্লিষ্ট কাজের গঠনাত্মক দিক। কিন্তু ১৯১৯ সনে আমলাতন্ত্রের বর্বরতায় পঞ্জাবে যেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল, সেদিন তিনি স্থির থাকতে পারলেন না,—সরকারী 'স্যার' উপাধি বর্জন ক'রে তাঁর বিক্ষুব্ধহৃদয়ের ধিক্কার জানালেন অত্যাচারী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে। এরপরে দেশের পরিস্থিতি-উপযোগী সাধ্যমতো সাড়া দিয়েছেন নানা লেখায়;—রাষ্ট্রআন্দোলনে একেবারে সামনে এসে দাঁড়িছেন আরেকবার ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বরে কলকাতা গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে হিজলী রাজবন্দীহত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। সেখানে যে-বিরাট জনসভা হয়, অসুস্থ শরীরেও তাতে তাঁর উপস্থিতি ও ভাষণ দান শেষ বয়সেও আদর্শবাদীতার সঙ্গে তাঁর বাস্তবনিষ্ঠার এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে। পরে এই বিষয়েই তাঁর বিখ্যাত কবিতা—"ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে"—কবিতাটি রচিত হয়। বক্সার দুর্গের রাজবন্দীদের প্রতি তাঁর প্রত্যভিনন্দনের বাণীও তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে নির্যাতিত দেশ-সেবকদের প্রতি গভীর মমতার মহত্ত্বে। স্বতন্ত্র-নির্বাচনের রাজনৈতিক সংকট ঠেকাবার

আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর পুণা-উপবাসের সময়েও ১৯৩২ সনের সেপ্টেম্বরে কবি কার্যত অনেকটা জনসংযোগে এসে সকলকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন। এরূপ দেশবিদেশে মাঝে মাঝে যখনই যে-দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তিনি তাতে একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেননি ;—জনসভাতে কোথাও হয়েছেন সভাপতি, কোথাও পাঠিয়েছেন লিখিত বাণী, কোথাও ব্যক্তিকে বা আন্দোলনকে অভিনন্দনের জন্য বা বন্যাদুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্যকল্পে করেছেন নানা আয়োজন। ("দুর্ভিক্ষ কাতর দেশকে ফেলিয়া জাপানে যাওয়া আমার ঘটিয়া উঠিল না। দুঃখের ভাগ লইতে হইবে।"—২০ শ্রাবণ ১৩২২ চিঠিপত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৩ কার্তিক পৌষ পৃ ৯২) ভারতের নবগঠিত 'ব্যক্তি স্বাধীনতাসংঘের' সভাপতিত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে (১৯৩৬)। এ সকল যখনই যা করেছেন, কোথাও তিনি দলাদলিতে লিপ্ত হননি। ন্যায়ের পথেই সকলকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। আন্দামানে অনশনরত ধর্মঘটী-রাজবন্দীদের প্রতি তাঁর নিবিড় সহানুভূতির প্রকাশ মেলে এক জনসভার ভাষণে ও পরবর্তী টেলিগ্রামে (১৯৩৭)। ১৯৩৫ সনের প্রবর্তিত নয়া শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিলাত থেকে জিজ্ঞাসিত হয়ে (১৯৩৮) তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন, সেখানকার সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যেও দেশের কল্যাণকামনা ও তেজস্বিতার যে বিকীরণ ঘটেছে, তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর দেশপ্রাণতা বিশেষভাবেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পরে উগ্র স্বার্থান্ধ জাতীয়তাবাদের জন্য চীন-আক্রমণকারী জঙ্গী জাপানীদের তিনি কবিতায় ও পত্র বিবৃতিতে তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু জাপনী কবি নোগুচির সঙ্গে তাঁর এই নিয়ে কঠিন মতবিরোধ দেখা দেয়। দেশে কংগ্রেসের মধ্যেও গৃহবিবাদ, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ, বাইরে চীন-জাপানের হানাহানি, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মান সংকট। মহাসমরের প্রাক্কালে ব্রিটিশের নিকট ভারতের স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে দেশের নেতাদের সঙ্গে কবিও এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করেন। যুদ্ধ বাধলে (১৯৪০) তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট তারযোগে যুদ্ধবন্ধের আবেদন জানান। শুধু দেশের নয়, বিশ্বলোকের জন্য শান্তিকামী কবির বেদনাহত চিত্তের এই প্রকাশ,—প্রত্যক্ষত তা যতই নিষ্ফল হোক—দিনে দিনে মানবচেতনায় সূক্ষ্মভাবে যে এক স্থায়ীপ্রভাব সৃষ্টি করে চলবে তা স্বীকার করতেই হবে। সভ্যতার মুখোশপরা ব্যক্তি ও জাতিগত স্বার্থপরতার সংঘাতে উদার মানবতার

ক্রমবিলোপ লক্ষ্য ক'রে মানুষের ভয়াবহ ভবিষ্যচিন্তায় কবির শেষ দিনগুলিকে অশান্তিপূর্ণ করে রাখে। আসন্ন দুর্দিনের শঙ্কাবেদনায় রচিত হয় তাঁর সতর্কবাণী যুক্ত "সভ্যতার সংকট" ভাষণ (১৯৪১)। এর পরে তাঁকে এক খোলা চিঠিতে প্রতিবাদ জানাতে হয় ভারতের স্বাধীনতা-দাবির নিন্দাকারিণী বিলাতের পার্লামেণ্টসদস্যা মিস্ র্যাথবোনের লেখা প্রবন্ধের বিরুদ্ধে (১৯৪১)। এই বিবৃতির মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতার দাবিকেই তিনি ভাষা দিয়ে গেছেন আরো দৃপ্তভঙ্গিতে। ভারতের জাতীয়-সংগীত রচনা ক'রে একদিন যেমন তিনি জাতিকে তার সর্বজনীন আদর্শের মহোজ্জ্বল ভাবরূপটি চিরপ্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়ে গেছেন, তেমনি নানা কাজের মধ্যেও এইরূপ জাতীয় অগ্রগতিসূচক নানা আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে চ'লে স্বাধীনতা ও লোককল্যাণের ঐতিহ্য-সৃষ্টিতে অন্যতম সহায়ক হয়েছেন। ভাবে ও কর্মে যুগ-উদ্দীপনার উৎসবাহক এই বিশ্বকবি তাঁর দানের চিরন্তন মূল্যেই দেশে-বিদেশে লোকের অক্ষয় শ্রদ্ধা প্রীতির পাত্র হয়ে থাকবেন।